স্বনির্বাচিত গল্প

প্রেমেন্দ্র মিত্রের

স্ব-নির্বাচিত গল্প

প্রেমেন্দ্র মিত্রের

স্বনির্বাচিত গল্প

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ
৯৩ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭

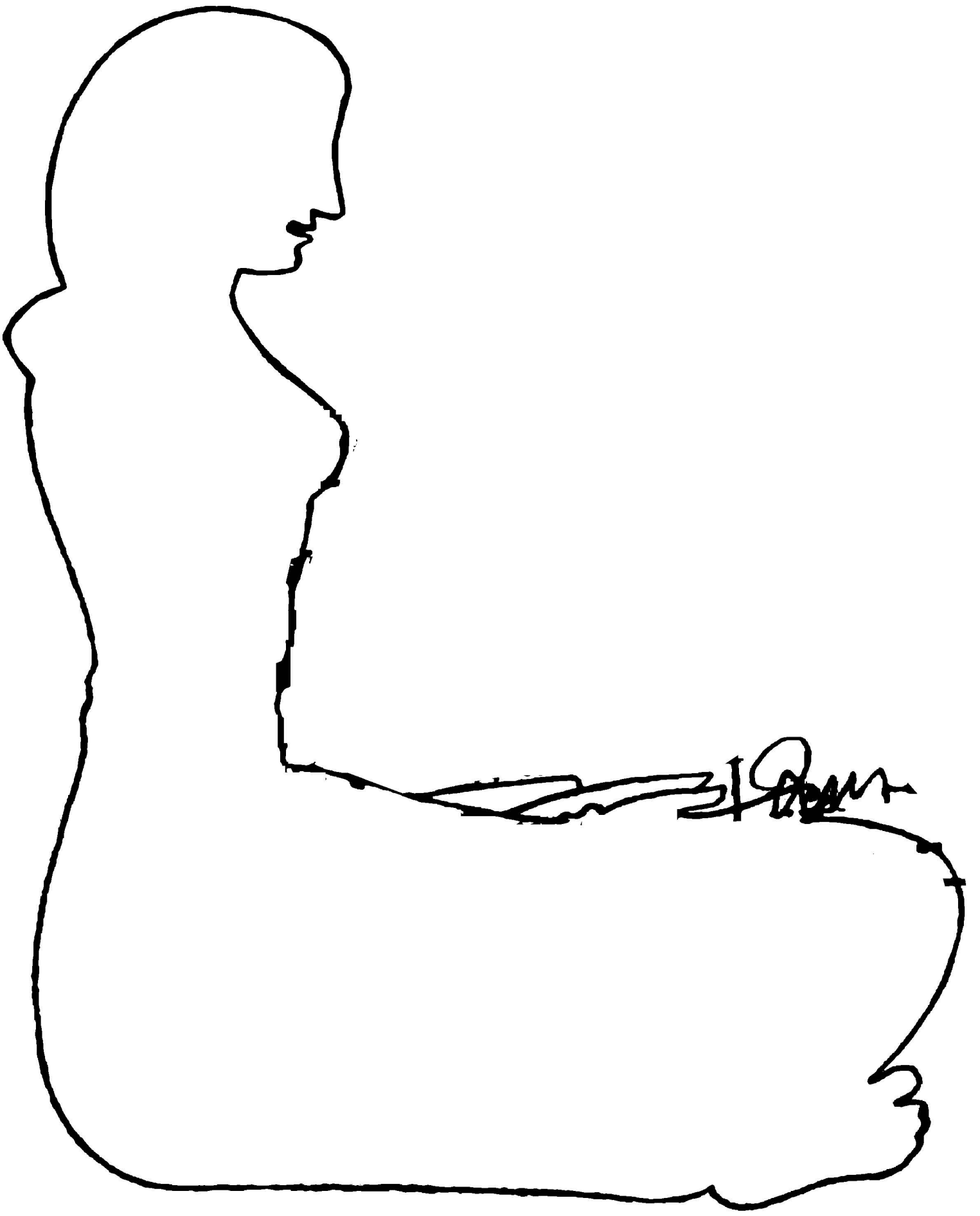

উৎসর্গ

শ্রীসাগরময় ঘোষ

স্নেহাস্পদেষু

সাফাই—

নিজেই বাছি আর অন্যেই বাছুক, কোন গল্পের সাফাইতেই সবাইকে সন্তুষ্ট করা অসম্ভব। এটা কেন যায়নি আর ওটা কেন গেছে, এ নিয়ে অনুরাগী-বিরাগীদের আপত্তি-আফশোষ শুনতেই হবে।

অনুরাগীদের কথা শুনলে শেষ পর্যন্ত সাহিত্যে আর কুলোবে না, আর বিরাগীদের কথায় কান দিলেও টিক বাছতে গাঁ উজাড়।

নিজে বাছলেও যে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় তা নয়। যতো ছেলেমেয়ের প্রতি মায়েদের বেশী-কম মমতার কথা না হয় এদের নামঞ্জুর বলেই ধরলাম কিন্তু কোন মূল্য ধরে বাছাই হওয়া উচিত তা নিয়েও কিছু দ্বিধা-দ্বন্দ্ব মনে শেষ পর্যন্ত থেকেই যায়। তাছাড়া লেখক হলেই ভালো পাঠক হবেন এমন কোন কথা নেই। নিজের লেখার পাঠক হওয়া

আশা করি। সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে জিনিসের সেবার-মূল্যায়ন তাই- লেখকের দায়িত্ব।

শুধু নিজের লেখা নিয়ে বড়াই- করলে বোধহয় অনেক দিক দিয়ে অনেক গোলযোগ এড়ান যায়, অন্ততঃ পাঠকদের দিক (যেহেতু তা-ই সব চেয়ে কাম্য হওয়া উচিত।

সংগ্রহ-সংকলনে রসিক পাঠক শুধু লেখাই নয়, লেখককেও খানিকটা পড়তে চান, আর লেখককে পড়বার, তথা লেখকের ধরা পড়বার পক্ষে তার নিজের নির্বাচনের চেয়ে ভালো আয়না আর নেই। সম্পাদনার অতি-সূক্ষ্ম গলদও সর্বদা যার নানান কারণ, লেখক-সম্পাদকেই তেমন একটি সুযোগ আলো-ময় থাকে। লেখায় যেমন নিজের বাড়াবাড়ি-মাত্রা ছাড়িয়ে যে-সব খামখেয়ালী ঢুকে যেতে পারে।

আমার নিজের কথাই বলি।

তাইতে যাঁরা এ-বইয়ে আমার আগের যাঁদের ওপর ভার দিলে এ নির্বাচন আরো নিখুঁত-নিক্তিমাপা হত, কিন্তু আমার নিজস্ব চেহারা তত স্পষ্ট থাকত কিনা সন্দেহ। তাঁদের অনেকের সঙ্গে তাঁদের রুচির অনেক মত-ভেদই যার একটি ভিত্তি উদ্দেশ্য-দির বোধহয় হত-ই

শুধু কেরানী	...	১
বৃষ্টি	...	৬
অঘোষ	...	২৬
নিরুদ্দেশ	...	৩৬
বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে	...	৪৭
সিদ্ধকল্প	...	৬১
নিশাচর	...	৭১
পটভূমিকা	...	৮২
এক অমানুষিক আত্মত্যাগ	...	১১৬
অরণ্য-পথ	...	১২৬
পোনাঘাট পেরিয়ে	...	১৪৪
পলাতকা	...	১৫৫
জ্বর	...	১৬৫
লাল তারিখ	...	১৭২
সহস্রাধিক ছুই	...	১৮৪
পাশাপাশি	...	১৯১
চুরি	...	২০৫
পরোপকার	...	২১৬
ভূমিকম্প	...	২২৩

শুধু কেরানী

তখন পাখিদের নীড় বাঁধবার সময়। চঞ্চল পাখিগুলো খড়ের কুটি, ছেঁড়া পালক, শুকনো ডাল মুখে করে উৎকণ্ঠিত হয়ে ফিরছে।

তাদের বিয়ে হ'ল।—দুটি নেহাৎ সাদাসিধে ছেলেমেয়ের।

ছেলেটি মার্চেন্ট অফিসের কেরানী—বছরের পর বছর ধরে কত বড় বাঁধানো খাতায় গোটা গোটা স্পষ্ট অক্ষরে আমদানি-রপ্তানির হিসাব লেখে। মেয়েটি শুধু একটি তাম্রবর্ণ সাধারণ গরীব গৃহস্থের মেয়ে—অসম্ভব সহিষ্ণু মমতাময়ী।

আফ্রিকা থেকে কালো কাফ্রী আনিয়ে উত্তোলন-দ্বারে সাদা মানুষের দেশের আকাশ কেমন করে শিউরে উঠেছে, সে খবর তারা রাখে না। দানববরণ বিপুল মূর্তপ্রতিম শক্তি একটা কোথায় কবরের চাদর ছুঁড়ে ফেলে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের রক্তের প্রমাণ দিতে, সে খোঁজ রাখবার দরকার হয় না।

তারা বাংলার নগণ্য একটি কেরানী আর কেরানীর কিশোরী বধূ।

আসন্নযৌবনা মেয়েটি ছেলেটির দারিদ্র্য ঘরে এসে গৃহিণী হ'ল।

প্রেমের কবিতা তারা লেখে না, পড়বার ফুরসৎ বা রুচিও বড় নেই। দুজনে দুজনকে অত্যন্ত বুকভরা নব নব কল্পনা-লোকের সন্ধান দান করে না। শুধু এ ওকে ভাল-বাসে।

সকাল বেলা আপিসে যাইতে-খাইতে হাতে পানের ডিবেটি দিয়ে দরজা অবধি এগিয়ে দিয়ে মেয়েটি একটি দরজার আড়াল থেকে ঈষৎ মুখ বার করে সলজ্জ একটু করুণ হাসি হাসে,—ছেলেটিও ফিরে চেয়ে হাসে। কোনো দিন বা মেয়েটি বলে মৃদুস্বরে বলে, 'ওগো তাড়াতাড়ি এসো, কালকের মতো দেরি কোরো না!' ছেলেটি হয়ত অনুযোগের স্বরে বলে, 'বাঃ! কাল ত মোটে আধঘণ্টা দেরি হয়েছিল; [illegible] ও রাস্তায় ট্রামের তার খারাপ হয়ে গিয়েছিল ব'লেই… একটু দেরি হ'লেই বুঝি অমনি অস্থির হয়ে উঠতে হয়!' মেয়েটি লজ্জিত হয়ে বলে, 'হ্যাঁ, আমি বুঝি অস্থির হই!'

সন্ধ্যায় দরজায় একটা টোকা পড়তে না পড়তেই দুটি উৎসুক হাতে দরজাটি খুলে যায়, সারাদিনের পরিশ্রম-শ্রান্ত ছেলেটি ধীরে ধীরে গিয়ে পরিষ্কার বিছানায়

একটু হাঁপিয়ে আপত্তি করে বলে, 'না গো, তোমার জুতোর ফিতে খুলে দিতে হবে না।' মেয়েটি প্রতিবাদ করে বলে, 'তা দিলেই বা তাতে দোষ কি?' ছেলেটি একটু রাগ দেখিয়ে বলে, 'ওটা কি আমি নিজে পারিনে?' মেয়েটি খুলতে খুলতে বলে, 'তা হোক্—তুমি চুপ করো দেখি।'

ছুটির দিন তাদের আসে। সেদিন একটু ভালো খাবারদাবারের আয়োজন হয়, কোনদিন দুটি একটি বন্ধু আসে নিমন্ত্রিত হয়ে। মেয়েটি সলজ্জ-সঙ্কোচে আপাদমস্তক অবগুণ্ঠিত হয়ে পরিবেশন করে। সে-দিন বিছানায় আলস্যে হেলান দিয়ে গল্প করবার দুপুর। জ্ঞানাভিমানহীন কেরানী আর কেরানী-প্রিয়ার সাধারণ আনন্দ-আলাপ। জটিল তর্কের দুরূহ সমস্যার গোলকধাঁধায় তারা ঘুরে ঘুরে হয়রান হয় না, সহজেই সে-সব মীমাংসা করে ফেলে। মেয়েটি হয়ত জিজ্ঞাসা করে, 'আচ্ছা, মশা মারলে পাপ হয় ত?' ছেলেটি হয়ত বলে, 'নিশ্চয়ই; আর মেরো না।' মেয়েটি বলে, 'কেন! কিন্তু রোজ যে মাছগুলো মেরে খাও, পাঁঠার মাংস খাও, তার বেলা?' ছেলেটি একটু বিব্রত হয়ে বলে, 'বাঃ! ও যে আমাদের আহার। যা আমাদের আহারের তা খেলে কি পাপ হয়?—তা হ'লে ভগবান্ আমাদের আহার দেবেন কেন?' মেয়েটি বলে, 'ও—।' মেয়েটি হয়ত বলে, 'ওদের বাড়ির বৌরা কাল বেড়াতে এসেছিল, ওরা বলছিল কোন্ গণৎকার নাকি গুনে বলেছে আর দশ দিন বাদে পৃথিবীটা চুরমার হয়ে যাবে একটা ধূমকেতুর সঙ্গে ধাক্কা লেগে,—সত্যি?' ছেলেটি হেসে বলে, 'মেয়েদের যেমন সব আজগুবি কথা! চুরমার হবে গেলেই হ'ল কিনা!' মেয়েটি গম্ভীর হয়ে বলে, 'আমি কিন্তু বিশ্বাস করিনি। আর একবারও ত অমনি কথা উঠেছিল, তখন আমাদের বিয়ে হয়নি?' এমনিতর তাদের ছুটির আনন্দগুঞ্জন।

একদিন ছেলেটি ট্রামের পয়সা বাঁচিয়ে হেঁটে এল। সেই পয়সায় রাস্তার মোড়ে একটি গোড়ের মালা কিনলে। ঘরে এসে হঠাৎ মেয়েটির খোঁপায় জড়িয়ে দিয়ে বললে, 'বলো দেখি কেমন গন্ধ?' মেয়েটি বিস্মিত আনন্দে মালাটি খোঁপার থেকে খুলে দেখতে একটু অনুযোগের সুরে বললে, 'কেন আবার তুমি বাজে পয়সা খরচ করতে গেলে বলো ত?' ছেলেটি বললে, 'বাজে পয়সা খরচ নয়ই। ট্রামের পয়সা আজ বাঁচিয়ে তাইতে কিনেছি।' এবার মেয়েটি সত্যি রেগে বললে, 'এই ছাই ফুলের

মালা কেনবার জন্যে তুমি এই পথটা হেঁটে এলে? যাও, চাইনে আমি তোমার ফুলের মালা!' ছেলেটি ক্ষুব্ধস্বরে বললে, 'বাঃ—অমনি রাগ হয়ে গেল, সব কথা আগে শুনলে না কিছু না, অমনি রাগ। আজ অফিসে বড্ড মাথাটা ধরেছিল, ভাবলুম মাঠের ভিতর দিয়ে হাওয়ায় হেঁটে গেলে ছেড়ে যাবে,—তার উপর সকাল সকাল ছুটি হ'ল; একি এতই অন্যায় হয়ে গেছে? বেশ যা হোক্।' মেয়েটি একটু কাতর হয়ে বললে, 'আমি রাগ করলুম কোথায়? তুমি মিছিমিছি ফুলের মালা কেনবার জন্যে হেঁটে এসেছ ভেবে—'। ছেলেটি বললে, 'যাও, ফুলের মালাটা ফেলে দাও তাহ'লে!'—এবার মেয়েটি পরম আনন্দে ফুলের মালাটি খোঁপায় জড়াতে জড়াতে বললে, 'হুঁ—ফেলে দিচ্ছি এই যে! বাবা! একটা ভালো কথা যদি তোমায় বলবার জো আছে।

একদিন একটু বেশি জ্বর হ'ল মেয়েটির। তার পরদিন আরো বাড়ল। তার পরদিনও ক'মল না। অফিস যাবার সময় উৎকণ্ঠিত হয়ে ছেলেটি বললে, 'এখানে এমন করে কি ক'রে চলবে। দেখবার একটা লোক নেই—এই বেলা তোমায় বাপের বাড়ি যাবার বন্দোবস্ত করি।' মেয়েটি বললে, 'না না, ও কালকেই সেরে যাবে···তুমি অফিস যাও, ভাবতে হবে না।' ছেলেটি উদ্বিগ্ন হৃদয়ে কাজে গেল উপায় ভাবতে ভাবতে। তার পরদিনও জ্বর বাড়ল দেখে বললে, 'না, আমার আর সাহস হচ্ছে না। আমি সমস্ত দিন অফিসে থাকি, জ্বর বাড়লে কে তোমায় দেখে। তোমায় রেখে আসি চলো ওখানে।' মেয়েটি করুণ-চোখে তার দিকে চেয়ে রইল, তারপর মুখ ফিরিয়ে বললে, 'আমার সেখানে যাওয়া লাগে না।'

অসুখের মধ্যে রাঁধারাঁধি নিয়ে দুজনের রাগারাগি হয়। মেয়েটি বলে, 'আমি খুব পারব—তোমায় না খেয়ে অফিস যাওয়া হবে না।' ছেলেটি বলে, 'তুমি পারলেও আমি রাঁধতে দেব না। আমি না-হয় হোটেলে খাব।' মেয়েটি বলে, 'হ্যাঁ, ভদ্রলোকে বুঝি হোটেলে খেতে পারে?' ছেলেটি বলে, 'দরকার হ'লে সব পারে।' মেয়েটি তবু বলে, 'তোমার এখনো ত দরকার হয়নি।'

তারপর জোর করে মেয়েটি রাঁধতে যায়। ছেলেটি এবার খুব রাগ করে, ভীষণ এক দিব্যি দিয়ে বলে, 'যে আজ রাঁধবে সে আমার মরা মুখ দেখবে।' মেয়েটি দিব্যি শুনে স্তম্ভিত হয়ে বিছানায় শুয়ে কাঁদতে থাকে। ছেলেটি অনুতপ্ত

হয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে শান্ত করবার চেষ্টায় বলতে থাকে, 'তুমি অবুঝের মতো কেন কচ্ছো, তাই না আমি দিব্যি দিলুম; লক্ষ্মীটি, রাগ কোরো না। আচ্ছা, জেনে শুনে বেশি আগুন-তাতে রেঁধে যদি তোমার জ্বর বেশী বাড়ে তখন ত আমারই কষ্ট বাড়বে। এখন ত একদিন রান্না পাচ্ছিনে, তখন ত কতদিন পাব না—সে ত আমারই কষ্ট...তুমি ভালো হয়ে যত খুশি রেঁধো-না, আমি কি বারণ করছি?' মেয়েটি বলে, 'বেশ ত, খুব হয়েছে, দিব্যি দিয়েছ—আমি ত আর রাঁধতে যাচ্ছিনে!'...ছেলেটি আরো অনুতপ্ত হয়ে বোঝাতে থাকে।

সেবারে জ্বর আপনা থেকেই ধীরে ধীরে সেরে গেল।

তাদের রাগারাগির পালাও এমনি করে সমাপ্ত হ'ল।

নূতন নীড়ে তখন অচেনা অতিথির সমাগম হয়েছে। একটি খোকা।

কিন্তু মেয়েটির আর বাপের বাড়ি থেকে আসা হয়ে উঠল না। অসুখ আর সারতে চায় না, বাপ-মাও অসুখ-সুদ্ধ মেয়েকে ছেড়ে দিতে রাজী হয় না। অভিজ্ঞ-ধাত্রী বলে 'সূতিকা'।

ছেলেটি বন্ধুদের কাছে উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞাসা করে বেড়ায়, 'হ্যাঁ ভাই, সূতিকা হ'লে কি বাঁচে না?'

মেয়েটি দিন দিন আরো কাহিল হয়ে যেতে লাগল—বিছানা থেকে আর উঠবার ক্ষমতা রইল না ক্রমে।

ছেলেটি রোজ অফিসে দেরি হবার জন্যে বকুনি খায়। হিসাবভুলের জন্যে রোজ তাড়া খায়।

কিন্তু তারা শক্তির বিরুদ্ধে এই অকারণ উৎপীড়নের জন্যে বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারে না। বিধাতার উপর এই অন্যায় অবিচারে, বিধাতার পক্ষপাতিত্বে ক্ষিপ্ত হয়ে অভিশাপ দেয় না সক্রোধে। মানুষের কাছে তারা মাথা নিচু ক'রে চলে, বিধাতার কাছেও।

মেয়েটি কোনো দিন স্বামীকে একলা কাছে পেলে, করুণ কাতর চোখে তার মুখের দিকে চেয়ে বলে, 'হ্যাঁ গা, আমি বাঁচব না?'

ছেলেটি জোর করে বুক-ফাটা হাসি হেসে বলে, 'কি যে পাগলের মতন বলো তার ঠিক নেই। বাঁচবে না কেন, কি হয়েছে তোমার?'

মেয়েটি চোখ নাচিয়ে ছদ্মস্বরে বলে, 'আমি মরতে চাইনে কিছুতেই।'

ছেলেটি আবার হেসে বলে, 'ওসব আজগুবি কথা কোথায় পাও বলো ত ?'

একটা হাসি আছে—কান্নার চেয়ে নিদারুণ, কান্নার চেয়ে হৃৎপিণ্ড-নিংড়ানো।

রোগ কিন্তু ক্রমশ বেড়েই চলল। মেয়েটি আর স্বামীর কাছে জিজ্ঞাসা করে না, 'হাঁ গা, আমি বাঁচব না ?' বরঞ্চ তার সামনে প্রফুল্ল মুখ দেখিয়ে হাসতে চেষ্টা ক'রে বলে, 'তুমি ভাবছ কেন, আমি ত শীগ্‌গীরই সেরে উঠছি।' তারপর ঘরকন্না পাতবার নব নব কল্পনার গল্প করে, কেমন করে ছেলে মানুষ করবে, তার নাম কি রাখবে, এইসব। ছেলেটিও তার শিয়রে ব'সে করুণ হেসে তার শীর্ণ হাতটি নিজের হাতে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে শোনে। মেয়েটি বলে, 'তুমি ভেবে ভেবে মন খারাপ কোরো না, আমি ঠিক সেরে উঠব।' ছেলেটি বলে, 'কই, আমি ভাবিনে ত! সেরে উঠবে না ত কি, নিশ্চয়ই উঠবে।' কিন্তু তারা বুঝতে পারে, এ ছলনা দুজনের কারুরই বুঝতে বাকি নেই। তবু তারা পরস্পরকে সান্ত্বনা দিতে এই করুণ ছলনার নিষ্ঠুর মর্মান্তিক অভিনয় করে। তারপর লুকিয়ে কাঁদে।

তবু ছেলেটিকে নিত্যনিয়মিত অফিস যেতে হয়। বড় বড় বাঁধানো খাতাগুলোর নির্ভুল গোটা-গোটা অক্ষরগুলো নির্বিকারভাবে চেয়ে থাকে। তেমনি হিসাবের পর হিসাব নকল করতে হয়।

তাড়াতাড়ি ঘরে ফেরবার জন্যে প্রাণ আকুল হয়ে উঠলেও ছেলেটি হেঁটে আসে—ট্রামের পয়সা বাঁচিয়ে ফুলের মালা কেনবার জন্যে নয়—অসুখের খরচ যোগাতে।

কোনো সময় হয়ত একবারটি মনে হয় যদি সে এমন গরীব না হ'ত, আরো ভালো করে ডাক্তার দেখিয়ে আর-একটু চেষ্টা করে দেখত।

শুধু সেদিন জ্ঞান হারাবার আগে মেয়েটি একটিবারের জন্যে এতদিনকার মিথ্যা করুণ ছলনা ভেঙে দিয়ে কেঁদে ফেলে বললে, 'আমি মরতে চাইনি,—ভগবানের কাছে রাতদিন কেঁদে জীবন ভিক্ষা চেয়েছি, কিন্তু

সব ফুরিয়ে গেল।

তখন কাল-বোশেখীর উন্মত্ত মসীবরণ আকাশে নীড়ভাঙার মহোৎসব লেগেছে।

বৃষ্টি

বৃষ্টি আর বৃষ্টি।—এমন বর্ষা বাঙলা দেশে বুঝি আর কখনও আসেনি। [illegible] নিঃশেষে শোষণ করে সূর্য যেন সমস্ত দেশকে জলে ধুয়ে ফেলার সঙ্কল্প করেছে। আকাশের জল আর যেন ফুরোবে না। দিনের পর দিন অবিশ্রান্ত চলেছে বর্ষণ; ছেদ নেই বিরাম নেই। গ্রীষ্মের তপ্ত আকাশে প্রথম কালো কাজলের মতো মেঘের আবির্ভাবের আনন্দ কবে মানুষ ভুলে গেছে। বর্ষার সে মোহ আর নেই। এখন শুধু বিরক্তি, শুধু অবসাদ! মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে তাকিয়ে শুধু হতাশ প্রতীক্ষা।

একটুখানি নীল আকাশ, একটুখানি সোনালী রোদ,—প্রতুলের মনে হয় সে যেন কত যুগ সেই আকাশ দেখেনি। এই মেঘ কেটে গিয়ে সমস্ত সৃষ্টি আবার প্রখর সূর্যালোকে হেসে উঠবে একথা এখন আর বিশ্বাস করা যায় না। মনে হয় পৃথিবী বুঝি আবার তার আদিম শৈশবে ফিরে গেছে;—ঘন মেঘাচ্ছন্ন আকাশ যখন দিনের সূর্যালোক আর রাতের তারাকে অবিশ্রাম আচ্ছন্ন করে থাকত।

তার মনে হয়, এমনি কোনো সুদীর্ঘ বর্ষাঋতুর মাঝে সুদূর কালের কোনো কবি প্রথম সূর্যোপাসনার মন্ত্র রচনা করেছিল। তার মনের ভেতরও অমনি প্রার্থনা ধ্বনিত হয়ে ওঠে—আলো আর তাপ, জীবন আর শক্তির জন্য প্রার্থনা। সূর্যকে কেন মানুষ দেবতা করেছে আজ যেন সে প্রথম ভালো করে বুঝতে পারে। [illegible] সে কেমন করে একদিন তাকে [illegible] গভীর বিস্ময় যেন তাকে তেমন গভীরভাবে [illegible] করেনি এতদিন।

আজ যখন মেঘে মেঘে আকাশ হয়েছে অন্ধকার, সমস্ত প্রকৃতি বিবর্ণ ম্লান হয়ে এসেছে [illegible], তখনই সে বুঝতে পারলে সূর্যের মূল্য। বুঝতে পারলে কেন প্রাচীন বিস্ময়ে তা ছিল দেবতা দিয়েছিলেন; কেন দেশে দেশে, যুগে যুগে, নব নব পাওয়া শক্তি [illegible] বিভিন্ন রূপে।

জানলার ধারে সে [illegible] বসেছে। [illegible] দিয়ে এসে পড়েছে [illegible]। সে [illegible]

যায় না, ভালো করে কিছু বোঝা যায় না। তার মনের দীপও কবেই আজ নিষ্প্রভ। আকাশের আলোর সঙ্গে তারও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে যেন। নিজের কাছে নিজেই সে আজ অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, নিজেকে ভালো করে চেনবার তার শক্তি নেই, উৎসাহও নেই।

বাইরে বৃষ্টিধারায় ঝাপসা নগর-শিখরের বিকৃত রেখা দেখা যাচ্ছে। ছাইরঙের আকাশ মৃত মুখের মতো বিবর্ণ। সমস্ত নগর সে আকাশের তলায় যেন মৃত্যুশয্যা নিয়েছে। তার প্রাণস্পন্দন আছে কিনা বোঝা যায় না।

প্রতুলের মনে হয় সে নিজেও যেন অর্ধ-মৃত, চারিদিকের অন্ধকারে তার চেতনার দীপ ক্রমেই নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছে। তবু তার সাড়া নেই উৎসাহ নেই এতটুকু নিজেকে উদ্ধার করবার।

বর্ষার গাঢ় মৃত্যুগম্ভীর অবসাদ তার মনে সঞ্চারিত হয়ে যাচ্ছে। আজ বুঝি কিছুতেই কিছু আসে যায় না। বাইরের আকাশের দিকে চেয়ে কে আজ বলবে, এই পৃথিবী কিছুদিন আগেই ছিল আলোকে আনন্দে উজ্জ্বল, প্রাণের চাঞ্চল্যে স্পন্দমান। পরিত্যক্ত মৃত ধরণী যেন বহুকাল ধ'রে এমনই পড়ে আছে নির্জীব হয়ে। প্রাণের সমস্ত অঙ্কুর তার দেহ থেকে ধুয়ে গেছে নিশ্চিহ্ন হয়ে। প্রতুলের জীবনও যেন তেমনি। রূপে বর্ণে ঝলমল দিন কবে তার জীবনে এসেছিল তা আজ স্মরণও ত হয় না। বর্ষার অবিরাম ধারায় সব ধুয়ে গেছে—আছে শুধু এই অবসাদ, এই নিশ্চেষ্টতার মৃত্যু!

ঝুপ, ঝুপ, ঝুপ, ঝুপ। একঘেয়ে বৃষ্টির আওয়াজ শুনতে শুনতে দেহ মন অবশ হয়ে আসে, তন্দ্রা নামে চেতনার ওপর। সে তন্দ্রার মধ্যে মনে হয়—সমস্ত নিরর্থক, জীবন নিয়ে এত আস্ফালন, এত উদ্বেগ, এত ব্যস্ততা কিছুরই মানে হয় না। শেষে ত সেই উদাসীন অন্ধকার অপেক্ষা করে আছে সমস্ত দুর্দিনের জন্যে। এত ভাবনা, এত বেদনা, এত ছটফটানি সমস্ত বৃথা। সে অতল অন্ধকারে কে জানবে তুমি কেমন ক'রে কত দুঃখ করে জীবনের তুলি চালিয়েছ! কোথায় তুমি পেলে আঘাত আর কোথায় আনন্দ! তোমার জীবনের এই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ অন্ধকারে সমস্ত মিলিয়ে একাকার হয়ে যাবে।

অথচ তিনমাস আগে এই জীবনের তুচ্ছতম ঘটনাটিও কি মহার্ঘ মনে হয়েছিল তার। মনে হয়েছিল মহাকালের বুকে তার জীবনের এ সোনার অক্ষরে লেখা কাহিনী অমর হয়ে রইল। শরীর তখন সে সেরে; অন্ধকারকে ঝিলমিল করে রাখি

তার তারার ঐশ্বর্য ছিটিয়ে যেন শুধু তারই কথা, সূর্যাস্তের বর্ণ-সমারোহ যেন তাকেই প্রণাম করবার জন্য আকাশের আয়োজন। পথের ধারে বিদেশী গাছে নতুন পত্রপুষ্প যেন তারই অপেক্ষায় আকাশে আত্মপ্রকাশ করেছে। কি সযত্ন অনুরাগে সে সেদিন প্রতিদিনের তুচ্ছতম ঘটনাটি সঞ্চয় করে রেখেছে;—কিছু সে হারিয়ে যেতে দেবে না, এই বুঝি তার গোপন মনের ছিল অহঙ্কার। পৃথিবীর সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের চেয়ে তার সে কাহিনী সেদিন ছিল মূল্যবান।

গভীর রাত্রে সেই লিখতে বসা তার স্মরণ হয়, সমস্ত দিনের ঘটনাকে যেন দ্বিতীয় বার সে লেখার ভেতর দিয়ে উপভোগ করত। কি সে জীবন! বিচিত্র শাড়ীর হতো তার সর্বাঙ্গে কারুকার্য! সমস্ত সৃষ্টির মাঝে সেদিন সেই একটি জীবনই সব কিছু আড়াল করে ঝলমল করেছে! তার প্রত্যেকটি রেখা প্রত্যেকটি রঙের মনে হয়েছে তুলনা হয় না। তাই না সে ধরে রাখতে চেয়েছে তার সমস্ত বিবরণ।

বাইরে তখন নিদ্রিত নগর। ভেতরে বসে সে লিখছে হয়ত—

[illegible] কি ভাবছিল কে জানে! এক ঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে আছি রাস্তার ধারে, ট্রামের পর ট্রাম বাসের পর বাস পার হয়ে যাচ্ছে, তবু ওঠবার নাম নেই। আমার কেমন লজ্জা বোধ হচ্ছিল। তবে আমার লজ্জা হয়ত কেউ তেমন নজর করেনি। ওপারের রাস্তার বাঁকে ওকে দেখা যেতেই অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে স্টপেজের কাছে পায়চারী করতে লাগলাম। আমার এখুনি একটা বাস পাওয়া দরকার। না হ'লেই নয়। ও কি এ চাতুরী বুঝতে পেরেছিল? কে জানে! রাস্তাটা পার হয়ে আমার কাছে এসে একটু হাসল!

বললাম, 'আজকেও ঠিক এক সময়ে দু'জনে এসে পড়েছি! কি কোয়েন্সিডেন্স!'

[illegible] কথা অবশ্য গোপন রাখলুম। এই কোয়েন্সিডেন্সের জন্য [illegible] আমায় একটু ব্যবস্থা করতে হয়েছে, ঘণ্টাখানেক রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থেকে।

ও একবার একটু হাসল। বললাম, 'আজ আপনার একটু দেরী হয়ে যাবে বোধ হয়।'

'না, দেরী ত হয়নি! এখনও মিনিট [illegible] সময় আছে। দশ মিনিটে পৌঁছান যাবে না?'

'তা যেতে পারে। তবে বাসগুলো যা ঢিমে চালে চলে।'

সামনে একটা বাস এসে পড়েছে, লতিকা উঠতে যাচ্ছিল। দেরী হওয়া সত্ত্বে নিজের আপত্তি হঠাৎ ভুলে বললাম, 'না না, এটায় বড় ভীড়!'

'কিন্তু দেরী হয়ে যাবে যে।'

অম্লান বদনে বললাম, 'বাঃ, এখনো ত দশ মিনিট আছে।'

লতিকা আবার হাসল ; তার মুখ ভালো ক'রে লক্ষ্য করে দেখলাম। না, বিদ্রূপের হাসি বোধ হয় নয়।

দ্বিতীয় বাসটাতেও ভীড়। কিন্তু আর না উঠলে চলে না। হঠাৎ অসম-সাহসিক একটা কাজ করে ফেললাম।—'ট্যাক্সি। ট্যাক্সি।'

লতিকা যদি আমার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে তা হ'লে ওর সামনে আর মুখ তুলতে পারব না। এইখান থেকেই এ পর্বের ছেদ। একটি অনিশ্চয়তার ভয়ংকর মুহূর্ত। সমস্ত সৃষ্টি দুলছে সে মুহূর্তটির মাঝে! লতিকা কি অস্বীকার করবে ট্যাক্সিতে উঠতে?

ট্যাক্সি ড্রাইভার ঘুরে এসে সামনে দরজা খুলে গাড়ি দাঁড় করিয়েছে।

তৃতীয় বার নিজের কথার প্রতিবাদ করে বললাম, 'সময় বড্ড কম। চলুন ট্যাক্সিতেই যাই।'

লতিকার মুখের দিকে চাইতে পারছি না। নিজের কান পর্যন্ত লাল হয়ে উঠেছে।

লতিকা ট্যাক্সিতে উঠেছে। বাঁ হাতে শাড়ীটাকে একটু সামলে নিয়ে হেলান দিয়ে বসেছে। নিজের সৌভাগ্যে বিশ্বাস করতে না পেরে আমি উঠলাম ঠিক অভিভূতের মতো। তারপর ট্যাক্সির স্টার্ট নেবার ঝাঁকুনি। আচ্ছন্ন ভাব আমার কেটে গেল।

বাসে লাগত দশ মিনিট! ট্যাক্সিতে হয়ত সাত মিনিটের বেশী লাগবে না। সাতটি মাত্র মিনিট ; সাত সপ্তাহ—না, সাত সুদীর্ঘ বৎসরের চেয়ে মহার্ঘ সাতটি মিনিট। লতিকাকে প্রথম একান্ত ভাবে পাওয়ার এই দুর্লভ অবসর। মনে হ'ল এই ক'টি মুহূর্তকে সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগাতেই হবে। কত কথা আছে বলবার, জীবনের গভীরতম কথা। এই সাত মিনিটে লতিকার প্রতিদিনের ব্যবহারিক মুখোশ সরিয়ে তার গোপন অন্তরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে। কি কথার কি ইঙ্গিতে লতিকার বাইরের মনের দ্বার যাবে খুলে?

কিন্তু হায়। মোটরের ঘূর্ণ্যমান চাকার সঙ্গে দ্রুত পায়ে সময় চলল এগিয়ে। আমরা কি আলাপ করলাম।—

'আপনার এবার বোনের খবর কি?'

'একটু ভালো। আপনি কিছু পেলেন নাকি পরীক্ষায়?'

'সেপ্টিসিম্ নেই বলেই মনে হয়। কর্পাস্‌লের পারসেন্টেজ নর্ম্যাল।'

খানিক নীরবতা। চাকার শব্দ, মোটরের হর্ন, ট্যাক্সি মোড় ফেরায় দরুন একটা টান। লতিকার কাঁধটা আমায় স্পর্শ করে গেল। মৃদু কোমল একটু তাপ বোধ।

লতিকা বললে, 'কী গরম দেখেছেন এরি মধ্যে? হাওয়াটাও যেন আগুনের হলকা। এবারে বৃষ্টি হবে কবে?'

বললাম, 'সমস্ত বৃষ্টি জমা হচ্ছে। যখন ঢালতে আরম্ভ করবে তখন আর বিশ্রাম থাকবে না। হাঁপিয়ে উঠতে হবে।'

'সেও আমার ভালো। এ গরম আর সহ্য হয় না। আকাশের দিকে চাইলে চোখ ঝলসে যায়। মনে হয় কখনও যেন মেঘ দেখিনি।'

আবার নীরবতা। ট্যাক্সি হাসপাতালের রাস্তায় এসে পড়েছে। সময় নেই, সময় নেই! এ সুযোগ আর কখন মিলবে না। কি করছ প্রতুল? লতিকার দেহের উষ্ণ কোমল স্পর্শও তোমাকে উদ্দীপ্ত করতে পারেনি? লতিকার চোখে কি ব্যগ্র প্রতীক্ষার আভাস তুমি দেখতে পাওনি? বলো, একটা কিছু বলো। প্রতিদিনের এই তুচ্ছ অর্থহীন আলাপের আবরণ সরে যাক।

শুধু বললাম, 'এখন আপনার ডে-ডিউটি চলবে ত?'

ট্যাক্সি হাসপাতালের দেউড়ি দিয়ে ঢুকল। লতিকা নামতে নামতে বললে, 'না, এই হপ্তাটা বাদেই আবার নাইট-ডিউটি।'

দুজনে নেমে পড়েছি। ডা: মৈত্র সামনের ওয়েটিং রুমের দরজা খুলে একবার দেখলেন। আমাদের দিকে কুটিল ভাবে একবার চেয়ে আবার তিনি ভেতরে ঢুকে গেলেন। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দেখি লতিকা আর নেই।

মাইক্রস্কোপের তলায় সৃষ্টির আণুবীক্ষণিক রহস্য-সমুদ্রে একদিন আমি নিশ্চিন্তভাবে মগ্ন হয়ে থাকতে ভালোবাসতাম। কাচের স্লাইডের মাঝে রক্তবিন্দু, সে রক্তবিন্দুর মাঝে বিস্ময়কর জগৎ। বাইরের সমস্ত আবেষ্টন ভুলে আমি সেই জগতে নব নব অভিযান করবার চেষ্টা করছি। সেই ছিল আমার একমাত্র আনন্দ। আজকাল কিন্তু আমার কি হয়েছে! থেকে থেকে বুকের ভেতর অদ্ভুত আনন্দ-শিহরণ অনুভব করি। মাইক্রস্কোপের নলের ভেতর না গিয়ে দৃষ্টি চলে যায় জানলা পার হয়ে বাইরে। দূরে বড় রাস্তা, তার ওপারে ফাঁকা মাঠ। দূরের

ক'টা বাড়ি সেখানে তৈরী হতে আরম্ভ হয়েছে। মজুর-মজুরনী সুর ক'রে গান গাইতে গাইতে একটা ছাদ পিটছে। প্রখর সূর্যের আলো একটা চলন্ত মোটরের কাচে প্রতিফলিত হয়ে আমার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। অপরূপ, সমস্ত অপরূপ! রক্ত—রক্ত—কি হবে শুনে তার কলগান? বরং শুনি হৃদয়ের সমুদ্রবেলায় তার ঢেউ। রক্তকে বিশ্লেষণ করে কে কবে তার রহস্য জানতে পেরেছে! কে জানতে পেরেছে তার স্বরূপ?

• • •

নূতন একটা মেঘ বুঝি আরো কালো হয়ে নেমে এল। ঘর আরো অন্ধকার হয়ে এসেছে। বৃষ্টি এবার প্রবল ধারে পড়ছে। ঝম্ ঝম্, ঝম্ ঝম্। প্রতুলের মনে হয় চারিধার থেকে এই শব্দের কারাগার যেন তাকে ঘিরে ধরেছে। কারাগার ক্রমশঃ আসছে সঙ্কীর্ণ হয়ে। ঝম্ ঝম্ ঝম্—এ যেন তার শৃঙ্খলের শব্দ—তার শেষ চেতনার আশ্রয়টুকুও সে কেড়ে নেবে—তার সত্তার শেষ স্বাতন্ত্র্যটুকু ঘুচিয়ে।

প্রতুলের মন হতাশ হয়ে আবার সেই দিনগুলিতে বুঝি ফিরে যেতে চায়।

বিকেল না হতেই কোথা থেকে পশ্চিম আকাশে মেঘ এসে জমা হচ্ছে ক'দিন ধরে। তার পর কালো মেঘের পালের মতো সে যেন দুরন্তভাবে আসছে ছুটে সমস্ত আকাশ ঢেকে; দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত ধুলোর আর জঞ্জালের রাশ উড়িয়ে।

'এই ঝড়ের ভেতর কোথায় বেরুচ্ছেন? একটু অপেক্ষা করে যান।'

প্রতুল কি কাজে ঠিক সেই সময়টিতে মেটারনিটি ওয়ার্ডে গিয়ে পড়েছে বলা যায় না। লতিকা থমকে দাঁড়িয়ে প'ড়ে একটু হেসে বলে, 'আমার বাড়িতে বড় দরকার, যেতেই হবে এখন।'

'ঝড়ে, ধুলোয় যে নাকানি চোবানি খাবেন।'

'তা একটু খেলেই বা! আমার কি জানি কেন ছেলেবেলা থেকে ঝড়ের ভেতর বেরুতে ভারী ভালো লাগে। ছেলেবেলা আমরা এমনি ঝড়ে আম কুড়োতে বেরুতাম।'

লৌকিকতার জন্যে যেটুকু দরকার তার বেশী অনেকখানি বলে ফেলেছে বুঝেই লজ্জিত হয়ে বোধ হয় লতিকা হঠাৎ থেমে যায়।

প্রতুল উৎসাহিত হয়ে ওঠে—'আপনাদের বাড়ি বুঝি পাড়াগাঁয়ে? তা আপনার স্বাস্থ্য দেখেই বোঝা যায় আপনি শহুরে নন।'

হেসে ফেলে লতিকা বলে, 'মাইক্রস্কোপে চোখ ডুবিয়ে থাকতে থাকতে সবকিছু যে গুলিয়ে ফেলেছেন। আমাদের পাড়াগাঁ ম্যালেরিয়ার ডিপো। সেখানে মানুষ একবেলা ভাত খায়, অন্যবেলা কুইনিন।'

খুব গম্ভীর ক'রে প্রতুল বলে, 'আহা, আমিও তো সেই কথাই বলছি। পাড়াগাঁয়ে বাড়ি না হ'লে আপনার স্বাস্থ্য আরো ভালো হ'ত।'

এবার হঠাৎ দুজনেই হেসে ওঠে। টপ্ টপ্ করে কয়েকটা বড় বড় ফোঁটা বৃষ্টি পড়ে তাদের চারিধারে। রাস্তা থেকে একটা ধুলোর প্রবাহ হঠাৎ তাদের গেটের কাছে ঘুরপাক খেয়ে, খেয়ালভরে ভেতরে ঢুকে প'ড়ে তাদের গায়ের উপর দিয়ে বয়ে যায়। সে ধুলো যেতে না যেতেই চোখ-ধাঁধানো বিদ্যুৎ-চমক। তার পরে মেঘের গুরুগম্ভীর আওয়াজ। আকাশের মেঝেতে মস্ত বড় একটা ভারী লোহার গোলা কে যেন ফেলে দিয়েছে, আর আওয়াজটা গড়াতে গড়াতে আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে গিয়ে মিলিয়ে যায়। বৃষ্টির ফোঁটা আরো জোরে পড়তে আরম্ভ হয়েছে। ধুলোর ওপর ছোট ছোট জলের দাগ পড়ে। নীচের দিকে চেয়ে থাকলে মনে হয় ধরণীর যেন রোমাঞ্চ হচ্ছে। স্নিগ্ধ একটি সোঁদা মাটির গন্ধ উঠতে থাকে—সে গন্ধে যেন নেশা ধরে মনে।

প্রতুল হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে বলে, 'চলুন, আমিও আপনার সঙ্গে বেরুচ্ছি।'

'এই না ক্ষণে বেরুতে আমায় মানা করছিলেন?'

প্রতুল নিজের উল্টো কথায় মনে বিন্দুমাত্র লজ্জিত না হয়ে বলে, 'দুজনে বেরুলে দোষ নেই।'

'বৃষ্টি কিন্তু আরো জোরে পড়ছে।'

'ঝড়ও আরো জোরে বইছে।'

'সুতরাং দোষ নেই, কেমন না?'

'নিশ্চয়ই নেই। ধুলো ওড়ে না, জল পড়ে না এমন ঝড়-বৃষ্টিতে বেড়াতে চায় নাকি?'

দুজনে হাসতে হাসতে গেট দিয়ে বেরোয়। রাস্তায় যেন আর অতিরিক্ত ব্যস্ততা। খোলো হাওয়ার দাপে, মেঘাচ্ছন্ন আকাশের স্তিমিত আলোয় সমস্ত পরিচিত দৃশ্যের রূপ যেন বদলে গেছে।

দুজনে ভিজতে ভিজতে গিয়ে একটা দোতলা বাসের মাথায় গিয়ে ওঠে। এবার ঝড়ের চেয়ে বৃষ্টির প্রকোপ বেশী। সজোরে ছাট এসে লাগছে কাচের সার্শিতে। সামনের কাঁচের জানলার ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে সুদীর্ঘ আর্দ্র পথের রেখা।

ওপরে তারা দুজনই মাত্র আরোহী। গাড়ির ঝাঁকানির সঙ্গে সঙ্গে পরস্পরের দেহ স্পর্শ করতে থাকে। বৃষ্টিমুখর এই সন্ধ্যায় পাশাপাশি বসে থাকার ভেতর কি যেন একটা ইঙ্গিত আছে ভাবী কালের।

লতিকা হঠাৎ বলে, 'আপনি আর ৭নং বেডের খোঁজ নেন না যে?'

'তাই ত, ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু তিনি ত আজ ক'দিন হ'ল ডিস্চার্জড্ হয়েছেন, না?'

'তা হ'লে বুঝি আর খোঁজ নিতে নেই?'

'আছে। কিন্তু অত সময় কই? পৃথিবীর সবাকার খোঁজ কি রাখতে পারি?'

লতিকা হেসে বলে, 'আপনারা বেশ লোক, আপনাদের অণুবীক্ষণের তলায় না এলে আর কোনো পরিচয়ের উৎসাহ নেই।'

প্রতুল হেসে বললে, 'ঠিক তা নয়। কাউকে কাউকে দূরবীক্ষণ দিয়েও খুঁজে ফিরি এবং পাই না।'

'বিশ্বাস ত হয় না।'

'ওই ত আমাদের দুর্ভাগ্য। আমাদের বুকপকেটে লোকে শুধু স্টেথোস্-কোপই দেখে, তার নীচে আর কিছু আছে ব'লে মনে করে না। সে যা হোক। ৭নং বেডের মহিলাটির সঙ্গে আপনার সম্পর্ক আছে নাকি কোনো?'

'আছে বই কি। তিনি আমার পিসি হন।'

'তাই নাকি!'

প্রতুল হঠাৎ চুপ করে যায়। মনে হয় সম্পর্কটুকু তার বোঝা উচিত ছিল। এই ৭নং বেডের সম্পর্কেই তার সঙ্গে লতিকার প্রথম পরিচয়। প্রস্থতির শরীরে বিশেষ কোন ব্যাধির স্পষ্ট লক্ষণ নেই—অথচ জ্বর হচ্ছে নিয়মিত। তাঃ মৈত্র তাকে রক্তটা পরীক্ষা করতে বলেছিলেন। সেই রক্ত নিতে গিয়েই বিশেষ করে সে লতিকাকে সেদিন দেখতে পায়। তার আগে হাসপাতালের আরো বহু সেবিকার ভীড়ে লতিকা ছিল প্রচ্ছন্ন হয়ে। সেদিন সে একটি স্বতন্ত্র রূপে দেখা

কিন্ত। পা'টিয়ার রঙ বেশ, দেহ বেশ সবল মনে হ'লেও মুখটি কেমন একটু শীর্ণ। সে মুখের ঈষৎ পাণ্ডুর আভাই সেদিন তাকে মুগ্ধ করেছিল। লতিকা সযত্নে ঝুঁকে পড়েছে রোগিণীর বিছানার ওপর; চোখে তার সস্নেহ ব্যাকুলতা। প্রতুলের দেখে মনে হয়েছিল এই যেন মূর্তিমতী শুশ্রূষা। কাঁটা বিঁধিয়ে প্লাইডে রক্ত নেবার সময় লতিকা এসে রোগিণীর শীর্ণ হাতটি ধরেছিল। ঠিক বৈজ্ঞানিক তন্ময়তা তখন আর প্রতুলের ছিল না; অনিচ্ছাসত্ত্বেও রোগিণীর বদলে লতিকার নিটোল মসৃণ হাত দুটির দিকে সে একবার না চেয়ে পারে নি। হাত দুটি নিরাভরণ বললেই হয়—দুটি প্লেন বালা সে বাহুর সৌষ্ঠবের সঙ্গে যেন মিশে গেছে।

প্রতুল তার বর্ণহীন ডাক্তারিকণ্ঠে অভ্যাসমতো বলতে যাচ্ছিল, 'কিছু ভয় নেই আপনার। মুখটা ওদিকে ফিরিয়ে থাকুন। পিঁপড়ের কামড় সয়েছেন তো? তবে আর কি।'

লতিকা তার বাক্যেই স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললে, 'উনি ত শুধু একটু আঁচড় দেবেন। কিছু লাগবে না। হাতটা আলগা করে রাখো।'

কণ্ঠস্বর সত্যি বলতে গেলে ঠিক মধুর, বীণানিন্দিত নয়—ঈষৎ ধরা বলেই মনে হয়—স্বরের প্রান্তগুলি যেন মসৃণ নয়, একটু খসখসে—কিন্তু প্রতুলের সমস্ত মন স্নিগ্ধ হয়ে গেছল। লতিকার অবর্ণনীয় সুষমার সঙ্গে কণ্ঠস্বরটিরও অপরূপ সামঞ্জস্য আছে। প্রতুল সেই মুহূর্তেই বুঝতে পেরেছিল তার জীবন নূতন এক পাতা উল্টাচ্ছে। প্রতিদিন কত মানুষের সংস্রবেই ত আসতে হয়, কত দাগ পড়ে মনে, কিন্তু সে সমস্ত অবিলম্বে যায় মিলিয়ে। আমাদের গোপন সত্তা থাকে অবিকৃত, অবিচলিত। কিন্তু এবার বুঝি আর তা হবার জো নেই। কত-বার সেই যে মনের গোপন মহল, যেখানে সকল সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মানুষ একাকী বাস করে, সেখানকার নিঃসঙ্গতা তার এইবার গেল ঘুচে। মনের বাইরের ঘর থেকে এই অতিথিকে বিদায় দেওয়া যাবে না। কেন যে যাবে না তা সে নিজেই ভালো করে জানে না, কিন্তু হঠাৎ জীবনে ভোজবাজীর মতো অদ্ভুত ব্যাপার যে একটা ঘটেছে এ বিষয়ে তার আর কোনো সন্দেহ ছিল না।

প্লাইডে রক্তের নমুনা নিয়ে, সেটা ব্যাগ-জাত ক'রে উঠে আসবার সময় লতিকাও সঙ্গে সঙ্গে দরজা পর্যন্ত এসেছিল; মাথা নীচু করে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কুণ্ঠিত স্বরে বলেছিল, 'রিপোর্টটা একটু তাড়াতাড়ি পাওয়া যাবে ত? ডাঃ বৈদ্য বলেছেন রিপোর্ট না পেলে কিছু করতে পারবেন না।'

সাধারণ একজন রোগিণীর জন্তে নার্সের এতখানি ব্যাকুলতার কোনো অর্থ হয় না। তখনই ভেতরে আরও কিছু আছে তার বোঝা উচিত ছিল। কিন্তু সে তেমন কিছু বোঝেনি। কণ্ঠকে যতদূর সম্ভব ডাক্তারী মর্যাদানুযায়ী উদাসীন করবার চেষ্টা করে বলেছিল, 'ভয় নেই ঠিক সময়েই পাবেন।'

তারপর লতিকার মিনতিকাতর দৃষ্টির সামনে হঠাৎ কেমন অস্বস্তি অনুভব ক'রে তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেছল।......

প্রতুল হঠাৎ বুঝতে পারে, খানিকক্ষণ সে অস্বাভাবিকভাবে চুপ করে আছে। বাইরে বৃষ্টি আর ঝড়ের মধ্যে চলেছে প্রতিযোগিতা; বৃষ্টি একটু আসর জমিয়ে বসতে না বসতেই দমকা ঝড় নিয়ে যাচ্ছে তাকে হাঁকিয়ে। বৃষ্টিধারা হাওয়ার খেয়ালে নানা ভাবে এঁকে বেঁকে পড়ছে। ঘনবর্ষণ হঠাৎ ফিকে হয়ে হাল্কা গুঁড়ি গুঁড়ি জলকণায় মিলিয়ে যাচ্ছে।

প্রতুল আগের কথার খেই টেনে বলে, 'তিনি আপনার দিদি হন তা তখন ত বলেন নি—'

'বলার কি দরকার ছিল? তা ছাড়া তখন ত আলাপ হয় নি।' শেষ কথাটা বলে লতিকা যেন একটু লজ্জিত হয়ে অন্য দিকে মুখ ফেরায়। পাটকরা-চুলের তলায় তার কানের দুলের দিকে চেয়ে প্রতুল বলে, 'আলাপ কি এখনই হয়েছে?'

কোনো উত্তর নেই। লতিকা মুখ ফিরিয়ে অন্য কথা পাড়ে, 'হাওয়ায় সব মেঘ উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে—তেমন বৃষ্টি হ'ল না।'

'আমার যেমন ভাগ্য! কোথায় মুষলধারে বৃষ্টি পড়বে, পথঘাট ডুবে যাবে, বাস্ থাকবে নৌকোর মতো মাঝরাস্তায় আটকে, কেউ নামতে পারবে না—তা নয়, দু'ফোঁটা জল ফেলে আকাশ একটু রসিকতা করে গেল।'

'আপনার শখ ত খুব!' বলে লতিকা হাসে।

তারপর পাতার পর পাতা উল্টে যায় মনের ভেতর—বর্ষার প্রতীক্ষা-ব্যাকুল ও আগমনী-মুখর দিনের পাতা।

...দিনের অসহ্য উত্তাপের পর রাত্রের দুঃসহ গুমোট। সমস্ত সৃষ্টি স্তব্ধ, থমথমে হয়ে সমস্ত প্রকৃতি কার আবির্ভাবের অপেক্ষায়। আসছে, সে আসছে। আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত পথ ভয়ে বিস্ময়ে গেছে থেমে। সে আসছে। অন্ধকার দিগন্তে

জমা হচ্ছে নিঃশব্দে তার পুঞ্জ পুঞ্জ সৈন্যবাহিনী। থেকে থেকে দেখা যাচ্ছে সুদূর তাদের মশালের আলো। তারপর মধ্যরাত্রে হঠাৎ স্তব্ধতা গেল ভেঙে, আকাশের সমস্ত তারা নিভিয়ে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদকে লুণ্ঠন করে ছুটল কালো ঘোড়সওয়ারের দল, তীব্র বৃষ্টিধারার দীর্ঘ চাবুক ছিটিয়ে, আকাশের এক তীর থেকে আর এক তীরে; গুরু গুরু বাজতে লাগল রণ-দামামা, মশাল উঠতে লাগল জ্বলে। আকাশ জয় হয়ে গেল।

এমন রাতে কি ঘুমোনো যায়। ছাদ থেকে নেমে এসে প্রতুল আকাশের দিকে চেয়ে থাকে জানলা দিয়ে। অপরূপ, অপরূপ এই লীলা! তারা-খচিত আকাশের বিস্ময় যতই থাক, তার নিশ্চলতা, তার চিরন্তন স্থৈর্য মনকে এমন করে দোলা দিতে পারে না। আজ যেন সমস্ত আকাশই উঠেছে দুলে, চলেছে অস্থির-ভাবে ভেসে। সূর্যের উত্তাপে মেরুর কঠিন তুষার-প্রান্তর যেমন ফেটে, ভেঙে ছুটন্ত বিপুল চত্বর স্রোতধারায় বয়ে যায়, তেমনি যেন যাচ্ছে আজ আকাশ। কোথায় ধরেছে তার ভাঙন, নেমেছে বিপুল ঢল, বড় বড় পাষাণের চাঁই যাচ্ছে তীরবেগে সে স্রোতে ভেসে। শিলার সঙ্গে শিলার ধাক্কায় ঠিকরে উঠছে আগুনের স্ফুলিঙ্গ।

সত্যি তাহ'লে এল বর্ষা! কাল লতিকাকে কি নাকালই করা যাবে! আজই তাদের কথা হয়েছে। লতিকা বলেছে, 'ক'দিন একটু কালবৈশাখীর হাঁক ডাক দিয়ে আকাশ কেমন বেমালুম চুপ করে গেছে দেখেছ! একটা মেঘের টুকরোও দেখা যায় না। এ গরম আর সহ্য হয় না বাপু।'

'আজ কিন্তু যে রকম গুমোট, রাত্রে ঠিক বৃষ্টি হবে মনে হচ্ছে।' বলেছে প্রতুল।

'আজও ত কিচ্ছুটি হবে না।'

'ঠিক হবে দেখো তখন।'

'কক্খনো না!'

'আচ্ছা বাজী রাখ!'

'বাজী রেখে কেন হারবে! পোকামাকড়ের ডাক্তার তুমি, মেঘ-বৃষ্টির কি জান?'

'পোকামাকড় ছাড়া আরো অনেক কিছু আজকাল জানতে হচ্ছে।'

'কেন বলো দেখি?'

প্রতুল চট্ করে বলে ফেলেছিল, 'তোমার জন্যে।'

• • •

আরো কয়েকটা পাতা। দিনরাত এবার মেঘের বাহিনী চলেছে অলস মন্থর গতিতে দিনের আলোকে স্নিগ্ধ করে আর রাত্রের অন্ধকারকে প্রগাঢ় করে। সে মেঘ কখনও খেয়ালভরে থামে, আকস্মিক করুণায় নেমে আসে কালো হয়ে আরো নীচে, গলে পড়ে ঝরঝিগলিত ধারায়। কখনও বা দিনের পর দিন শুধু ভেসে চলে। আকাশ কিন্তু আর নিরবচ্ছিন্ন ভাবে নীল হবার সুযোগ পায় না, তাতে রঙের রেখার বৈচিত্র্য এসেছে। অন্য সময়ে পৃথিবী থাকে চঞ্চল, আর শান্ত-সমাহিত ধ্যানমগ্ন আকাশ থাকে নিস্পন্দ। আজ আকাশের ধ্যান ভেঙেছে—পৃথিবীর চেয়ে সেখানে বেশী চঞ্চলতা, বেশী ব্যস্ততা। খেয়ালের তার অন্ত নেই।

'বাঃ, বর্ষাতিটা না নিয়েই বেরিয়েছ! বেশ লোক ত! খুব ভিজেছ নাকি?'

'না, বৃষ্টি জোরে আসবার আগেই পৌঁছে গেলাম যে।'

'তবু ওটা সঙ্গে রাখতে ক্ষতি কি? আর একটু আগে বৃষ্টি হ'লে ত ভিজতে।'

'তাহ'লে খারাপ আর কি হ'ত? ভিজে হয়ত জ্বর হ'ত। জ্বর হ'লে নার্স রাখতাম একটা।'

'নার্স রাখলে সে শুধু জল-বার্লি খাইয়ে রাখত। আর কিছু দিত না।'

'তাই সুশীল সুবোধ বালক হয়ে থেতাম। এবং কিছুতেই ভালো হতে চাইতাম না। কিন্তু এখন যখন জ্বর হয়নি, তখন একটু দিদির হাতের চা চাই।'

'রক্তপাত করে দিয়ে আবার চা চাইতে লজ্জা করে না?'

'রক্তপাত করেই ত চায়ের হাত মিষ্টি করে দিয়েছি। এখন চা করতে—হাঙ্গামা হবে না ত দিদি?'

দিদি যেমন নিরীহ, তেমনি মুখচোরা। কোলের ছেলেটিকে লতিকার হাতে দিয়ে একটু হেসে বলেন, 'আমি চা করতেই যাচ্ছিলুম। উনি এখুনি আসবেন।'

লতিকা ঠাট্টা করে বলে, 'কথাটা বুঝলে ত! তোমার জন্যে নয়, "উনি" আসবেন বলেই দিদি চা করতে যাচ্ছিলেন।'

দিদি অপ্রস্তুত হয়ে চলে যেতে যেতে বলেন, 'আহা, আমি বুঝি তাই বলছি!'

দিদি চলে যাবার পরে হঠাৎ লতিকা মাথা নীচু করে মৃদুস্বরে বলে, 'তোমার পাসপোর্ট পেয়েছ?'

প্রতুল বিস্মিতভাবে তার দিকে তাকাতেই সে আবার বলে, 'আমায় লুকোচ্ছ কেন? আমি সব ত শুনেছি।'

মুখে তার হাসি কিন্তু স্বরে কাতরতা নয় কি?

প্রতুল বলে, 'কি তুমি শুনেছ?'

'তুমি গ্রান্ট পেয়ে গেছ, জার্মানী যাচ্ছ, সেখানকার ডিগ্রির জন্যে।'

দুজনের নীরবতা বাইরের প্রবল ধারাপতনের শব্দে ভরে উঠেছে। প্রতুল ধীরে ধীরে বলে, 'গ্রান্ট পেয়েছি কিন্তু আমি কোথাও যাব না, লতা!'

তারপর একটু থেমে আবার বলে, 'ভালো চাকরীর বা পসারের জন্যই বিদেশের ডিগ্রি দরকার, রিসার্চ এদেশেই করা যায় ইচ্ছে করলে।'

কলকাতা অত্যন্ত ভিজে, ঠাণ্ডা দিনের পাতা। তারপর কাল রাত থেকে যে বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে এখনও পর্যন্ত তার বিরাম নেই। পড়ছে ত পড়ছে, অবিশ্রান্তভাবে। আকাশের মেঘের সে গতি, সে লীলা গেছে থেমে, বৈচিত্র্য গেছে ঘুচে। এখন সমস্ত একাকার হয়ে গেছে—সব বর্ণ-সমন্বয় হয়ে আকাশ হয়েছে একরঙা! যেন শুরু সিসার পাতে মোড়া বলে মনে হচ্ছে। সে পাতের কোথাও জোড় নেই, তা নিশ্ছিদ্র। সেই ফ্যাকাসে আকাশ থেকে অবিশ্রান্ত ঝরে পড়ছে জল। রাস্তার ধারে ছোট ছোট জলের স্রোত চলেছে কলকল করে। ছাদের জল একঘেয়ে ঐক্যতান সুরে পড়ছে ছড়্ছড়িয়ে। পৃথিবীর ওপর কে যেন শব্দের একটা আবরণ দিয়েছে টেনে। রাত্রির অন্ধকারে বিরামহীন ধ্বনির এই আচ্ছাদন ভারী ভালো লেগেছিল, সমস্ত চেতনাকে কোমলভাবে অতি সন্তর্পণে সে আচ্ছাদন ছিল [illegible]। সেই শব্দের চাদর মুড়ি দিয়ে মন নিশ্চিন্ত আরামে কল্পনা-বিলাস উপভোগ করেছে। এখন কিন্তু ব্যাপারটা একটু একঘেয়ে হয়ে পড়েছে, শব্দের সে মসৃণ আচ্ছাদন যেন ফেঁসে ফেঁসে কেটে। ভিজে কাকের দলের কোলাহল, বাইরে গাড়ীর চাকার আওয়াজ, জাগ্রত মানুষের নানা ব্যস্ততার শব্দ বৃষ্টির সুরকে কর্কশ করে তুলেছে, তবু প্রতুলের ভালো লাগছে না এমন কথা বলা যায় না।

যথারীতি এ'টা নাগাদ, মাথায় ছাতা ধরে সে যখন বেরিয়ে পড়ল তখনও বৃষ্টি পড়ছে সমানভাবে। এমন দুর্নিবারভাবে বৃষ্টির ভেতর বেরোবার ভারী একটি আনন্দ আছে—ছেলেমানুষী আনন্দ। শহর দুর্গম আবার তোমার ঘরে ঠেকে নির্জন হয়ে আসছে, তুমি অক্ষত-দেহে নিরাপদে ঘুরে বেড়াচ্ছ এমনি একটা ভাব

যেন হয় মনে। পিচ্‌ঢালা রাস্তার ওপর বৃষ্টির দীর্ঘ প্রবল ধারা আঘাত করছে। নীচের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মনে হয় বৃষ্টি বুঝি ওপর থেকে পড়ছে না; মাটির নীচে থেকেই জাগছে অদ্ভুত জলের ফুল, মুহূর্তের আয়ু নিয়ে জাগছে আর যাচ্ছে মরে।

প্রতুল ল্যাবরেটারিতে পৌঁছল একটু দেরীতে। ছাতাটা মুড়ে রেখে বর্ষাতিটা খুলে টাঙিয়ে রাখছে এমন সময় সহকারী এসে খবর দিলে—ডাঃ মৈত্র তুবার খোঁজ নিয়েছেন। প্রতুল এসেই যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করে।

প্রতুলের মুখ উঠল কঠিন হয়ে একমুহূর্তে। বললে, 'যাচ্ছি বলগে যাও।'

এ খোঁজ নেওয়ার অর্থ সে জানে। ডাঃ মৈত্র কি বলবেন তাও তার অজানা নয়। ক'দিন ধরেই সে এটির জন্যে অপেক্ষা করছিল। এর মধ্যে অনেক কানাঘুষা, অনেক গুজব তার কানে এসেছে। কাজটা নাকি ভালো হচ্ছে না। স্টাফের প্রেস্টিজ যায়, হাসপাতালের সুনামে দাগ ধরে। ডাঃ মৈত্র অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছেন নাকি—এতটা বাড়াবাড়ি তিনি পছন্দ করেন না, ইত্যাদি। প্রতুলের অপরাধ এই যে, নিজের মনের ভেতর গ্লানি নেই বলে ব্যাপারটাকে আর পাঁচ-জনের মতো লুকিয়ে রাখবার ব্যবস্থা সে করেনি। সে অনায়াসে স্পষ্ট দিবালোকে নিজেকে অসংকোচে প্রকাশ করেছে। প্রতুলের ঘোরতর অপরাধ এই যে, সে শুধু মজা করে সন্তুষ্ট থাকতে পারেনি, সাধু উদ্দেশ্য নিয়ে গভীর ভাবে ভালোবেসেছে।

কঠিন মুখ নিয়ে সে ডাঃ মৈত্রের ঘরে গেল। মনে মনে সঙ্কল্প তার স্থির হয়ে গেছে। ডাঃ মৈত্র যেই হোন, তাঁর বাঁকা হাসি, শাণিত বিদ্রূপ সে সহ্য করবে না কিছুতেই। লতিকার অপমান সে হতে দেবে না।

ঘরে ঢুকেই সে অবাক হয়ে গেল। ডাঃ মৈত্র সহাস্যে চেয়ার থেকে দাঁড়িয়ে তাকে অভ্যর্থনা করলেন, 'তোমাকে সকাল থেকে খুঁজছি কন্‌গ্র্যাচুলেট করবার জন্যে। চমৎকার, তোমার পেপার চমৎকার হয়েছে! ব্লাড গ্রুপ সম্বন্ধে এমন দামী গবেষণা আর কেউ করেনি।'

প্রতুল অভিভূতের মতো বসে পড়ল একটা চেয়ারে। ডাঃ মৈত্রের শীর্ণ, কুৎসিত মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আনন্দে।—আমি গোড়া থেকেই জানতুম, প্রতুল, তোমার ভেতর অসাধারণ পার্টস্ আছে। তুমি আমাদের হাসপাতালের গৌরব। কিছুদিন বাদে বলব দেশের গৌরব।'

প্রতুল লজ্জিত হয়েই এবার কথা বলতে পারে না।

তারপর। তোমার সব আয়োজন সম্পূর্ণ হয়েছে ত। এই মাসেই স্টার্ট করে কেবল একটু ব্যাড্ প্যাসেজ হবে—তাতে কি ভয়?'

প্রতুল একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ গম্ভীরভাবে বললে, 'আমি যাব না ঠিক করেছি।'

'যাবে না? বলছ কি হে?'

'ডিগ্রিতে আমার দরকার নেই। রিসার্চ ত আমি এখানেই করতে পারি।'

'পাগল! তোমায় ডিগ্রির জন্যে আমি যেতে বলছি মনে করছ—মোটেই না। ডিগ্রি দরকার আমাদের মতো সাধারণ লোকের, তোমার নয়—রিসার্চের জন্যেই তোমাকে যেতে বলছি। সেখানে কত ফেসিলিটিজ! কত নতুন টেক্‌নিকের সঙ্গে হাতে কলমে পরিচিত হয়ে আসবে! ছি ছি প্রতুল, এমন কাজ কোরো না। নিজেকে এমন করে অপব্যয় করবার তোমার অধিকার নেই।'

একটু থেমে ডাঃ মৈত্র আবার বললেন, 'হুট্ করে একটা কিছু ঠিক কোরো না; একটু ভেবে দেখো সে যাও। এই সঙ্গে আর একবার বলছি, তোমার পেপার অদ্ভুত হয়েছে।'

প্রতুল উঠে বেরিয়ে আসছিল। ডাঃ মৈত্র তার দিকে একচোখ বন্ধ ক'রে ঘাড় কাৎ করে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে দুষ্টোমির হাসি হেসে বললেন, 'তোমার সম্বন্ধে ওরা সব নানান কথা বলছে যে প্রতুল! ভালো, ভালো! তার জন্যেও কন্‌গ্র্যাচুলেশন।'

মুখের হাসি নিভিয়ে একটু গম্ভীর ভাবে ডাঃ মৈত্র আবার বললেন, 'কিন্তু দেখো ভুলিয়ে যেওনা বাপু! বড় কঠিন সাধনা তোমার। একটু আধটু সাধনায় ওরা সহায় বটে, কিন্তু দরকার হ'লেই ছেদ করতে হবে। এ তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করতে গেলে নির্মম হতে হবে। নীচের তলায় গোলমাল হচ্ছে হোক কিন্তু উপরের ঠাকুরঘরে তা না পৌঁছায়।'

আকাশের মুখ সমান ফ্যাকাশে হয়ে রইল। মেঘের পর্দার আড়াল দিয়ে সূর্য গেল আকাশ পার হয়ে। বৃষ্টি কখনো একটু থামল; কখনও আবার এল প্রবলভাবে। প্রতুল সারাদিন রইল অনিশ্চয়তার দোলায় দোদুল্যমান। ডাঃ মৈত্র সত্যি তাকে ভাবিয়ে তুলেছেন। সে যাবে কি না!

দুদিন বাদে সত্যি যখন তার স্থির হ'ল তখন আকাশের সিসের পাত গ'লে যেতে

সুরু করেছে, নানা জায়গায় দেখা দিয়েছে ফাটল। এখানে সেখানে উঠছে ধোঁয়ার কুণ্ডলী। বৃষ্টি কিন্তু গেছে ধরে।

এই দুদিন সে লতিকার সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করেনি। আজ খোঁজ নিতে গিয়ে অবাক হয়ে গেল। লতিকা এ ওয়ার্ডে নেই। কোথায় গেল সে? কে একজন বললে, 'বোধ হয় টি. বি. ওয়ার্ডে ট্র্যান্সফারড্ হয়েছে।'

টি. বি. ওয়ার্ড! স্তব্ধ হয়ে খানিক প্রতুল দাঁড়িয়ে রইল, তারপর অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে চলল ডাঃ মৈত্রের ঘরের দিকে। এ ব্যাপারের কৈফিয়ত তার চাই।

কাটা দরজা ঠেলে সে একটু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ডাকলে, 'ডাঃ মৈত্র!' টেবিলে বসে হাতের কাগজটা থেকে মুখ তুলে ডাঃ মৈত্র স্মিতমুখে বললেন, 'কে, প্রতুল? এসো এসো!'

প্রতুল কিন্তু আর কিছু বলতে পারলে না। সে স্তব্ধ হয়ে গেছে। ডাঃ মৈত্রের টেবিলের ধারে কাগজপত্রের ফাইল হাতে দাঁড়িয়ে লতিকা। প্রতুলের দিকে সবিস্ময়ে একবার তাকিয়ে সে মুখ নীচু করে সলজ্জ একটি হাসি গোপন করলে।

না, প্রতুলের পক্ষ থেকে এখন কিছু বলা সম্ভব নয়। লতিকার সামনেই তারই কথা তুলে কৈফিয়ত চাওয়া যায় না। আর তা ছাড়া কি কৈফিয়ত সে দাবী করতে পারে? টি. বি. ওয়ার্ডে কি নার্স থাকে না? লতিকা বিশেষ সুবিধাই বা পাবে কেন? প্রতুল খানিক ইতস্তত করে হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

গাঢ় ছায়াচ্ছন্ন কয়েকটি দিন পার হয়ে গেল। আকাশের সিসের পাতের ফাটল গেছে জুড়ে। বৃষ্টির আর বিরাম নেই, ছেদ নেই। মন এবার ক্লান্ত হতে সুরু করেছে প্রকৃতির এই একঘেয়ে রূপে; রাত্রে আশা হয় সকালে হয়ত মেঘ কেটে যাবে, দেখা যাবে একটু নীল আকাশ। সকাল বেলা হতাশ হ'লেও মনে হয় এ বৃষ্টি সারাদিন কখনও থাকতে পারে না, বিকালের দিকে নিশ্চয়ই ধরে যাবে, একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচা যাবে, কিন্তু বৃষ্টি পড়তে থাকে অবিশ্রান্ত ভাবে;—আকাশের এতটুকু পরিবর্তন নেই। পৃথিবী এরই মধ্যে ম্লান হয়ে এসেছে, তার ঔজ্জ্বল্য গেছে মুছে। রাস্তা-ঘাটগুলো কেমন অত্যন্ত নোংরা মনে হয়, পথের ধারের বাড়িগুলো শ্রী হারিয়েছে, সর্বাঙ্গে বার্ধক্যের মেচেতার দাগ।

ক'দিন ধরে প্রতুল লতিকার সুবিধামতো দেখা পাচ্ছে না। হাসপাতালে দেখা

করবার স্বভাব অস্থাবরে। লতিকার নতুন ওয়ার্ডে গিয়ে কাজ বেড়েছে। বাড়িতে দুতিন বারই প্রফুল্ল যায়। কখনও দিদি, কখনও দিদির স্বামী বিনোদবাবু তাকে অভ্যর্থনা করেন, কিন্তু লতিকার দেখা মেলে না। হয়ত সে এই মাত্র বেরিয়ে গেছে, নয়ত সে এখনও ফেরেনি। হাসপাতালে যাবার সময়ও তার বদলে গেছে। একদিন শুধু পথে দেখা হ'ল।

'বাঃ, বেশ ত তুমি!' প্রফুল্লের কণ্ঠস্বরে অভিমান, বেদনা, অভিযোগ।

লতিকা কেমন যেন একটু আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার চোখে কি অস্পষ্ট আতঙ্কের ছায়া?

প্রফুল্ল আবার বললে, 'তোমার সঙ্গে গত শতাব্দীতে দেখা হয়েছিল, তারপর কত কথা জমে উঠেছে জান?'

লতিকা একটু হাসল। সে হাসিও যেন তার চোখের গভীর আতঙ্ক ও বেদনাকে স্পষ্ট করে তুললে।

'কাল বিকেলে বাড়ি থাকা চাই, বুঝেছ?'

লতিকা অস্পষ্ট স্বরে বললে, 'আচ্ছা।'

লতিকা রাজী হয়েছিল বিকেলে বাড়ি থাকতে, কিন্তু তাকে পাওয়া গেল না সে সময়ে; ডাঃ মৈত্র কি জরুরী কাজে তাকে আটকে রেখেছেন।

পাঁচদিন ধরে সূর্যের মুখ দেখা যায়নি। এই সৃষ্টির ভেতর সূর্য আছে বলে আর মনে হয় না। ছানিপড়া চোখের মতো ঘোলাটে, কুৎসিত আকাশের দৃষ্টি; জল পড়ছে আর পড়ছে—ধীরে ধীরে ক্লান্ত, একটানা সুরে। মুষলধারে এক পশলা জল জোরে হয়ে গেলেও বুঝি একটু স্বস্তি পাওয়া যেত। কিন্তু তা হবে না। প্রতিমুহূর্তে মনকে আরো আচ্ছন্ন আরো নিস্তেজ করে ধীরে ধীরে বৃষ্টি ঝরছে।

ভালো করে ভোর না হতেই প্রফুল্ল সেদিন বেরিয়ে পড়ল, আজ সে লতিকার সঙ্গে দেখা করবেই। ভোরের স্বল্পোজ্জ্বল আলোকেও এ নগরের কেমন একটা অসহায় ভাব। উপর থেকে পড়ছে বৃষ্টি, নীচে থেকে উঠছে একটা কুৎসিত ঘোলাটে কুয়াশা। প্রফুল্ল লতিকাদের দরজার কড়া নাড়লে। বিনোদবাবু এসে দরজা খুললেন, 'আসুন। খুব সকালেই এসেছেন ত!'

দুজনে ঘরের ভেতর ঢুকল। প্রফুল্ল জিজ্ঞাসা করবার আগেই বিনোদবাবু বললেন, 'লতিকা এখনও বাড়ি ফেরেনি।' তিনিও যেন চিন্তিত।

'বাড়ি ফেরেনি। এখন ত তার নাইট-ডিউটি নয়।'

'না, কোন্ একটা কেসে ডাক্তারবাবু ডেকে নিয়ে গেলেন, গেছে সেই সন্ধ্যের সময়। আপনি বসুন, এখনি হয়ত আসবে।'

প্রতুল বসল। ঘরের ভেতর থেকে এখনও রাত্রি যেন বিদায় নেয়নি। অস্পষ্ট অন্ধকারে সব আবছায়া দেখাচ্ছে। তার মনের ভেতরও অমনি আবছায়া সব চিন্তা।

'দাঁড়ান, চা করতে বলিগে'—বিনোদবাবু ভেতরে গেলেন। প্রতুল রইল বসে। অনেকক্ষণ, সুদীর্ঘ যুগ ধরে যেন রইল বসে।

হঠাৎ বাইরে মোটর থামার আওয়াজ। প্রতুল নিজের অজ্ঞাতেই উঠে দাঁড়াল গিয়ে দরজায়। মোটর থেকে লতিকা উঠে আসছে, ডাঃ মৈত্র তাকে হাত নেড়ে বিদায় সম্ভাষণ জানাচ্ছেন।

লতিকা আরো কাছে এল, হঠাৎ প্রতুলকে দেখে চমকে উঠে বললে, 'কে? ও আপনি!'

লতিকাকে অত্যন্ত ক্লান্ত দেখাচ্ছে, তার দুর্বলতা যেন অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবার; মুখ তার অস্বাভাবিক রকম শীর্ণ। সারারাত্রি জেগে সেবা করার পরিশ্রমে নিশ্চয়।

লতিকা ক্লান্ত পা টেনে টেনে যেন ঘরে এসে ঢুকল, তারপর এলিয়ে পড়ল একটা চেয়ারে।

'বড় ক্লান্ত হয়েছ, লতিকা!'

লতিকা চোখ খুলে তার দিকে তাকাল। দৃষ্টিটা কেমন একটু অদ্ভুত, না? সত্যি কি সে চোখে গভীর যন্ত্রণা ও ভয়ের আভাস?

'ক'দিন তোমায় দেখা পাইনি, তাই আজ ভোরেই চলে এলাম।'

কথার মাঝখানে হঠাৎ লতিকা উঠে পড়ল।—'বোসো, কাপড় ছেড়ে আসছি।'

না না, তারই ভুল; এই ত লতিকা বেশ সহজ ভাবে কথা কইলে। অন্ধকার কত ভ্রান্তির সৃষ্টি করে।

লতিকা কাপড় বদলে এসেছে, কিন্তু চেহারা বদলাতে পারেনি। মুখ তার আরো যেন শীর্ণ, কয়েকটি অদৃষ্টপূর্ব রেখা তাকে যেন আরো কঠিন করে তুলেছে। লতিকা এসে চেয়ারে বসে সহজভাবেই বোধ হয় বললে, 'চা খাওনি ত এখনও?'

'না।'

খানিক নীরবতা। বাইরে থেকে বৃষ্টির চাপা শব্দ আসছে, হিংস্র কোনো শ্বাপদের সতর্ক সঞ্চরণের মতো।

'লতিকা!'

লতিকা মুখ ফেরালে।

'তোমায় আজ ক'টা কথা বলতে এলাম। প্রথম হচ্ছে—আমি গ্র্যাণ্ট প্রত্যাখ্যান করেছি।'

'কেন?'

প্রতুল একটু হেসে বললে, 'কেন, জিজ্ঞাসা করছ?'

হঠাৎ লতিকার একি হ'ল! তীক্ষ্ণ তীব্র স্বরে বললে, 'হ্যাঁ, কেন জিজ্ঞাসা করছি। তুমি যা বলবে তাও জানি অবশ্য। বলবে—আমার জন্যে। কিন্তু কেন আমার জন্যে তুমি এতবড় ত্যাগ করবে? এ তোমার ত্যাগ ত নয়, আমার ওপর তোমার এ অত্যাচার; সারাজীবন ধরে তুমি এই ভেবে গর্ব করবে যে আমার জন্যে তুমি তোমার সমস্ত ভবিষ্যৎ বিসর্জন দিয়েছ, আমার জন্যে করেছ অসাধারণ আত্মত্যাগ। সমস্ত জীবন আমায় তুমি রাখতে চাও অপরাধী করে! তোমার সে আত্মপ্রসাদের দৃষ্টির বিষে আমার জীবন জর্জরিত করতে দেব না, কিছুতেই আমি দেব না তোমায় তা করতে—তোমার এই ত্যাগ আমি চাই না।'

যেমন অকস্মাৎ আরম্ভ হয়েছিল, তেমনি অকস্মাৎ লতিকার তীব্র স্বর গেল মিলিয়ে উচ্ছ্বসিত কান্নায়। চেয়ারের ধারে লুটিয়ে পড়া তার দেহ দুলে দুলে উঠতে লাগল কান্নার জোয়ারে।

ব্যথিত হয়ে প্রতুল একবার বললে, 'আমি কিন্তু তা'ত বলতে চাইনি লতিকা। আমার আরো কথা ছিল যে!'

লতিকা সোজা হয়ে উঠে বসল। দুঃসহ যন্ত্রণার রেখা তার মুখে। কিন্তু স্বর তার কঠিন, 'না, না, আমি কোনো কথা শুনতে চাই না। তুমি যাও, তুমি এখান থেকে যাও!'

দুর্বোধ, সমস্ত একেবারে দুর্বোধ। প্রতুলের সমস্ত যেন গুলিয়ে যেতে থাকে চোখের সামনে, মনের ভেতর।

লতিকা আবার বললে, 'তোমায় মিনতি করে বলছি, তুমি এখান থেকে যাও; আর আমার সঙ্গে কখনো দেখা কোরো না, কখনও না! নিজেকে আর অপমান তুমি কোরো না!'

শেষ কথাগুলি আবার কান্নায় ভারী হয়ে এসেছে। আচ্ছন্নের মতো প্রতুল উঠে দাঁড়াল, তারপর রাস্তায় বেরিয়ে এল।

একঘেয়ে একটানা ভাবে তখনও মৃত মুখের মতো পাংশুবর্ণ আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়ছে অবিশ্রান্ত

চিন্ময়বাবু আমার কথায় একটু হাসলেন; তারপর সামনের দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে বললেন, 'তোমার কথাটা একেবারে ভুল নয়। আজকালকার ছেলেমেয়েরা জীবনের স্বরূপ বেশ জেনে নিয়েই আসে, তাদের মনে কোনো ভ্রান্তি, কোনো মরীচিকা-মোহ নেই। কিন্তু তা বলে ট্র্যাজিডিকে তারা এড়িয়ে যেতে পারে মনে কোরো না। আমাদের ছিল স্বপ্নভঙ্গের আকস্মিক আঘাত, আর তোমাদের হচ্ছে মন্থর অবিরাম প্রাত্যহিক নিরাশার ট্র্যাজিডি। যদি তুলনা করতে চাও, তা হ'লে বলব আমাদেরই ছিল শ্রেয়।'

সামনের জানলা দিয়ে বহুদূর উপত্যকার পারে পাদপহীন পর্বতের রুক্ষ ধূসর রেখা দেখা যাচ্ছে। ঐ রেখাগুলিই এখানকার প্রকৃতির কঠোরতাকে যথেষ্ট স্পষ্ট করে তুলেছে। বাড়ির পেছনের দিকে বিশাল পরিধির উন্নত বৃক্ষ-দানব আকাশের দিকে আস্ফালন করে উঠে সমস্ত নিসর্গ-দৃশ্যকে কি রকম ভয়াবহ করে তুলেছে তা না দেখতে পেলেও ক্ষতি নেই। সে দিকে চাইলেই মনে পড়ে বাঙলার সরস মাটি ছাড়িয়ে অনেক দূরে আমরা প্রবাসী, নইলে ঘরের ভেতর কোনো আরামের উপকরণের অভাব নেই। বাঙালীর ঘরের একটি নিজস্ব শ্রীও সেখানে আছে। দেখে কে বুঝবে যে এটি চিরকুমার এক প্রৌঢ়ের দীর্ঘ বিশ বৎসরের আশ্রয়। মনে হয় যেন মেয়েদের হাতের কল্যাণ-চিহ্ন বাড়ির সব জায়গায় পরিস্ফুট।

বন্য রুক্ষ মাটির দেশে আমরা দুটি মাত্র বাঙালী, একত্র হয়েছি জীবিকা অন্বেষণের প্রয়োজনে। চিন্ময়বাবু এখানকার ডাক্তার, আমি নিয়োজিত ইঞ্জিনিয়ার। আমার সম্বন্ধে জীবিকা অন্বেষণের কথাটা সম্পূর্ণভাবে সত্য কিন্তু চিন্ময়বাবু সম্বন্ধে সে কথা ঠিক বলা চলে কিনা সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আমার এক এক সময়ে মনে হয় চিন্ময়বাবু জীবিকা অর্জনের জন্যে এই সুদূর আনন্দহীন প্রবাস বেছে নেন নি—বেছে নিয়েছেন আত্মগোপনের প্রয়োজনে, —জীবনের অনিবার্য কোনো ক্ষতিকে একান্ত গোপন মনে লালন করবার অভিপ্রায়ে।

বিদেশে আমরা দুটি মাত্র বাঙালী, আমাদের ঘনিষ্ঠতা অন্তরঙ্গতায় দুজন মিলতে

পেয়েছি। বিনয়বাবু অতি সহজে আমার কাছে নিজেকে উন্মুক্ত করেছেন। বার্ধক্যকে সমীহ করার প্রয়োজনে আমায় আড়ষ্ট থাকতে হয়নি।

বিনয়বাবুকেও নিজেকে আমার বয়সের স্তরে নামাবার জন্য যে বিশেষ চেষ্টা করতে হয়েছে তা মনে হয় না। বিনয়বাবু বৃদ্ধ হয়েছেন খালি বয়সেই—মাথার চুলের শুভ্রতাই তাঁহার বয়সের একমাত্র সাক্ষ্য, নইলে দেহ ও মনে কোথাও তাঁর কোনো ভাঁজ পড়েছে বলে বোঝা যায় না।

বন্ধ্যা দেশের শুষ্ক হাওয়াই তাঁকে এমন সজীব রেখেছে কিনা কে জানে।

বিনয়বাবুর পরিচয় দিতে গিয়ে গল্পের ভূমিকা প্রায় করেই ফেলেছি—এবার আসল ধারায় নেমে এলেই হয়।

বিনয়বাবুর কথায় বললাম, 'আমি ত ওই কথাই বলছি। আপনাদের সময়ে মরীচিকা মিলিয়ে যাবার আগে পর্যন্ত তবু আপনারা কল্পনার স্বর্গে নিশ্চিন্ত আরামে থাকতে পেতেন, আমাদের আগাগোড়াই হতাশা। জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাবার প্রায়শ্চিত্ত আমাদের প্রতিদিনই করতে হচ্ছে।'

বিনয়বাবু বললেন, 'অবশ্য যাকে জ্ঞানবৃক্ষ বলছ, সে যদি সত্যি জ্ঞানবৃক্ষ হয়। সৃষ্টিটা দুঃখবাদের উদাহরণ নাও হতে পারে।'

আমি একটু হাসলাম ; বললাম, 'আপনি নিজের প্রতিবাদ করছেন।'

'করছি ? তা করছি বটে। এক এক সময়ে করতেও ইচ্ছে করে। জ্ঞান যতই নির্ভুল ও সম্পূর্ণ হোক তাতে সান্ত্বনা ত নেই। তার চেয়ে মরীচিকাও যে ক্ষণিক হ'লেও ঢের সুখের। এক এক সময়ে নিজেকে প্রবঞ্চনা করার লোভ দুর্নিবার হয়ে ওঠে।'

চুপ করে ছিলাম। বিনয়বাবু আবার বললেন, 'কিন্তু যাই বলো আমাদের যে মোহের যুগে পৃথিবীতে রঙ ছিল, রেখার বৈচিত্র্য ছিল। তোমরা মোহমুদ্গর দিয়ে সব সমতল করে ফেলেছ—সব একরঙা। তোমাদের যুগ নিয়ে আর গল্প হয় না।'

হেসে বললাম, 'আপনাদের যুগের গল্প একটা শুনি না ?'

বিনয়বাবু আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে বললেন, 'সেইটেই জমবে ? বলতে আমার অবশ্য আপত্তি নেই। তবে সেই একঘেয়ে ট্র্যাজিডি।'

'তা ত জানি। তবু বলুন না।'

বিনয়বাবু বাইরের দিকে চেয়ে বললেন, 'গল্প এ কালের নয়, এদেশেরও না ; কিন্তু কালের না হোক, এদেশেরই সৃষ্টি হওয়া উচিত ছিল। আমি তখনো তরুণ

তার রূপ—কোথাও সরলতা নেই, শুধু কাঠিন্য। তা ছাড়া আমি গুছিয়েও বলতে পারব না বোধ হয়। তবু শোনো।'

তারপর একটু চুপ করে থেকে বিনয়বাবু আবার আরম্ভ করলেন, 'সে যুগের কথা খুব সুন্দর নয় কিন্তু তবু তোমরা আর কিছুই জান না। তোমরা সে যুগের কথা বইয়ে পড়েছ। হয়ত, মনে কর সব তোমরা বোঝ কিন্তু আসলে সে যুগের বাঙলার কিছুই তোমরা জান না। বাঙলা দেশের ঊনবিংশ শতাব্দী আর বিংশ শতাব্দীতে এমন একটা তফাৎ আছে যে, আমার এক এক সময় মনে হয় এ-দুটোর ব্যবধান মাত্র এক সেকেণ্ড নয়—একটা গোটা শতাব্দী।—এই দেখ বৃদ্ধ বয়সের যা দোষ গল্প বলতে বসে সেই বাচালতাই করছি।

তোমাদের কাছে চিন্তার স্বাধীনতা একটা স্বাভাবিক স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার—এতে তোমরা আশ্চর্যও হও না, কোনো থ্রিলও পাও না, কিন্তু আমরা তখন সবে মনের জেলখানার শেকল নেড়ে একটু-আধটু ছুটো করেছি, ঠোকর মারাতেই আমাদের ছিল রোমাঞ্চ। আমাদের মনে তার নিজস্ব একটা মোহ ছিল। লোকজনে লুকিয়ে চা খেয়েই আমাদের বুক ভরে উঠত গর্বে, কাটলেট খেতে পারলে নিজেকে আমরা নেপোলিয়নের সমান মনে করতাম। ধুতির বদলে প্যান্ট পরা আমাদের কাছে ছিল দিগ্বিজয়ের সমান। তোমরা এখন এসব শুনে হয়ত হাসবে—কিন্তু সে যুগের আবহাওয়া তোমরা জান না তাই।

পুরুষের বেলায় যখন এই, তখন মেয়েদের ব্যাপারটা বোধ হয় আঁচ করতে পারো। দশের অনুশাসন চোদ্দ পর্যন্ত রেখে যে বাপ মেয়ের বিয়ে দেয়, সে একটা মহাবীর সংস্কারক। কথাবার্তা ছাড়িয়ে যে মেয়ে ইংরেজী কার্পেট বুক ধরে তারও সাহস ও শিক্ষার কমতি নেই।

সেই যুগে [illegible] বলে একটি ছেলে নন্দিনী বলে একটি মেয়েকে ভালোবেসেছিল।'

আমি একটু হাসলাম।

বিনয়বাবু সেটা লক্ষ্য করে বললেন, 'আচ্ছা আচ্ছা, বকবক আর চালাব না। তোমরা এ যুগের ছেলে, সবকিছু তোমাদের বোঝান কঠিন। তা ছাড়া পূর্বকার সার্জিও বড় কঠিন। সব কথা উত্থাপন করলে গল্পের গোলমাল হবার সম্ভাবনা। কিন্তু নন্দিনী কাহিনী শোন।'

আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম।

"আমিই ভালোবেসেছিলাম নলিনী বলে একটি মেয়েকে। তের-চোদ্দ বছরের মেয়েকে ভালোবাসার কথা শুনলে তোমাদের আবার হাসি পাবে হয়ত। কিন্তু আমি তোমায় বলছি সে যুগে তা সম্ভব ছিল। বঙ্কিমবাবুর রাধারাণীর বয়স কত ছিল জান? প্রথম সংস্করণে বোধ হয় ছিল দশ-এগার। পরের সংস্করণে বদলেছিলেন কিন্তু বারোর বেশী বাড়াতে পারেন নি।

যাক নলিনী মেয়েটির কথাই বলি। নলিনী সে যুগের মেয়েদের অগ্রবর্তিনী। তার বাবা ব্রাহ্ম না হয়েও ছিলেন সে যুগে অত্যন্ত অগ্রসর। নলিনী জানলা সার্সি বন্ধ করা ছ্যাকরা গাড়ী করে প্রত্যহ মেয়েদের স্কুলে গিয়ে সমস্ত পাড়ার জিহ্বার খোরাক যোগাত।

বলতে পার অবশ্য, কি সুযোগ ছিল সে যুগে প্রেমের। কিন্তু প্রেমের জন্যে কতটা সুযোগের দরকার হয়? ওপারে ওরা দেহ-সংলগ্ন হয়ে নাচবার সুযোগ পেয়েও অক্ষত হৃদয় নিয়ে সারা জীবন কৌমার্যে কাটিয়ে দেয়, আবার নদীর জলে চুলের ছায়া দেখেও এককালে রাজপুত্রেরা পাগল হ'য়ে যেত। সে রাজপুত্রেরা রূপকথাতেই বন্দী হয়ে আছে মনে কোরো না।

তা ছাড়া নলিনীর সঙ্গে আমার দেখা হবার সুযোগের অভাব কি? বিশেষ করে আমি ছিলুম তাদের স্বজাতি এবং সে যুগের সংস্কারকে জয় করে মেডিক্যাল কলেজে মড়া কাটবার বিদ্যে শিখতে সাহস করেছিলাম বলে তার বাবার অত্যন্ত প্রিয়।

আজকের দিনে থিয়েটার বায়স্কোপ একজিবিশন তোমাদের যে সুযোগ দেয়, আমাদের যুগে তাই দিত বিয়ে-বাড়ি। বিয়ে-বাড়িতে সেকালেও ছিল অবাধ গোপন মিলনের সুযোগ ও স্বাধীনতা। পরিবারে বিবাহ, উপনয়নের মতো শুভকর্ম নিত্য হয় না বটে—কিন্তু তাতে কি আসে যায়—হৃদয়-বিনিময়ের পক্ষে একটি মুহূর্তই যথেষ্ট।

না, নীরব প্রেমনিবেদন আমার ছিল না—প্রতিদানহীন বলেও আমার ধারণা নয়।

বিবাহের উৎসবের রাতে পরিত্যক্ত ছাদের অন্ধকার আলসের ধারে আমি এসে দাঁড়িয়েছি—সমস্ত বাড়িতে হাওয়া না পেয়ে নলিনীও উঠে এসেছে অন্যমনস্কভাবে ছাদের ওপর। অন্ধকার এমন কিছু গাঢ় নয় যে কিছু দূরে মানুষ আছে কিনা বোঝা যায় না, তবু বিশ্বাস করতে হবে যে নলিনী আমায়

দেখতে না পেয়েই আমার অত্যন্ত কাছ ঘেঁষে এসে দাঁড়িয়েছে, তখনকার ফ্যাশানে, কনুইতে ভারী বেনারসী শাড়ীটি জড়িয়ে প'রে।

আমি সামনের অন্ধকারের দিকে চেয়ে বলেছি, 'বাবা! নীচে কি গণ্ডগোল! টেঁকা যায় না!'—এবং নন্দিনী সে স্বরে চমকে উঠে বলেছে, 'ওমা, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছ! কখন থেকে?'

'এই ও এলাম'—ব'লে আমি সান্নিধ্যের উত্তেজনায় একটু কেঁপে উঠেছি। সদ্য [illegible] বেনারসী শাড়ীর অপূর্ব গন্ধের নেশায় মাথায় আমার ঘোর লেগেছে।

তারপর আর কথা নেই।

নন্দিনী খানিক বাদে বলেছে, 'মাগো, ওইটুকু মেয়ের কি করে বিয়ে হচ্ছে! আমি হ'লে কক্ষনো বিয়ে করতাম না।'

'[illegible] টুকটুকে একটি বর হ'লেও না?'

'আমার বয়ে গেছে। অমন [illegible] বর আমার চাই না।'

'আর একরকম নিশ্চয় হলে?'—(অনুপ্রাস দেখে অবাক হয়ো না, দাশুরায় তখনো আমাদের মন থেকে মরেনি।)

নন্দিনী বলেছে, 'দ্যেৎ!'

লক্ষ্য করলে বোধ হয় যে আমাদের প্রেমের আলাপেও ছিল তখন সে যুগের সংস্কার-উন্মাদনার প্রভাব। তোমাদের যা গা-সওয়া হয়ে গেছে আমরা তখন নতুন স্বাদ পেয়ে জাগরণে নিদ্রাতেও তা ভুলতে পারছি না।

এমনি প্রেমের চিত্র বেশি দেখবার আশা রেখো না—আমি সে আশা মেটাতে পারব না। বেশি পেড়াপীড়ি করলে মিথ্যা বানিয়ে বলতে হবে। বুঝতেই ত পারছ যে, তের বছরের মেয়ে আর আঠারো-উনিশ বছরের ছেলে তখনকার বাধার ভেতর যা প্রেম করতে পারে, তা নিয়ে চমকপ্রদ তেমন কোনো পূর্বরাগের ছবি তৈরী হতে পারে না—যাতে যুক্তিসিদ্ধ বাণী করবে ঝলমল, ভাবাবেগের সমুদ্র উঠবে দুলে। তের বছরের মেয়ে ক'টা কথাই বা জানে? আর যা জানে, তার ক'টাই বা বলতে পারে গুছিয়ে! তোমার ব্যাপারটা অনুমান করে নিতে হবে।

কিন্তু তাই বলে প্রেম আমাদের কিছু কম গভীর মনে কোরো না, কোন অংশেও সে অতল।

আমি তখন ভবিষ্যতের কি সব অপরূপ স্বপ্নই দেখছি নলিনীকে কেন্দ্র করে। স্বপ্নই বা তাকে বলি কেন। ভাগ্যকে তখন আমি মনে মনে ভাবী জীবনের ফরমাশ দিয়ে ফেলেছি, সে ফরমাশ যে অক্ষরে অক্ষরে পালিত হবে সে সম্বন্ধে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। আগামী যুগের আমরা অগ্রদূত—প্রগতির বার্তা বহন করে চলব এগিয়ে। পৃথিবী তখন আমাদের কেন্দ্র করেই আবর্তিত হ'তে সুরু করেছে।

নলিনী কি স্বপ্ন দেখেছিল সেই জানে, কিন্তু আমার থেকে বিশেষ তার তফাৎ ছিল বলে মনে হয় না।

এইবার গল্পকে আমি তিন চারটে বছরের উপর দিয়ে চোখ-কান-বুজে টেনে নিয়ে যাব। এখানে রইল তোমার কল্পনার অবসর। তুমি ইচ্ছামতো বিবরণে এটি ভরিয়ে নিতে পারো। শুধু মনে রেখো, মরা মানুষের বুকের সমস্ত তথ্য জেনেও জীবিত মানুষের হৃদয় সম্বন্ধে আমি হতাশ হইনি এবং নলিনীও তার পাঠ্যপুস্তকে সৃষ্টির মূলে বিষ আছে এমন কোনো তথ্য পায়নি। আমরা পরস্পরের আরো কাছে ঘেঁষে এসেছি এবং স্বপ্ন আমাদের তখন বর্ণবাহুল্যে আরো ঘোরালো হয়ে এসেছে।

এমন সময়ে ডাক্তারী পরীক্ষায় আমি হলাম সসম্মানে উত্তীর্ণ এবং সুদূর পশ্চিমে মোটা মাইনের এমন একটা চাকরীর সুযোগ পেলাম, যা ইতিপূর্বে নাকি কোনো নেটিভের ভাগ্যে জোটেনি। নলিনীর বাবাই উৎসাহ দিয়ে আমায় পাঠিয়ে দিলেন। বাঙালীর নাকি, এমনি দুঃসাহসী হবারই বিশেষ প্রয়োজন আছে। প্রেম ও কর্তব্য দুইএর মাঝে পড়ে কর্তব্যের টানে ও নলিনীর বাবার উৎসাহে আমি চলে গেলাম এমন দূরে এক জায়গায়, যেখানে সে সময়ে বৃথা অপব্যয়ের আশঙ্কায় লোকে চিঠি পাঠাতে পর্যন্ত সাহস করত না।

গল্প অত্যন্ত মামুলী প্রণালীতে চলেছে, কিন্তু সে আমার দোষ নয়।

সে সুদূর প্রবাস থেকে চৌদ্দ-চক্কর করেও বছর দুয়েকের আগে আমি ফিরতে পারলাম না। কিন্তু ফিরতে না পারলেও মনে আমার কোনো আশঙ্কা ছিল না। নলিনীর বাবার সাহস ও মানসিক সবলতায় আমার ছিল অটুট বিশ্বাস। আর যেই টলুক—মানুষের জিহ্বা সঞ্চালনে তিনি যে টলবেন না, এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু হায় মানুষের মন।

দু'বছর বাদে ফিরে এসে দেখলাম দুনিয়ায় অপ্রত্যাশিত সব পরিবর্তন হয়ে

গেছে। পৃথিবী হঠাৎ আমাকে অবজ্ঞাভরে পরিত্যাগ করে সূর্যকেই করছে প্রদক্ষিণ, পল বিপল হিসেব ক'রে। কাল আমার জন্যে অপেক্ষা করেনি, নলিনীর বাবাও না। আত্মীয়-কুটুম্বের ভর্ৎসনায় অতিষ্ঠ হয়ে নলিনীর তিনি বিবাহ দিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু আঘাত এইখানে না—আঘাত এই যে, নলিনী এক বৎসরের মধ্যে ফিরেছে বিধবা হয়ে।

মামুলি হোক, সেকেলে হোক, গল্প এইবার জমকালো হয়ে আরম্ভ হ'ল ভেবে তুমি বোধ হয় উল্লসিত হয়ে উঠছ। কিন্তু ভুল করলে, গল্প এবার প্রায় শেষ হয়ে এল। নলিনীর বাবার সংস্কারক-সত্তা আবার প্রবলভাবে জাগ্রত হওয়া সত্ত্বেও গল্প এল শেষ হয়ে।

একান্ত আদরের মেয়ের অশ্রুমোচনের সঙ্গে সমাজের গোঁড়ামির মূলে আঘাত দেবার জন্যে নলিনীর বাবা উঠলেন মেতে, ভালোবাসার পাত্রীকে ফিরে পাওয়ার সঙ্গে উদারতার একটা কীর্তি রাখবার সম্ভাবনায় আমার মন আনন্দে উঠল নেচে। কিন্তু নলিনী সেই যে ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়াল সে ঘাড় আর সোজা করা গেল না।

বিয়ে দু'বার বিয়ে—কারুর হতে পারে না, না পুরুষ না মেয়ের, এই তার মত।

সে যুগে যা অসম্ভব, নলিনীর বাপ সে সুযোগও আমায় দিলেন। নলিনীর সঙ্গে দেখা করে বুঝিয়ে বলার সুযোগ আমি পেলাম।

না, স্বামীর পাদুকা সামনে রেখে সে পূজায় বসে ছিল না—তা হ'লে বুঝি কিছু আশা থাকত! তার বদলে তার মুখে দেখলাম অপরূপ সঙ্কল্পের দৃঢ়তা, চোখে অদ্ভুত গভীর তন্ময়তা। যেন তার কাছে এপার-ওপারের যবনিকা গেছে সরে। প্রেমাস্পদের বিরহ সে জানে না।

আঘাত যেমন পেলাম, তেমনি পেলাম লজ্জা—হাঁ লজ্জা, আমার সমস্ত কথা গেল ম্লান হয়ে মনের মধ্যে মিলিয়ে। কোনোমতে সাধারণ দুটো আলাপ করে বেরিয়ে এলাম।

বুঝলাম তেরো বছরের যে কিশোরীটির সঙ্গে আমি প্রেমের ছেলেখেলা করেছিলাম, সে কোথায় গেছে হারিয়ে। পূর্ণযৌবনা নলিনীর মন সত্যকার আর এক প্রেমের অমৃত-স্বাদ পেয়ে মধুময় হয়ে আছে। সে-মনে আমার স্থান নেই।°

• প্রেমেন্দ্র মিত্র •

বিনয়বাবু থামলেন।

আমি হতাশ হয়ে বললাম, 'এই। এই আপনার ট্র্যাজিডি।'

ম্লান হেসে বিনয়বাবু বললেন, "অত অধীর হ'লে চলবে কেন? গল্প শেষ হয়ে এসেছে, কিন্তু এইখানেই নয়।

দেশ থেকে এবার বিদায় নিলাম দীর্ঘদিনের জন্যে—চিরদিনের জন্যেই ইচ্ছে ছিল কিন্তু হয়ে উঠল না। বছর পনেরো পরে আবার ফিরলাম। সে বেশী দিনের কথা নয়। কলকাতার রাস্তায় মৃগাঙ্কের সঙ্গে দেখা। ঠিকানা দিয়ে বললে, 'আমরা এখানে আছি। এক দিন আসুন না।'

মৃগাঙ্ক নলিনীর ছোট ভাই।

কোনো আশা নিয়ে নয়, অমনিই গেলাম একদিন। আহিরীটোলায় গঙ্গার ধারে ছোট একটা বাড়ি ভাড়া করে তারা আছে। দরজায় গিয়ে মৃগাঙ্কের নাম ধরে ডাকাডাকি করছি, পেছন থেকে শুনলাম, 'একটু পাশ দেবেন ত?'

গঙ্গায় স্নান করে ভিজে কাপড়ে একটি শীর্ণ চেহারার মহিলা পেছনে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি তাড়াতাড়ি পাশ কাটাতেই, ভিজে কাপড় নিংড়ে সামনে জলের ছিটে দিতে দিতে তিনি ভেতরে চলে গেলেন।

তুমি শুনেই চিনতে পেরেছ নিশ্চয় কিন্তু প্রথমটা আমি পারিনি। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, খাটো কাপড়ে শরীরের অতি কষ্টে লজ্জা নিবারণ হয়েছে—তার উপর সমস্ত মুখে চোখে অকাল প্রৌঢ়ত্বের এমন একটা ছাপ পড়েছে যে নলিনীকে চেনা কঠিন। চিনলাম আমি শুধু তার চলার ভঙ্গি দেখে।

আমি চিনলেও নলিনী যে চেনেনি একথা ঠিক। কারণ আমি 'নলিনী' বলে ডাকতেও সে পেছন ফিরে খানিক বিস্মিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

বললাম, 'চিনতে পারছ না!'

'ওঃ—বিনুদা!'—বিশেষ কিছু উল্লাস থাকবার কথা নয় সে স্বরে—আমি তা আশাও করিনি।

বললাম, 'মৃগাঙ্কের সঙ্গে সেদিন রাস্তায় দেখা। বলেছিল, তাই দেখা করতে এলাম। বাড়িতে আছে সে?'

'আছে বোধ হয়। এস-না তুমি ভেতরে!'

নলিনী এগিয়ে চলল—আমি তার পিছু নিলাম। লক্ষ্য করে দেখলাম এপাশে

সে প্রত্যেকবার পা ফেলবার আগে ভিজে কাপড় নিংড়ে গঙ্গাজল সামনে ছিটোতে ছিটোতে চলেছে।

বাইরের দরজা থেকে একটা লম্বা গলির মতো রাস্তা পার হয়ে নলিনীদের বাড়ির ভেতর ঢুকতে হয়। গলিটা থাকার দরুনই নলিনীর এ আচরণ আমার চোখে পড়ল। [illegible] এক এক বার সে পিছন ফিরে সন্ত্রস্ত ভাবে তাকাচ্ছে।

প্রথমটা মানে বুঝতে পারিনি, কিন্তু গলিপথ শেষ হবার আগেই সেটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

ভেতরের দরজার কাছাকাছি এসে নলিনী হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, একটু ইতস্ততঃ করে কুণ্ঠিতভাবে বললে, 'তুমি, তুমি ভেতরে যাও। আমি একটু আসছি!'

'আবার কোথায় যাবে?'

[illegible] কুণ্ঠিত ভাবে নলিনী বললে, 'কি একটা যেন মাড়ালাম, আমি আর একটা ডুব দিয়ে আসছি—'

ওর পায়ের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'কিছু ত মাড়াও নি! ওটা একটা কাঠি।'

অমনি কুণ্ঠিতভাবে সে বললে, 'কি এঁটো কাঁটা হবে! আমি,—আমি যাই। তুমি যাও না—[illegible] আছে।'

ওর মুখের দিকে এবার ভালো করে তাকিয়ে দেখবার সুযোগ পেলাম। কোথায় গেছে সে প্রেমের আনন্দের জ্যোতি, কোথায় সে তপস্যার কাঠিন্য! সমস্ত মুখে অকাল বার্ধক্যের ছাপ, চোখের কোণে অধরের দুপাশে ক্লান্তি ও দুর্বলতার গভীর রেখা। কে বলবে এই সেই [illegible] নারী, যাকে দেখে একদিন মনে [illegible] যে [illegible] জীবন-মৃত্যু [illegible] এর কাছে হার মেনে গেছে!

[illegible] কুণ্ঠিতভাবে নলিনী আবার ফিরে গেল গঙ্গার দিকে।

[illegible] আমাকে ভেতরে নিয়ে যেতে যেতে বললে, 'দিদি আবার গঙ্গায় ডুব দিতে গেল ত? সকাল থেকে এই চারবার, এখনো [illegible] দিন আছে। [illegible] কোন কাজ!'

আমাকে [illegible] করে [illegible] সে [illegible] বললে, 'এর কোনো ব্যবস্থা আছে বলতে পারেন? এই ত দেখছেন না [illegible] [illegible] [illegible]-অনশন [illegible]। [illegible]

• [illegible] •

ভেতর। এত করেও তবু কিছুতে সন্দেহ যায় না। আধঘণ্টা অন্তর গঙ্গায় ডুব দিয়ে আসছে! সারাদিন এই ছুঁলে, সেই ছিটে লাগল—এ ছাড়া কোনো চিন্তা নেই। একেবারে জ্বালাতন হয়ে গেলাম—'

নলিনীদের বাড়ি তারপর আর যাইনি।'

বিনয়বাবু এবার চুপ করলেন।

বললাম, 'আপনি যে শেষ পর্যন্ত ডাক্তারী শাস্ত্রই এনে ফেললেন।'

বিনয়বাবু ম্লান হেসে বললেন, 'ট্র্যাজিডি ত সেইখানেই। অপরূপ, রহস্যময় এই মানব-আত্মা শূন্য আকাশ যে দেবতায় ভরিয়ে তোলে, প্রেমকে মৃত্যুর ওপারেও জয়ী করবার যে স্পর্ধা করে, শেষ পর্যন্ত সেও একটা শুকনো, কুৎসিত ডাক্তারী শাস্ত্রের অধীন। ডাক্তারী শাস্ত্রের অমোঘ বিধান তার সমস্ত আদর্শ, সমস্ত বাস্তবকে নির্মমভাবে গুঁড়িয়ে থেঁৎলে নিজের নির্দিষ্ট পথে চলে যায়।'

'এটা কি ঠিক সেকালের ট্র্যাজিডি হ'ল?' জিজ্ঞাসা করলাম।

বিনয়বাবু বললেন, 'হাঁ, সেকালের ট্র্যাজিডি—একালের দৃষ্টিতে দেখা।'

দিনটা ভারী বিশ্রী। শীতের দিনে বাদলার মতো এত অস্বস্তিকর আর কিছু বোধ হয় নাই। বৃষ্টি ঠিক যে পড়িতেছে তাহা নয়। কিন্তু মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ও ম্লান পৃথিবী কেমন মৃতের মতো অসাড় হইয়া আছে। সোমেশ হঠাৎ আজ আসিয়া না পড়িলে কেমন করিয়া দুপুরটা কাটাইতাম বলিতে পারি না। কিন্তু সোমেশও আজ যেন কেমন হইয়া আসিয়াছে।

খবরের কাগজটা দু'একবার উল্টাইয়া পাল্টাইয়া সোমেশের সামনে ফেলিয়া দিয়া বলিলাম, 'একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখেছ?'

'কি?'

'আজকের কাগজে একসঙ্গে সাত সাতটা নিরুদ্দেশ-এর বিজ্ঞাপন।'

সোমেশ কোনো কৌতূহলই প্রকাশ করিল না। যেমন বসিয়া ছিল, তেমনি উদাসীন ভাবেই শুধু সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িতে লাগিল। নিস্তব্ধ ঘরের ভিতর ধোঁয়ার কুণ্ডলী শুধু ধীরে ধীরে পাক খাইতে খাইতে ঊর্ধ্বে উঠিতেছে। আর সমস্তই নিশ্চল নিস্তব্ধ। বাইরের অসাড়তা যেন আমাদের মনের উপরও চাপিয়া ধরিয়াছে।

নেহাৎ একটা কিছু করিয়া এই অস্বস্তিকর স্তব্ধতা ভাঙিবার প্রয়োজনেই আরম্ভ করিলাম, 'নিরুদ্দেশ-এর এই বিজ্ঞাপনগুলো দেখলে কিন্তু আমার হাসি পায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যাপারটা কি হয় জান ত? ছেলে হয়ত রাত করে থিয়েটার দেখে বাড়ি ফিরেছেন। এমন তিনি প্রায় ফিরে থাকেন আজকাল। খেতে বসবার সময় বাবা কয়েকদিন খোঁজ করেছেন—'কোথায় গেলেন বাবু? তোমার আদরের পুত্রটি!'

লুকোন পুঁজি থেকে মা বিকেলে ছেলের পেড়াপীড়িতে টাকা ক'টা বার করে দিয়েছেন। সুতরাং তিনি জেনে শুনে মিথ্যে আর বলতে পারেন না, চুপ করে থাকেন।

বাবা বলে যান, 'এত রাত্রেও বাবুর আসবার সময় হ'ল না। আরবারে ও চিঠি করে মাথা কিনেছেন। এবার কি করে উদ্ধার করবেন বুঝতেই পারছি।

পয়সাগুলো আমার খোলামকুচি কিনা তাই নবাবপুত্তুর যা খুশি তাই করছেন। দূর করে দেব, এবার দূর করে দেব।'

এই মৌখিক আস্ফালনেই হয়ত ব্যাপারটা শেষ হতে পারত। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে গুণধর পুত্রের প্রবেশ।

বাবা ঝোঁকটা আর কাটিয়ে উঠতে পারেন না। নিজের কাছে মান রাখবার জন্যেও কিছু বলতে হয়।

কতটা রাগ দেখান উচিত ঠিক করতে না পেরে বলার মাত্রাটা একটু বেশী হয়ে পড়ে।

শেষ পর্যন্ত বাবা বলেন, 'এমন ছেলের আমার দরকার নেই—বেরিয়ে যা।'

অভিমানী ছেলে আর কিছু না হোক পিতৃদেবের এ আদেশ তৎক্ষণাৎ পালন করতে উদ্যত হয়।

মা কোন্ দিক সামলাবেন বুঝতে না পেরে কাতরভাবে শুধু বলেন, 'আহা, খাওয়া-দাওয়ার সময় কেন এসব বল ত! পরে বললেই ত হ'ত।'

বাবা এবার মা'র ওপর মারমুখী হয়ে উঠেন, 'তোমার আস্কারাতেই ত উচ্ছন্নে গেছে। মাথাটি ত তুমিই খেয়েছ আদর দিয়ে।'

মা আঁচলে চোখ মোছেন। ছেলে বিশাল পৃথিবীতে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়ে পড়ে।

পরের দিন ভয়ানক কাণ্ড। মা সেই রাত থেকে দাঁতে কুটি কাটেন নি। আজকের দিনও বিছানা থেকে উঠবেন মনে হয় না। বাবারও হয়ত রাত্রে ঘুম হয়নি। কিন্তু সে কথা প্রকাশ করবেন কোন্ মুখে।

গৃহিণীকে ধমক দিয়ে বলেন, 'মিছি মিছি প্যান্ প্যান্ কোরো না, অমন ছেলে যাওয়াই ভালো।'

মা'র কান্না আবার উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

বাবা এবার দাঁত খিঁচিয়ে বললেও নিজের মনের আশার কথাটাই বোধ হয় জানান—'তাও গেলে ত বাঁচতাম। এ বেলাই দেখো সুড় সুড় করে আবার ফিরে আসবে। এমন বিনিপয়সার হোটেলখানা পাবে কোথায়।'

মা এবার আতঙ্কিত স্বরে বলেন, 'এই দারুণ শীতে কাল সারারাত কোথায় ছিল কে জানে! কি ক'রে বসে আমার তাই ভয়।'

'হ্যাঁ ভয়।'…বাবা কথাটাকে ব্যঙ্গ করেই উড়িয়ে দিতে চান—'তোমার ছেলে

কিছু করেনি গো কিছু করেনি। গিয়ে আছে কোনো বন্ধুর বাড়ি। অসুবিধে হ'লেই এসে দেখা দেবে।'

মা'র কান্না তবু থামে না—'কি রকম অভিমানী জান ত।'

বিরক্ত হয়ে বাবা বেরিয়ে যান। সন্ধ্যাবেলা অফিস থেকে ফিরে এসে দেখেন অবস্থা গুরুতর। ছেলে ফেরেনি। মা শয্যা থেকে আর উঠবেন না বলেই পণ করেছেন।

'না, আর থাকতে দিলে না! এ অশান্তির চেয়ে বনবাস ভালো।' বলে বাবা বেরিয়ে পড়েন এবং ওঠেন গিয়ে একেবারে খবরের কাগজের অফিসে।

খবরের কাগজের অফিসের ব্যাপারটা বড় জটিল। কোন্ দিকে কি করতে হয় কিছু বোঝা যায় না। খানিক এদিক ওদিক বিমূঢ় ভাবে ঘুরে এক দিকের একটা অফিস-ঘরে ঢুকে প'ড়ে নিরীহ চেহারার এক ভদ্রলোককে বেছে নিয়ে সাহস করে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনাদের কাগজে এই—এই একটা খবর বার করতে চাই।'

নিরীহ চেহারার লোকটি হঠাৎ মুখ তুলে ব্যঙ্গের স্বরে বলেন, 'খবর! কেন, আমাদের খবরগুলো পছন্দ হচ্ছে না। আমরা কি এতদিন রাম-যাত্রা বার করছি?'

বাবা একটু হতভম্ব হয়ে একবার অসহায় ভাবে চারিদিকে তাকান। পাশের যে ভদ্রলোকটির মুখ দেখে অত্যন্ত রূঢ় প্রকৃতির মনে হয়েছিল, তিনিই সহানুভূতির স্বরে বলেন, 'আহা কি করছ! ভদ্রলোক কি বলতে চান, শোনোই না। বসুন আপনি।'

বাবা একটা চেয়ারে একটু অপ্রস্তুত ভাবে বসবার পর তিনি বলেন, 'কি খবর এনেছেন?'

'আজ্ঞে, ঠিক খবর নয়, এই—এই একটু বিজ্ঞাপন!'

'বিজ্ঞাপন? কিসের বিজ্ঞাপন? কতটা স্পেস দরকার? কপি এনেছেন?'

বাবা আরো বিব্রত ভাবে বলেন, 'আজ্ঞে, ঠিক বিজ্ঞাপন নয়—এই আমার ছেলে বাড়ি থেকে চলে গিয়েছে—'

তাঁকে আর কথা শেষ করতে হয় না। টেবিলের অপর দিক থেকে ভদ্রলোক বলেন, 'ও বুঝেছি, নিরুদ্দেশ! কি দেবেন—চেহারার বর্ণনা, না, ফিরে আসবার অনুরোধ!'

বাবা যেন এতক্ষণে কূল পেয়ে বলেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, ফিরে আসবার অনুরোধ। ওর মা বড় কাঁদাকাটি করছে।'

'বুঝেছি, বুঝেছি। রাগারাগি করে গিয়েছে বুঝি?' ভদ্রলোক একটা কাগজের প্যাড বাবার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলেন, 'নিন, লিখে দিন।'

'লিখে!' বাবার মুখের বিপদগ্রস্ত ভাব অত্যন্ত স্পষ্ট।

ভদ্রলোক দয়াপরবশ হয়ে বলেন, 'আচ্ছা, আমরা লিখে দেব'খন। আপনি শুধু নামটামগুলো দিয়ে যান।'

পরিচয় ইত্যাদি দিয়ে যাবার সময় বাবা অনুরোধ করেন, 'একটু ভালো করে লিখে দেবেন। ওর মা কাল থেকে জলগ্রহণ করেনি।'

'সে বলতে হবে না, এমন লিখে দেব যে, প'ড়ে আপনার ছেলে কেঁদে ভাসিয়ে দেবে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

আশ্বস্ত হয়ে বাবা ঘরে ফেরেন। কিন্তু অশ্রুসজল বিজ্ঞাপন বার হবার আগেই দেখেন ছেলে ঘরে এসে হাজির।

অনুতপ্ত হয়ে সে এসেছে মনে কোরো না; সে বাড়িতে থাকতে আসেনি। শুধু একবার চলে যাবার আগে তার গোটাকতক বই নিয়ে যেতে এসেছে।

এবার মা'র ক্রুদ্ধস্বর শোনা যায়, 'তা যাবি বইকি; অমনি কুলাঙ্গার ত তুই হয়েছিস্। কোনো ছেলে যেন আর বকুনি খায় না। তুই একেবারে পীর হয়েছিস্। কাল সারারাত দু'চোখের পাতা এক করেননি তা জানিস্। ভেবে ভেবে চেহারাটা আজ কি হয়েছে দেখে আয়। উনি তেজ করে চলে যাবেন!'

বাবা এবার ভেতরে ঢুকে মৃদুস্বরে বলেন, 'আঃ, আর বকাবকি কেন?'

মা ধমক দিয়ে বলেন, 'তুমি থামো। অত আদর ভালো নয়। একটু বকুনি খেয়েছেন বলে ছেলে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে এত বড় আস্পর্ধা!'

অধিকাংশ নিরুদ্দেশের বিজ্ঞাপনের ইতিহাসই এই।"

সোমেশের সিগারেটটা তখন শেষ হইয়াছে। এতক্ষণ ধরিয়া আমার কথা সে মোটেই শুনিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। একবার একটু নড়িয়া বসিতেও তাহাকে দেখা যায় নাই।

একটু বিরক্ত স্বরেই বলিলাম, 'কি হয়েছে তোমার বলো ত? মিছিমিছিই আমি একলা বকে মরছি।'

সে কথার কোনো উত্তর না দিয়া সোমেশ হঠাৎ ছড়ান পা গুটাইয়া লইয়া

সোজা হইয়া বসিয়া সিগারেটের অবশিষ্টটুকু ফেলিয়া দিল। তারপর বলিল, 'তুমি জান না। এই বিজ্ঞাপনের পেছনে অনেক সত্যকার ট্র্যাজিডি থাকে।'

'তা থাকে যে আমি অস্বীকার করছি না। কখন কখন সত্যিই যে যায় সে আর ফেরে না।'

সোমেশ একটু হাসিয়া বলিল, 'না, তা বলছি না। ফিরে আসারই ভয়ানক একটা ট্র্যাজিডির কথা আমি জানি।'

আমি উৎসুক ভাবে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলাম, 'তার মানে?'

'শোনো বলছি।'

বাহিরে এতক্ষণে বৃষ্টি আবার আরম্ভ হইয়াছে। কাঁচের সার্সির ভিতর দিয়া বাহিরের রাস্তাঘাট ঝাপসা অবাস্তব দেখাইতেছে। মনে হইতেছে আমরা যেন সমস্ত পৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছি।

"পুরোন খবরের কাগজের ফাইল যদি উল্টে দেখ, তাহ'লে দেখতে পাবে বহু বছর আগে এখানকার একটি প্রধান সংবাদপত্রের পাতায় দিনের পর দিন একটি বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে। সে বিজ্ঞাপন নয়, সম্পূর্ণ একটি ইতিহাস। দিনের পর দিন ধারাবাহিক ভাবে পড়ে গেলে একটি সম্পূর্ণ কাহিনী যেন জানা যায়। মনে হয় ছাপার লেখায় সত্যি যেন কান পাতলে কাতর আর্তনাদ শোনা যাবে। সে বিজ্ঞাপন অবশ্য নিরুদ্দেশের। প্রথম দেখা যায় মায়ের কাতর অনুরোধ ছেলের প্রতি ফিরে আসবার জন্যে। অস্পষ্ট আড়ষ্ট ভাষা, কিন্তু তার ভেতর দিয়ে কি ব্যাকুলতা যে প্রকাশ পেয়েছে তা না পড়লে বোঝা যায় না। ধীরে ধীরে মায়ের কাতর অনুরোধ হতাশ দীর্ঘশ্বাসের মতো খবরের কাগজের পাতায় যেন মিলিয়ে যেতেও দেখা গেল। তারপর শোনা গেল পিতার গম্ভীর স্বর, একটু যেন কম্পিত তবু ধীর ও শান্ত—'শোভন ফিরে এসো। তোমার মা শয্যাগত। তোমার কি এতটুকু কর্তব্যবোধও নেই!'

বিজ্ঞাপন তার পরেও কিন্তু থামল না। পিতার স্বর ভারী হয়ে আসছে যেন; মনে হয় যেন গলাটা ধরা।—'শোভন, এখন না এলে তোমার মাকে আর দেখতে পাবে না।'

কিন্তু শোভনের হৃদয় এতে বুঝি গলল না। দেখা গেল বিজ্ঞাপন সমান ভাবে চলেছে; শুধু পিতার নিজেকে সামলাবার আর ক্ষমতা নাই। এবার তাঁর স্বরে

কাতরতা—শুধু কাতরতা নয়, একান্ত দুর্বলতা—'শোভন, জান না আমাদের কেমন করে দিন যাচ্ছে! এসো, আর আমাদের দুঃখ দিও না।'

বিজ্ঞাপন ক্রমশঃ হতাশ হাহাকার হয়ে উঠল। তারপর একেবারে গেল বদলে। আর শোভনকে উদ্দেশ করে কিছু লেখা নেই। সাধারণ একটি বিজ্ঞপ্তি মাত্র। এই ধরনের এই চেহারার এই বয়সের একটি ছেলে। আজ এক বৎসর তার কোনো সন্ধান নেই। সন্ধান দিতে পারলে পুরস্কার পাওয়া যাবে।

পুরস্কারের পরিমাণ ক্রমশঃই বাড়তে লাগল খবরের কাগজের পাতায়। দোহারা ছিপছিপে একটি বছর ষোল-সতেরোর ছেলে। পরিচয়-চিহ্ন ঘাড়ের দিকে ডান কানের কাছে একটি বড় জড়ুল। জীবিত না মৃত এইটুকু যদি কেউ সন্ধান দিতে পারে তাহ'লেও পুরস্কার পাওয়া যাবে।"

সোমেশ চুপ করিল খানিকক্ষণের জন্য। জলের ছাটে সাসির কাঁচ একেবারে ঝাপসা হইয়া গেছে। ঘরের ভিতর ঠাণ্ডায় মনে হইতেছে একটা কম্বল-টম্বল জড়াইতে পারিলে ভালো হয়।

বলিলাম, 'এ ত গেল বিজ্ঞাপনের উপাখ্যান। আসল ব্যাপারের কিছু জান নাকি?'

"জানি। শোভনকে আমি জানতাম। সে যে কোনো ভয়ঙ্কর অভিমানের বশে বাড়ি ছেড়ে এসেছিল তা মনে কোরো না। বাড়ি ছাড়াটাই তার কাছে একান্ত সহজ। ছুতোটা যা হোক কিছু হ'লেই হ'ল। পৃথিবীতে দু'একটা লোক আসে জন্ম থেকেই একেবারে নির্লিপ্ত মন নিয়ে। তারা ঠিক কঠিন-হৃদয় নয়। বরং বলা যেতে পারে তাদের মন তৈলাক্ত। পিচ্ছিল বলে তারা কোথাও ধরা পড়ে না, কিছুই তাদের মনে দাগ দিতে পারে না। শুনলে আশ্চর্য হবে, খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের সংবাদ জানলেও সেগুলো সে অনুসরণই করেনি। কোন-দিন চোখে পড়েছিল হয়ত—তারপর অনায়াসে সেগুলো গেছল ভুলে। বাড়ির বাইরে যে সমস্ত দুঃখ অসুবিধায় অন্য কেউ হ'লে হয়রান হয়ে পড়ত তার ভেতরেই সে পেয়েছে মুক্তির স্বাদ। অন্য কেউ যাই ভাবুক, সে নিজেকে একটি ছোট সংসারের আদরের ছেলে হিসেবে শুধু ভাবতে পারেনি। কিন্তু বিজ্ঞাপন যেদিন হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল, সেদিন কেন বলা যায় না তার উদাসীন মনও বিচলিত হয়ে উঠল। বিজ্ঞাপন বন্ধ হয়েছিল একটু অসাধারণ ভাবে। ক্লান্তভাবে চলতে চলতে একদিন হঠাৎ তা থেমে যায়নি, হঠাৎ যেন একটা ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনায় সংবাদপত্রের পাতা

শুরু হয়ে গেল। শোভনের চেহারার বর্ণনার বদলে হঠাৎ একদিন দেখা গেল :

'শোভন, তোমার মা'র সঙ্গে আর তোমার বুঝি দেখা হ'ল না। তিনি শুধু তোমারই নাম করছেন এখনো।'

তারপর আর কোনো বিজ্ঞাপন দেখা গেল না।

প্রায় দুই বৎসর তখন কেটে গেছে। শোভন একদিন হঠাৎ গিয়ে হাজির তার দেশে। একটা ব্যাপারে শোভনের প্রকৃতির খানিকটা পরিচয় পাবে। সে কথাটা আগে বলিনি। শোভন সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে নয়। সম্পন্ন বললেও তাদের ঠিক বর্ণনা করা হয় না। তাদের প্রাচীন জমিদারী অনেক দুর্দিনের ভেতর দিয়ে এসেও তখন তেমন ক্ষয় পায়নি। শোভনই তার একমাত্র উত্তরাধিকারী।"

সোমেশ একটু থামিতেই আমি বলিলাম, 'থাক্, শেষটুকু আর না বললেও চলবে। বুঝতে পেরেছি।'

সোমেশ একটু হাসিয়া কোনো উত্তর না দিয়া বলিয়া চলিল, "দু'বছর স্বাধীন জীবনের দুঃখ-কষ্ট গায়ে না মাখলেও তার ছাপ শোভনের ওপর তখন পড়েছে। দু'বছরে সে অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু তাই বলে তাদের কর্মচারীরা তাকে চিনতে পারবে না এতটা সে আশঙ্কা করেনি।

শোভন দেশে পৌঁছে সোজাসুজি তাদের বাড়ি ঢুকছিল, প্রথমে তাকে বাধা দিলেন তাদের পুরোন নায়েব মশাই।

'কাকে চান?'

শোভন হেসে বললে, 'কাউকে না; বাড়িতে যেতে চাই।'

নায়েব মশাই তার দিকে খানিক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে তারপর একটু স্মিতহাস্যে বললেন, 'ও, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কেন? আসুন, বার-বাড়িতে একটু বিশ্রাম করুন।'

শোভন অবাক হয়ে বললে, 'সে কি? কি হয়েছে নায়েব মশাই!'

'না না, হয়নি কিছু।'

'মা ভালো আছেন?' শোভনের প্রশ্নে এবার সত্যি ব্যাকুলতা ছিল।

নায়েব মশাই তেমনি অদ্ভুত হাসি হেসে বললেন, 'ভালো আছেন বইকি। আসুন। আসুন আমার সঙ্গে।'

শোভন তবু বললে, 'কিন্তু ভেতরে গেলেই ত হয়।'

নায়েব মশাই একটু যেন কঠিন স্বরে বললেন, 'না, হয় না। আপনি আমার সঙ্গে আসুন।'

শোভন রীতিমত বিমূঢ় অবস্থায় এবার নায়েব মশাইকে অনুসরণ করে বার-বাড়িতে গিয়ে উঠল। দু'বছরে সেখানে কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে। পুরোন সরকার তাদের নেই। নতুন দুটি লোক সেখানে বসে খাতা লিখছে। তার পরিচিত বৃদ্ধ খাজাঞ্চি মশাইকে দেখে সে যেন আশ্বস্ত হ'ল।

নায়েব মশাই তাকে একটা চেয়ারে বসতে বলে খাজাঞ্চি মশাইকে উদ্দেশ করে বললেন, 'ইনি ভেতরে যেতে চাইছেন।'

শোভনের কাছে নায়েব মশাইএর গলার স্বর কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হ'ল। খাজাঞ্চি মশাই নাকের ওপরকার চশমাটা একটু আঙুল দিয়ে তুলে তার দিকে চেয়ে বললে, 'ওঃ, ইনি আজই এসেছেন বুঝি।'

'হ্যাঁ, এই মাত্র।'

শোভন এবার অধীর ভাবে বলে উঠল, 'আপনারা কি বলতে চান স্পষ্ট করে বলুন। মা'র কি কিছু হয়েছে? বাবা কেমন আছেন?'

চারিধারের সব ক'টা দৃষ্টি তার ওপর অদ্ভুত ভাবে নিবদ্ধ। খানিকক্ষণ সকলেই নীরব। তারপর নায়েব মশাই বললেন, 'তাঁরা সবাই ভালো আছেন। কিন্তু এখন ত আপনার সঙ্গে দেখা হবে না।'

এবার শোভন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল, 'কেন দেখা হবে না? আপনাদের কি মাথা খারাপ হয়েছে? আমি চললুম।'

শোভন উঠল। কিন্তু নায়েব মশাই দরজার কাছে সামান্য একটু এগিয়ে গিয়ে শান্ত ভাবে বললেন, 'দেখুন, মিছিমিছি কেলেঙ্কারী করে লাভ নেই। তাতে ফল হবে না কিছু।'

হঠাৎ শোভনের কাছে সমস্ত ব্যাপারটা ভয়ঙ্কর ভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠল। সে বিস্মিত ভীত কণ্ঠে বললে, 'আপনারা কি আমাকে চিনতে পারছেন না!'

সকলে নীরব।

'আমি শোভন,—বুঝতে পারছেন না আমি শোভন!'

নায়েব মশাই এবার বললেন, 'আপনি একটু দাঁড়ান, আমি আসছি।' পাশের ঘরে গিয়ে টেবিলের একটা ড্রয়ার খুলে তিনি একটা জিনিস এনে শোভনের হাতে

দিলেন। তারই একটা পুরোন ফটো, সাধারণ ভাবে তোলা। এখন অস্পষ্ট হয়ে এসেছে একটু।

নায়েব মশাই বললেন, 'চেনেন একে?'

শোভন বিস্মিত কণ্ঠে বললে, 'এ ত আমারই ফটো। দেখুন ভালো করে আপনারাই মিলিয়ে। নাঃ, এ অসহ্য!'

চুলগুলো মুঠি করে ধ'রে সে বসে পড়ল।

নায়েব মশাই তার সঙ্গে বসে বললেন, 'দেখুন, কিছু মনে করবেন না। আপনার সঙ্গে একটু মিল আছে সত্যি। কিন্তু এর আগে আরো দুজনের সঙ্গে ছিল। প্রায় অনুরূপ খবর। আমাদের এ নিয়ে গোলমাল করতে মানা আছে। আমরা কিছু হাঙ্গামা করব না। আপনি এখন চলে যেতে পারেন।'

শোভন উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে সকলের দিকে চেয়ে দেখলে। সকলের দৃষ্টিতে অবিশ্বাস। কাতর ভাবে বললে, 'একবার শুধু আমি মা-বাবার সঙ্গে দেখা করব। আপনারা বিশ্বাস করছেন না। কিন্তু একবার আমায় শুধু দেখা করতে দিন।'

নায়েব মশাই হতাশ ভাবে হাতের ভঙ্গি করে বললেন, 'শুনুন তাহ'লে। সাতদিন আগে শোভন মারা গেছে। তার মৃত্যুর খবর আমরা পেয়েছি।'

শোভন এই অবস্থাতে না হেসে পারলে না; বললে, 'কেমন করে মারা গেল?'

তার কণ্ঠস্বরের বিদ্রূপ উপেক্ষা করে নায়েব মশাই বললেন, 'মারা গিয়েছে রাস্তায় গাড়ি চাপা পড়ে অপঘাতে। নামধাম পরিচয় পাওয়া সম্ভব হয়নি। কিন্তু যারা দুর্ঘটনার সময় উপস্থিত ছিল তাদের কয়েকজন খবরের কাগজে আমাদের বিজ্ঞাপন দেখে আমাদের সব কথা জানিয়েছে। হাসপাতালেও আমরা খবর নিয়েছি। সেখানকার ডাক্তারের বর্ণনাও আমাদের সঙ্গে মিলে গিয়েছে।'

শোভন এর পর কি করত বলা যায় না, কিন্তু সেই সময় দেখা গেল তার বাবা বাড়ি থেকে বেরুচ্ছেন। মানুষের সঙ্গে ঝড়ে-ভাঙা গাছের যে এতদূর সাদৃশ্য হতে পারে, সাহিত্যের উপমা পড়েও কখনো তার মনে হয়নি। তাঁর চলার গতিতে পর্যন্ত যেন ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার পরিচয় আছে।

সকলে কিছু বুঝে উঠবার আগেই শোভন দৌড়ে ঘর থেকে বার হয়ে গেল। নায়েব ও কর্মচারীরা ব্যাপারটা বুঝে যখন তার পিছু নিলে, তখন সে বাবার কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে।

'বাবা!'

বৃদ্ধ থমকে দাঁড়ালেন। সে মুখের বেদনাময় বিমূঢ়তা শোভনের বুকে ছুরির মতো বিঁধল।

'বাবা, আমায় চিনতে পারছ?'

বৃদ্ধ স্খলিত-পদে এক পা এগিয়ে আবার থমকে গেলেন। প্রবল ভাবাবেগ তাঁর বার্ধক্যের শিথিল মুখকে বিকৃত করে দিচ্ছে।

তখন নায়েব মশাই ও কর্মচারীরা এসে পড়েছেন।

বৃদ্ধ কম্পিত হাত তুলে কম্পিত স্বরে বললেন, 'কে!'

নায়েব মশাই শোভনের কাঁধে দৃঢ়ভাবে হাত রেখে বললেন, 'না, কেউ না। সেই সেবারের মতো—এই নিয়ে তিন বার হ'ল।'

একজন কর্মচারী বললে, 'আমরা আসতে দিইনি, হঠাৎ আমাদের হাত ছাড়িয়ে—'

বৃদ্ধ তাকে থামিয়ে বললেন, 'কিছু বোলো না, চলে যেতে দাও।' বৃদ্ধ শেষ বার শোভনের দিকে কাতর ভাবে চেয়ে আবার ঘরের দিকে ফিরলেন।

শোভন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। নায়েব মশাই তাকে কি বলছিলেন। অনেকক্ষণ সে কিছু শুনতে পায়নি। কখন সে আবার বার-বাড়িতে এসে বসেছে তাও তার মনে নেই।

আচ্ছন্নতা তার কাটল খানিক বাদে। ভেতর-বাড়ি থেকে একজন কর্মচারী নায়েব মশাইকে এসে কি বলছে। নায়েব মশাই তাকে কি বলছেন ঠিক শোনা যাচ্ছে না। না, এইবার বোঝা যাচ্ছে। নায়েব মশাইএর হাতে অনেকগুলা টাকার নোট। কণ্ঠস্বরে তাঁর মিনতি।

শোভনকে একটা কাজ করতে হবে। বাড়ির কর্ত্রী মুমূর্ষু, ছেলের মৃত্যু-সংবাদ তিনি শোনেন নি। তাঁকে কিছু জানানো হয়নি। এখনো তিনি তাকে দেখবার আশা করে আছেন—সেই জন্যেই বুঝি তিনি মৃত্যুতেও শান্তি পেতে পাচ্ছেন না। শোভনকে তাঁর হারানো ছেলে হয়ে একবার দেখা দিতে হবে। মুমূর্ষুর নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে কোনো কিছু ধরা পড়বে না। হারানো ছেলের সঙ্গে তার সত্যি সাদৃশ্য আছে। মৃত্যুপথ-যাত্রীকে এই শেষ সান্ত্বনাটুকু দেবার জন্যে জমিদার নিজে তাকে কাতর অনুরোধ জানিয়েছেন। তার এতে কোনো ক্ষতি নেই।

নায়েব মশাই নোটের তাড়াটা শোভনের হাতে গুঁজে দিলেন।

সোমেশ চুপ করিল। খানিকক্ষণ বাইরের বৃষ্টির শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নাই। আমি অবশেষে বলিলাম, 'সোমেশ, তোমার কানের কাছে একটা জড়ুল আছে।'

সোমেশ হাসিয়া বলিল, 'সেই জন্যেই গল্প বানানো সহজ হ'ল।'

কিন্তু কেন বলা যায় না—শীতের বাদলের এই শীতল প্রাণ্ধকার অস্বাভাবিক অপরাহ্ণে তার হাসিটাই বিশ্বাস করিতে আমার প্রবৃত্তি হইল না।

বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে

ঘরের দরজায় ধাক্কার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িউলীর কর্কশ গলা শোনা গেল, 'ভরসন্ধের দরজা বন্ধ কেন লা, বেগুন ? খোল্ না, কতক্ষণ দাঁড়াব !'

প্রদীপের অস্পষ্ট আলোকে একটি বিগত-যৌবনা রোগা লম্বা স্ত্রীলোক সিল্কের একটা শাড়ী সেলাই করছিল। স্ত্রীলোকটির ঠিক বয়স আন্দাজ করা কঠিন হ'লেও সিল্কের শাড়ীটি যে সমস্ত উজ্জ্বলতা ও সৌন্দর্য খুইয়ে বীভৎস প্রৌঢ়ত্বে এসে পৌঁছেছে এটা সহজেই বোঝা যায়।

দরজায় প্রথম আঘাত শুনে বেগুন কিসের আশায় একটু চঞ্চল হয়ে তাড়াতাড়ি শাড়ীটি বিছানার তলায় লুকোবার চেষ্টা করতে গেছল, কিন্তু তারপর বাড়িউলীর গলার স্বর শুনে সেটি আর না লুকিয়ে বিরক্ত স্বরে বললে, 'খোলাই আছে, জোরে ধাক্কা দাও।' তারপর আবার সে সেলাইএ মন দিলে।

তার হারান-যৌবনের সমস্ত সম্পদের মধ্যে ঐ কণ্ঠস্বরটুকু বুঝি এখনো অবশিষ্ট ছিল। কণ্ঠস্বরটি ছেঁড়া জুতোর নতুন ফিতার মতো একেবারে বেখাপ্পা।

বাড়িউলী তার বিপুল বাতগ্রস্ত দেহ নিয়ে অতি কষ্টে একপায়ের ওপর ভর দিয়ে বেঁকে আর একপা তুলে উঁচু চৌকাঠটা ডিঙিয়ে ঘরে ঢুকে বললে, 'সে ছোঁড়া ত আজও এল না রে, বেগুন—সে এবার ভেগেছে।'

বেগুন কোনো কথা না বলে নীরবে শাড়ীটা সেলাই করতে লাগল।

বাড়িউলী তক্তপোষ কাঁপিয়ে বসে বললে, 'বলছিলুম কি, এই বেলা তোর তাগা জোড়াটা বিক্রী করে ফেল্ ; শশীর বাবু ত শশীকে এক জোড়া কিনে দেবে বলছে, আমি বন্দোবস্ত করে তোর তাগা জোড়াই গছিয়ে দেব'খন।'

শাড়ীটা সেলাই শেষ করে সেটা সন্তর্পণে পাট করতে করতে বেগুন বললে, 'মাসি তাগা বিক্রী করব না তোমায় কতবার বলেছি, তবু তুমি বিরক্ত করতে আস কেন বলো ত মাসী— ? এখন যাও বাপু, আমার কাজ আছে।'

অতিরিক্ত ক্রোধেও মাসীর স্থূলদেহ স্থূলতর হবার আর কোনো সম্ভাবনা ছিল না। মাসীর কর্কশ কণ্ঠস্বর কিন্তু সপ্তমে উঠল—

'কেন যাব না, কেন ? সে আমার দু'মাসের ভাড়া দে, গাঙে পিণ্ডে দে

ছ'মাস গিলেছিস সেই খোরাকি দে। আমি তোর কাছে ভিখিরী হয়ে এসেছি; আমার পাওনা চুকিয়ে দিয়ে বেরো আমার বাড়ি থেকে, কালই আমি খেঁদিকে এনে বসাব। ঘাটের মড়া! দু-ছ'মাসে একটি মিন্‌সে ওর চৌকাঠ মাড়াল না, ওর আবার রোখ্! কিছু বলি না বলে। ভালোমানুষীর কালই নেই, ভালো কথা বলতে এলুম, না আমি বিরক্ত করতে এলুম! ভাগা বেচবি না-ত ক'দিন তোকে অমনি-অমনি পুষ্‌ব রে মড়া?'

দম ফুরিয়ে গেছল বলেই বোধ হয় বাধ্য হয়ে এবার চুপ করে মাসী হাঁপাতে লাগল।

মাসীর কণ্ঠস্বরে বাড়িময় সাড়া পড়ে গিয়েছিল, দরজার কাছে যে কয়েকজন এসে জমেছিল তার মধ্যে শশীই সব চেয়ে মাসীর আদরের—মাসী তাকে ছেলেবেলা থেকে মানুষ করেছে। তার দেহে যৌবনের কমনীয়তা হয়ত ছিল না কিন্তু বাঁধুনী ছিল, উগ্রতাও ছিল। তার রোজগার বেশী ছিল বলে সে বাড়ির সমস্ত বাসিন্দার হিংসার ঈর্ষার ও মাসীর স্নেহের পাত্রী। একটা সোনার চিরুনি হাতে ঘরের ভেতর ঢুকে সে ন্যাকামি-ভরা আদুরে নাকীসুরে বললে, 'ও—মাসী, তুই এখানে কোঁদল কচ্ছিস আর আমি তোকে খুঁজে খুঁজে সারা। তুই চিরুনিটা ভালো করে গুঁজে দিবিনে ত—বেশ আমার খোপা খুলে যাক!'

শশী আবার ঠোঁট উল্‌টে মুখ ঘুরিয়ে দরজার কাছে ফিরে গেল।

মাসী তখনও ভালো করে দম ফিরে পায়নি, হাঁপাতে হাঁপাতে ক্রোধ-কর্কশ গলাটাকে যথাসাধ্য মোলায়েম করে বললে, 'আয় না লো দিই, রাগ করিস কেন?'

মাসীর পাওনা সত্যি সত্যি বাকী থাকলেও অন্যদিন হ'লে বেগুন, মাসীর লাঞ্ছনার প্রতিশোধ দিতে কিছুতেই পেছ্‌পা হ'ত না। কিন্তু আজ সে চুপ করেই রইল। বুকের পুরোন ব্যথাটা আজ আবার বেড়ে উঠেছিল। প্রত্যুত্তর দেবার লোভ সামলান শক্ত হ'লেও চেঁচামেচির পরিণাম শরীরের পক্ষে কখনো ভালো হবে না, হয়ত তার ফলে এই দুঃসময়ে ক'দিন অকর্মণ্য হয়ে শয্যাগত থাকতে হবে জেনে সে অতিকষ্টে সংযত হয়ে রইল।

শশীর পায়ে জুতো লক্ষ্য করে মাসী বললে, 'ও আবার কি ঢঙ লা, মেমসাহেব হলি নাকি!'

শশী আগেকার মতনই কচি খুকির গলা নকল করবার চেষ্টায় নাকীসুরে উত্তর দিলে, 'বা! আজ যে এক্‌জিবিশনে যাচ্ছি, জানিস্ না বুঝি?'

'সে আবার কি ?'

'ওমা, একজিবিশন্ লো একজিবিশন্ ; সায়েবদের মেলা, জানিস না ?'

'তা আমায় নে' যাবি নে ?'

শশী মুখ বেঁকিয়ে বললে, 'হ্যাঁ, তুই যে ধুমসি, তোকে আবার নে যাবে! নড়তে পারিস না, থপ্ থপ্ করে চলিস, তোকে নে' গে' মুস্কিলে পড়ি আর কি ?'

এ কথা শশী ছাড়া প্রায় আর কারুর মুখ থেকে বেরুলে মাসী সহ্য করত না কিন্তু শশীর এখন রাজপাট ; সুতরাং অতিকষ্টে কথাটা হজম করে মাসী বললে, 'বেশ আমি না হয় ধুমসি, তুই না হয় রূপসী, তা বলে তোর মাসী ত, তুই পারিস বলেই সাধছি নইলে আর কাউকে কি বলতে গেছি ?'

মনস্তত্ত্বে মাসীর অশিক্ষিত পটুত্ব ছিল। রূপসী বলায় ও ক্ষমতার উল্লেখে খুশি হয়ে শশী বললে, 'আচ্ছা, চ' দেখি, বাবু গাড়ি আনতে গেছে।'

ঝগড়া হঠাৎ থেমে যাওয়ায় দরজায় ভিড় হাল্কা হয়ে গিয়েছিল। বেঙন ইতিমধ্যে নীরবে টীনের ভাঙা পেটরা থেকে কাপড়-চোপড় বার করায় মন দিয়েছে।

'সায়েবদের মেলায়' যাবার আশায় আপাততঃ রাগটা কিছু ভুলে, মাসী শশীকে নিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় বলে গেল, 'খোরাকি আর ভাড়া না পেলে বাছা, বলে যাচ্ছি, কাল থেকে আমার বাড়িতে আর তোমার জায়গা হবে না।'

'আচ্ছা, আজই ভাড়া দেব।' বলে বেঙন দরজাটা সশব্দে ভেজিয়ে দিলে। তারপর তাড়াতাড়ি সাজপোশাক করতে মন দিলে। আজকের এই একজিবিশনই তার একমাত্র আশা। সত্যই দু'মাস তার ঘরে কেউ আসে নি, দু'মাস ধরে মাসীর কাছে ধারে খাচ্ছে। প্রদীপের তেলটুকুও আজ ক্যাস্তর অনুপস্থিতিতে তার ঘর থেকে না বলে নিয়ে এসেছে। মাসী যে পয়সা না পেলে এতদিনের বাসিন্দা বলে একটুও খাতির রাখবে না একথা সে ভালো রকমই জানে। আজ কোনো রকমে শিকার হাতড়ান চাই-ই। তাই মান্ধাতার আমলের সিল্কের শাড়ীটা এতক্ষণ ধরে সে সেলাই করেছে। আজ একজিবিশনে গেলে, রাত্রের মতো খাওয়া বন্ধ জানলেও এখন জলখাবারের জন্যে অপব্যয় করবার তার একটা পয়সাও নেই। তার শেষ পয়সা ক'টি টিকিট কেনবার জন্যে রাখতেই হবে। প্রদীপের স্তিমিত আলোয় সামনে সে চুলটা বাঁধতে গেল।

ডানদিকে কপালের ওপরেই চুল অত্যন্ত পাতলা হয়ে টাক পড়বার মতো

হয়েছে, সেখানটা যথাসাধ্য অন্যদিকের চুল টেনে ঢেকে সে খোঁপা বাঁধলে। একটি মাত্র ভালো সেমিজ ছিল তা ধোপা বহুদিন থেকে পয়সা না পেয়ে আর ফেরৎ দিয়ে যায় না—সুতরাং পুরোন আধ-ময়লা সেমিজটা দিয়েই কাজ চালাতে হবে। পাউডারের কৌটো বহুদিন খালি। কেরোসিনের ডিবের আলোয় খড়ির গুঁড়ো ধরা পড়ে না কিন্তু একজিবিশনের উজ্জ্বল আলোতে খড়ির গুঁড়ো মেখে যেতে তার সাহস হ'ল না। দুই চোখের কোণের কালিভরা কোটর, লুকোবার কোনো উপায় নেই। তাদের ব্যবসায়ে ভালো সাজপোশাকের মূল্য যে কত, তা সে বেশ জানে, বিশেষতঃ এই যৌবনের পারে এসে মানুষের চোখে ধাঁধা লাগাতে হ'লে সাজপোশাকের অন্তরালে আসন্ন-বার্ধক্যের কুশ্রীতা গোপন না করলে যে চলতেই পারে না। কিন্তু বেশভূষা দূরের কথা, কিছুদিন ধরে দু'বেলার উপযুক্ত যৎকিঞ্চিৎ অন্নসংস্থান করাও তার পক্ষে বিশেষ কঠিন হয়ে উঠেছে। যে তাগা-জোড়া বিক্রী করবার পরামর্শ দিতে এসে মাসী এইমাত্র ঝগড়া করে গেছে, সেই তাগা-জোড়াটা বার করে নিয়ে সে পরলে। কেন সে তাগা বিক্রী করতে চায় না, তা যদি মাসী জানত! তার শেষ সোনার অলঙ্কার যে বহুদিন আগে অভাবের তাড়নায় বিক্রী হয়ে গেছে, একথা জানিয়ে, ঐ তাগা-জোড়া এবং সমস্ত গহনাই যে গিল্টি এই সংবাদ দিয়ে, সে আর বাড়ির সবার কাছে ছোট হ'তে চায় না।

শেষকালে কিন্তু শশীর কথা মনে করে সে তাগা-জোড়া খুলে রাখলে। বহুদিন আগে তার এক শৌখীন সাহেবি-ঘেঁষা প্রণয়ী জুটেছিল। সে তাকে জুতো পরিয়ে বিবি সাজিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াত। তারি দেওয়া এক জোড়া হিল্‌-তোলা জুতো বহুদিন পেটরার এক কোণে অব্যবহৃত হয়ে পড়ে ছিল। আজ সেটিকে বার ক'রে, ভালো করে পরিষ্কার করে অনেক দিন বাদে পায়ে দিলে। জুতোর সঙ্গে তাগা মানাবে না ভেবে, সে তাগা-জোড়া খুলে রেখেছিল।

সাজগোজ সমাপ্ত করে যখন সে পথে বেরুল তখন বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। অনেকখানি পথ হেঁটে যেতে হবে। অনেকদিন বাদে জুতো পায়ে দিয়ে চলতে একটু অসুবিধা হচ্ছিল কিন্তু একেবারে অনভ্যাস না বলে তার চলন নিতান্ত অস্বাভাবিক দেখাচ্ছিল না।

চৌরঙ্গীর চৌমাথা পার হবার সময়, দুজন লোক প্রায় সঙ্গে একটা [illegible]

হুব্বিত করে হেসে উঠল। তার আকর্ষণী শক্তি একেবারে লোপ পায় নি মনে করে বেগুন একটু খুশিই হ'ল।

টিকিট-বিক্রেতা মনস্তত্ত্ববিদ্ নয়; তাদের সে অবসরও নেই, নইলে সেদিন দক্ষিণ তোরণের টিকিট-ঘরের কাউণ্টারে টিকিট নেবার সময় একটি শিরওঠা কঠিন সৌষ্ঠবহীন হাতের কাঁপুনিতে তারা অনেক কিছু দেখতে পেত। এটি বেগুনের শেষ আধুলি।

আলোকের উন্মত্ত উৎসব! অসংখ্য উৎসবমত্ত মানুষের কোলাহলের সঙ্গে দূরের ব্যাণ্ডের অপরিস্ফুট সুরধারার মাধুর্য ও সমস্ত আনন্দ-সমারোহের ওপর অতল গভীর আকাশের স্নিগ্ধ নক্ষত্র-খচিত রহস্যাবরণ,—সমস্তই বেগুনের কুটিল পথক্লান্ত জীবনের,—নিত্য অবহেলার মর্‌চেপড়া মনের কাছে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে গেল।

মেহেদি গাছের বেড়া দেওয়া বাঁদিকের অপেক্ষাকৃত নির্জন পথটা দিয়ে সে এগিয়ে চলল। দুর্বল শরীরে এতখানি হেঁটে এসে অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করছিল। বুকের ভেতর পুরোন বেদনাটা তাকে পরিহাস করবার জন্যই যেন মাঝে মাঝে চিড়িক দিয়ে উঠছিল। কিছুদূর গিয়েই অল্প অন্ধকারে একটা খালি বেঞ্চি দেখে কিছু জিরিয়ে নেবার জন্যে সে বসে পড়ল। এ পথটা দিয়ে লোকজনের যাতায়াত অপেক্ষাকৃত কম। সামনেই একটা বৈদ্যুতিক বাতির পোস্ট, কিন্তু তাতে আলো ছিল না। বেগুন কতকটা নিজের অজ্ঞাতে ও কতকটা সজ্ঞানে আসন্ন সংগ্রামের জন্যে যেন শক্তি সংগ্রহ করছিল। কিছুক্ষণ অবসন্নভাবে বসে থাকবার পর হঠাৎ পাশে চোখ পড়াতে সে বিস্মিত ও আনন্দিত হয়ে উঠল। তার অলক্ষ্যে কে একজন বেঞ্চির অন্য পাশে এসে বসেছে! অন্ধকারে তার মুখ ও বেশভূষা ভালো করে দেখা না গেলেও, সে যে পুরুষ এবং বলিষ্ঠ পুরুষ তা বুঝতে বিশেষ কষ্ট হয় না। বেগুন সজাগ ও উদ্‌গ্রীব হয়ে ভালো ক'রে বসল। ডান পায়ের জুতো মাটিতে ঠুকে বারকয়েক শব্দ করলে এবং মাথার কাপড় ফেলে হঠাৎ খোঁপার কি ত্রুটি শোধরাতে বিশেষ করে মন দিলে।

সামনের বাতিটা কোনো কারণে নিশ্চয় খারাপ হয়েছিল। একজন মিস্ত্রী সেটা জ্বালাবার চেষ্টা করছিল। হঠাৎ বাতিটা পলকের জন্যে জ্বলেই নিভে গেল। ঐ পলকটিতে লোকটাকে দেখে নেবার সুযোগ কিন্তু বেগুনের হয়নি। যাই হোক লোকটা তাকে দেখতে পেয়েছিল নিশ্চয়ই। অন্ততঃ সেও এবার তার দিকে একটু

পাশ ফিরে একটা পায়ের ওপরে পা তুলে দিয়ে বসল। মাথায় খোঁপার কাঁটুনির জন্য ওঠবার সময় বেগুন বেশ একটু জোরেই হাতটা নামালে। হাতের গিণ্টির চুড়িগুলি বেজে উঠল—রিনঠিন্ রিনিঠিন্।

অন্ধকার হ'লেও বোঝা গেল লোকটা তার দিকেই চেয়ে আছে; কিন্তু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকেও তার দিক থেকে অগ্রসর হবার কোনো লক্ষণ পাওয়া গেল না। বেগুন একটু অধীর হয়ে উঠল! তবে কি লোকটা এখনো বোঝেনি, না কোনো গোবেচারী গোছের চাষাভূষো হবে?

আলোটা জ্বলে না কেন? কিন্তু এই বেশভূষা নিয়ে আলোর চেয়ে অন্ধকারই যে তার পক্ষে সুবিধার একথা সে জানত। কিরকম লোক না জেনে আরো অগ্রসর হওয়া উচিত হবে কিনা ভাবছিল, এমন সময় লোকটা একবার কাশলে। বেগুনও একবার কাশলে। লোকটা আবার কাশলে!

বেগুনের বুকটা আশায় দুলে উঠল! এ যে জোর করে নকল কাশবার চেষ্টা, তা বোঝা আর কঠিন নয়। আঁচল থেকে ধীরে চাবিটা খুলে বেগুন পায়ের কাছে ফেলে দিলে। তারপর খানিক খোঁজবার ভান করে লোকটার দিকে ফিরে বললে, 'আপনার কাছে দেশলাই আছে? আমার চাবিটা একটু খুঁজে দেখব—'

লোকটা চমকে উঠল। সত্যি সে কণ্ঠস্বর চমকাবার মত। এই কণ্ঠস্বরটিতে এখনও কৈশোরের অপরূপ কোমলতা ও যৌবনের অসীম মাধুর্য ও স্নিগ্ধ মাদকতা অটুট হয়ে ছিল। আর সে স্বরে ছিল—নিপিলের সুষমাময় নারীত্বের প্রচ্ছন্ন বিস্ময়ের আভাষ!

এই পতিতার জীর্ণ জীবনের অন্তরালে এই সদ্য-ফুট শেফালির মতো সৌরভ-ভরা কণ্ঠস্বর কেমন করে থাকতে পারে এইটেই আশ্চর্য! লোকটা চমকে উঠেছিল কারণ সে এতটা আশা করেনি।

নীরবে পকেট থেকে একটা দেশলাই বার করে বেগুনের প্রসারিত হাতে সে গুঁজে দিল।

বেগুন নীচু হয়ে দেশলাই জ্বেলে চাবি খোঁজবার ছল করবার মধ্যেই টের পেলে লোকটা আর একটু সরে এসে বসেছে।

সামনে ইলেক্‌ট্রিক বাতিটা আর একবার জ্বলে উঠল কিন্তু বেগুন মুখ তুলে লোকটাকে দেখবার আগেই আবার নিভে গেল! বেগুন মনে মনে বাতির ও বাতিওয়ালার সপ্তম পুরুষ উদ্ধার ক'রে আবার আর একটা দেশলাই জ্বাললে।

বাতিটা যেন ইচ্ছে করেই তার সঙ্গে তামাসা করছিল। এবার আর চাবি খুঁজে পেতে দেরী হ'ল না। দেশলাইটা ফিরিয়ে দেবার ছলে বেগুন লোকটার হাতে একটা আঙুল দিয়ে ধীরে ধীরে আঘাত করলে, তারপর আর একটু থেমে বসল। বললে, 'ভাগ্যিস্ আপনি ছিলেন, নইলে এই অন্ধকারে চাবি খোঁজা কি সোজা!—'

লোকটা কোনো উত্তর দিলে না, শুধু অন্ধকারে একটা হাত বেগুনের কোমরে এসে ঠেকল! বেগুন সে হাতটা বাঁ হাতের মুঠোয় খপ করে ধরে ফেলে একটু চাপ দিলে। অন্ধকারের মধ্যে স্পর্শ করে বেগুন অনুভব করছিল, হাতটা অত্যন্ত লোমশ ও তার চামড়া অত্যন্ত কর্কশ—লোকটা দেখতে খুব সুশ্রী বোধ হয় হবে না—তা না হোক্।

বারকয়েক মিট্ মিট্ করে সামনে বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলে উঠল।

ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় আতঙ্কে লোমশ হাতটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বেগুন লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। লোকটার উপরের ঠোঁট একেবারে নেই—মাড়ি থেকে লম্বা অপরিষ্কার দাঁতের পাতি, ভয়ঙ্কর ক্ষত থেকে বেরিয়ে এসে সমস্ত মুখটাকে বীভৎস করে তুলেছে, আর বাঁ দিকের সমস্ত গাল কবে যেন আগুনে ঝল্‌সে পুড়ে বিবর্ণ মাংসপিণ্ড হয়ে গেছে!

লোকটা বেগুনের এই আতঙ্কে একটুও হতভম্ব হয়নি এমন নয়, কিন্তু সে যেমন বসে ছিল তেমনি বসে রইল। বেগুন তার দিকে আর না চেয়ে এগিয়ে চলল। অনেক সময় ও অনেক কলাকৌশল তার বৃথা নষ্ট হয়েছে সত্য কিন্তু তা বলে ঐ দুঃস্বপ্নের সঙ্গে সে ফূর্তি করতে পারে না। এর চেয়ে ভালো শিকার সে নিশ্চয় যোগাড় করতে পারবে।

অনেক দিন বাদে জুতো পায়ে দিয়ে অতখানি হেঁটে পায়ে ফোস্কা পড়েছিল। একটানা চলার সময় তার বেদনা বিশেষ কিছু অনুভব না করলেও অনেকক্ষণ ফিরোবার পর এখন হাঁটা একটু কষ্টকর হয়ে দাঁড়াল। এখন জুতো খুলে ফেলাও অসম্ভব, খুঁড়িয়ে হাঁটলেও হাস্যাস্পদ হ'তে হয় সুতরাং যন্ত্রণা গোপন করে সে যথাসাধ্য স্বাভাবিক ভাবে হাঁটবার চেষ্টা করছিল। তাকে হাঁটতেই হবে যে। কিছু দূরে গিয়ে একবার পেছন ফিরে তাকাল। লোকটা তখনও তার দিকে চেয়ে সেই বেঞ্চিতেই বসে ছিল।

নির্মম জুতোর নিঃশব্দ পীড়ন সহ্য করা বিশেষ কঠিন হয়ে উঠলেও সে অনেকক্ষণ নানাদিকে ঘুরে বেড়াল। মেলার মজা ও আমোদ লক্ষ্য করবার মতো

মনের অবস্থা ওর ছিল না। চারিদিকে ক্ষুধিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে শিকার অনুসন্ধান করাতেই সে একেবারে তন্ময় হয়ে ছিল। যত সময় যাচ্ছিল তার আগ্রহ ও অস্থিরতা তত বেড়ে উঠছিল। এ পর্যন্ত কোনো সুবিধা সে করতে পারেনি। কয়েকজন নিঃসঙ্গ পুরুষের আশেপাশে ঘুরে বেড়িয়ে ও কয়েকজনকে দৃষ্টির ইঙ্গিতে আকর্ষণ করবার চেষ্টা করে কোনো ফল হয়নি।

শাখায় শাখায় লালবাতি-দেওয়া ঝাঁকড়া একটা গাছের তলায় বেশী ভিড় জমে ছিল। সেটা জুয়ার আস্তানা। লোহার আলের ওপর ঘুরে ঘুরে একটা ছ'কোণা কাঠখণ্ড খেলোয়াড়দের ভাগ্য নিরূপণ করছিল। বেগুন যখন গিয়ে সেখানে দাঁড়াল তখন ভাগবাঁটরা হচ্ছে—একতরফা খেলা শেষ হয়ে গেছে।

একটি বামনাকার স্থূলকায় লোক স্মিতবদনে একতাড়া নোট পকেটে রাখছিলেন। খুশিতে তার দু'ভাঁজ চিবুক তিন ভাঁজ হয়ে উঠেছে। বেগুন ঠেলেঠুলে তাঁর পাশে জায়গা করে নিলে। তার ঠিক বিপরীত দিকে একটি ফিরিঙ্গি মেয়ে একটি ফিরিঙ্গি যুবকের কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে কি বলছিল। তাদের কথাবার্তা না বুঝলেও হাব-ভাবে বেগুন বুঝতে পারলে ছেলেটি সম্প্রতি অনেক লোকসান দিয়ে আর খেলতে না চাইলেও মেয়েটি তাকে ছাড়তে দিতে চায় না।

ইতিমধ্যে মোটা ভদ্রলোক পাঁচ নম্বরে একটা দশ টাকার নোট ধরেছেন। আবার কাঠখণ্ড ঘুরলো! তারপর চারিদিক থেকে কোলাহল উঠল, 'চার নম্বর মার দিয়া!'

মোটা ভদ্রলোকটি রাগে টেবিল চাপড়ে আর একটা দশ টাকার নোট বার করলেন। ওদিকে ফিরিঙ্গি ছেলেটির সাথে মেয়েটির কলহ সুরু হয়েছে। ছেলেটা [illegible] ও মেয়েটি আর একটি ফিরিঙ্গি যুবকের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। খানিক কলহ করে ছেলেটি খুব রাগ করে চলে গেল। বেগুন মোটা লোকটির আরো কাছ ঘেঁষে একবার জুতো দিয়ে তার পাটা মাড়িয়ে দিলে! তৎক্ষণাৎ আবার ক্ষমা চেয়ে সে বলতে লাগল, 'মাপ করবেন, দেখতে পাইনি।' কিন্তু লোকটির কোনো দিকে খেয়াল নেই, তিনি তার জুতোর চাপ টেরই বোধ হয় পান নি!

আবার খেলা সুরু হল। এবারে নম্বর উঠল 'দুই'। মোটা লোকটির টাকা [illegible] ফিরে।

পেছন থেকে একটা ধাক্কা এল। বেগুন সামলাতে না পেরে ভদ্রলোককে জড়িয়ে ধরলে।

'এইও পাজী বদ্‌মাস!' ভদ্রলোক এক ঝট্‌কায় তার হাত দুটো ছাড়িয়ে তাকে অন্য পাশে ছিটকে দিলেন। বেগুন এবার সত্য সত্যই ক্ষতি করে পেছনে লম্বা-চওড়া এক শিখের গায়ে ভর দিয়ে টাল সামলাল।

'আরে হিঁয়ে ত মর্ যাওগে' বলে শিখ তাকে ভিড় থেকে ঠেলে বার করে দিলে। সে অন্যদিকে ঘুরে দাঁড়াল। কিন্তু ভেতরে ঢুকতে আর তার সাহস হচ্ছিল না। ভিড়ের বাইরে সে এর পর কি করা যায় ভেবে পেল না।

যে সব পথে সারি সারি আলোকোজ্জ্বল সুসজ্জিত দোকানের সামনে দিয়ে অসংখ্য লোকজন যাতায়াত করছিল, সেখানে তার যাবার উপায় নেই। তার সাজসজ্জার অসংখ্য ত্রুটি, তার অতৃপ্ত যৌবনের কুশ্রীতা সেখানে আলোকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে যাবে। নিশাচর শ্বাপদের মতো তার অন্ধকারের সঙ্গেই আত্মীয়তা। একটি বয়স্ক সুবেশ বলিষ্ঠকায় ভদ্রলোক পাশ দিয়ে যাবার সময় তার দিকে একবার চেয়ে গেলেন। খানিক দূর গিয়ে আর একবার ফিরে চাইলেন, তারপর ডানদিকের ঝিলের উপরকার ছোট সাঁকো পার হয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

বেগুন সন্দিগ্ধ মনে তাঁর পিছু নিলে। সাঁকো পার হয়ে একটা ছবির ঘরে গিয়ে বেগুন আবার তাঁকে দেখতে পেলে। ভদ্রলোক ব্যস্ত ভাবে যেন কি খুঁজছিলেন। সে বিপরীত দিক দিয়ে ঘুরে গিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে একটা ছবির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিলে। ভদ্রলোক বোধ হয় তাকে লক্ষ্য করেন নি। হঠাৎ বেগুন তাঁর দিকে ফিরে বললে, 'আচ্ছা, তের বছরের মেয়ে এমন ছবি আঁকতে পারে?'

ভদ্রলোক বোধ হয় শোনেন নি, কোনো উত্তর দিলেন না। বাম পাশ থেকে কে মিহি গলায় বললে, 'হাঁ, তের বছরের মেয়ে আবার অমনি আঁকতে পারে! ও অমনি বাড়িয়ে লিখেছে।'

পেছনে শশী, তার জিরাফ-গর্দন কাঠঠোকরা-মুখো বাবুও তাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিল। বেগুন আশ্চর্য হয়ে ফিরে তাকাল। শশী একবার তার বেশের দিকে চেয়ে নাক সিঁটকে মুখ ফেরালে। শশী একটু হাসলে। কিন্তু তখন শশীর সাজসজ্জা সৌভাগ্য-গর্বিত যৌবনের সঙ্গে নিজের তুলনা করে

উৎসাহিত হবার সময় তার ছিল না। ভদ্রলোক বেরিয়ে গেলেন; বেগুন তাঁর পিছু নিলে। মাসী পেছন থেকে বলছে শুনতে পেলে, 'ওই রূপের আর দেমাক দেখে বাঁচি না!—'

ভদ্রলোক বেশ জোরে হাঁটছিলেন। হয়ত এ অনুসরণে কোনো লাভ হবে না ভেবেও এবং পায়ের যন্ত্রণা সত্ত্বেও বেগুন যথাসাধ্য জোরে হাঁটতে সুরু করলে। প্রকাণ্ড একটা নাগরদোলার সামনে গিয়ে তিনি বসলেন। বেগুন এবার মরিয়া হয়ে তাঁর কাছে গিয়ে হাতটা খপ ক'রে ধরে ফেলে বললে, 'আসুন না, ঐ চেয়ারটা খালি আছে।'

ভদ্রলোক বিস্মিত হয়ে বিমূঢ় দৃষ্টিতে তার দিকে ফিরে চাইলেন। ভদ্রলোক শুনতে পাননি ভেবে বেগুন কম্পিত বুকে, হাতে একটু টান দিয়ে বিবর্ণ-মুখে হাসি ফোটাবার চেষ্টা করে আবার বললে, 'আসুন না, ওই দোলাটায় একবার চড়ে আসি।' কিন্তু তৎক্ষণাৎ সভয়ে তাঁর হাত ছেড়ে দিল। ভদ্রলোকের মুখে চোখে অসীম বিতৃষ্ণা ও ক্রোধ ফুটে উঠেছিল। এমন দুঃসাহস অবশ্যই তিনি আশা করেন নি। ক্রোধকটুকণ্ঠে তিনি বললেন, 'তোমার এই বেয়াদবির জন্যে তোমায় পুলিশে ধরিয়ে দিতে পারি জান?—নচ্ছার পাজী মেয়েমানুষ কোথাকার!—'

বহুদিনের পুরাতন বেদনাটা আবার বুকের পাঁজরায় পেরেক ঠুকছিল। ভদ্রলোক বলছিলেন, 'তোমার এতবড় আস্পর্ধা—'

হঠাৎ পাশ থেকে একটি ছেলে ডাকলে, 'বাবা! ওমা, এই যে বাবা।' আধা ঘোমটা দেওয়া একটি স্ত্রীলোক কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বেগুন ভদ্রলোকের ক্ষণিকের অন্যমনস্কতার সুযোগে সেখান থেকে সরে গেল। খানিক দূর গিয়ে একটা চেয়ারে সে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ল। মাথাটা ঘুরছিল, চোখেও যেন একটু ঝাপসা দেখছিল—এখন যদি একটু মদ পেত!

কিন্তু ক্রমশঃ সময় যাচ্ছে। আজ যাহোক কিছু রোজগার করা চাই-ই। এখন মনে হচ্ছিল, সেই প্রথম শিকার অবহেলা করা হয়ত উচিত হয়নি, কিন্তু সে যে ভাবতেও গা শিউরে ওঠে! কিছুক্ষণ পরে এক জড়ভরতকে কাঁধে ভর করিয়ে এনে একটি মেয়ে তার সামনের চেয়ারে বসিয়ে দিলে। মেয়েটি যে তারই সমশ্রেণীর এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু এই অষ্টাবক্র মূর্তিমান জরাকে কোথা থেকে সে পাকড়াও করলে!

বুড়োকে চেয়ারে বসিয়ে মেয়েটা বললে, 'খবরদার, এখান থেকে নড়িস নি বুড়ো, তাহ'লে তোর হাড়মাস একজায়গায় রাখব না!' বুড়ো সুরা-জড়িত কণ্ঠে অস্পষ্টভাবে কি বললে বোঝা গেল না। মেয়েটা বললে, 'দে টাকা, এক বোতল আনি।' তারপর বুড়োর পকেটে হাত দিলে। কিন্তু এ বিষয়ে বুড়ো এখনও খুব সজাগ; সে আর্তকণ্ঠে বিকৃত স্বরে চিৎকার করে বললে, 'ঐ নিলে, সব চুরি করে নিলে!' মেয়েটা বিরক্ত হয়ে পকেট থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে বললে, 'নে তবে হতচ্ছাড়া, তুই নিজেই দে।' বুড়ো পকেট থেকে একটা নোট কম্পিত হাতে বার করে দিলে; মেয়েটা চলে গেল।

বেগুন নীরবে সমস্ত লক্ষ্য করছিল। বুড়োর যেমন রূপ তেমনি বেশ। তার দেহের গঠন দেখলে মনে হয়, মাত্র সম্প্রতি সে চতুষ্পদে চলা ত্যাগ করেছে। তার কুৎসিত মুখের লোল-মাংসে ও প্রতি রেখায় সারাজীবনের পৈশাচিক ইতিবৃত্ত লেখা। বেশ তার অদ্ভুত। শীর্ণ দেহে একটা ময়লা চাপকান এবং সে চাপকানের ওপর আবার এক দুর্গন্ধ নোংরা চাদর। গলায় কম্ফর্টার জড়ান, পাকাটির মতো সরু ও ধনুকের মতো বাঁকা পায়ে লাল মোজা ও ক্যাম্বিশের ছেঁড়া জুতো। ঐ ধ্বংসাবশেষের মাঝে মৃত্যুর ভ্রূকুটির তলেও কদর্য কামনার বীভৎস উৎসবের লীলা আজও থামে নি। বেগুনের নিঃসাড় মনেও ঘৃণা ও বেদনা জাগছিল।

কিন্তু বৃদ্ধের পকেট টাকায় ভরা। ঐ মেয়েটার বদলে যদি সে নিজে আজ একে শিকার করতে পারত, কিছুদিনের দুর্ভাবনা অন্ততঃ ঘুচত। একবার ইচ্ছে হ'ল যে, মেয়েটার অনুপস্থিতিতে বুড়োকে ভুলিয়ে অন্য কোথাও নিয়ে যায়। কিন্তু সাহস হ'ল না। মেয়েটা যদি আর না আসে, তাহ'লে হয়ত ভালো হয়, কিন্তু সে সম্ভাবনা খুব কম। মেয়েটার কিন্তু অনেক দেরি হচ্ছিল।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত মেয়েটিকে আর ফিরতে না দেখে বেগুন অবশেষে আর নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকতে পারলে না। বৃদ্ধ বোধ হয় ঝিমোচ্ছিল। ধীরে ধীরে তার কাছে গিয়ে বসল। পকেট থেকে মনিব্যাগটা উঁকি মারছিল। একবার ইচ্ছে হ'ল এই অবসরে মনিব্যাগটা নিয়ে সরে পড়ে; কোনো হাঙ্গামা নেই, কেউ দেখতেও পাবে না। কিন্তু সে সাহস হ'ল না, বুড়ো সে সুযোগ দিলেও না, হঠাৎ চোখ চেয়ে বললে, 'কে, রূপো এলি? দে, বোতল দে।'

বেগুন বললে, 'আমি রূপো নই—'

'আচ্ছা তুই সোনা, রে, এখন বোতল দে।'

সে হাত বাড়ালে।

'বাঃ, আমি বোতল কি জানি!'

বুড়ো এবার চটে বললে, 'আমার সঙ্গে ইয়ার্কি হচ্ছে? দে বলছি বোতল।'

বেগুন বুড়োকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, 'মর বুড়ো, আমি কি তোর রূপো, তোর রূপো চম্পট দিয়েছে।'

বুড়ো এবার সচেতন হয়ে উঠল। বেগুনের দিকে চেয়ে বললে, 'কোথায় গেল রূপো? তুই কে!' তারপর দুর্বল পায়ে উঠবার চেষ্টা করলে। বেগুন তাকে নিরস্ত করতে গেল। বুড়ো চিৎকার করে বললে, 'না না, আমার রূপোকে খুঁজব, ছাড় তুই মাগী।' কিন্তু বুড়োর ওঠবার ক্ষমতা ছিল না, বেঞ্চিতে আবার টলে পড়ল। বেগুন বৃদ্ধের গলা বাহু দিয়ে বেষ্টন করে বললে, 'রূপো থাকুগে, আমি তোকে বোতল দেব, চ আমার সঙ্গে।'

'না না, আমার রূপোকে চাই!' বৃদ্ধ বেগুনের বাহুর বেষ্টন থেকে মুক্ত হবার দুর্বল চেষ্টা করতে লাগল। বৃদ্ধের বুকে মাথাটা রেখে ফুঁপিয়ে কান্নার অভিনয় করে এবার বেগুন বললে, 'কে তোর রূপো? তোকে ফেলে সে পালিয়ে গেল, আর আমি তোকে সাধছি তবু আমায় পায়ে ঠেলছিস!' অভিনয়ে চির-অভ্যস্ত এই পতিতার পঙ্কিল হৃদয়ও সে জঘন্য অভিনয়ে বিতৃষ্ণায় ভরে উঠেছিল—কিন্তু উপায় নেই।......

বুড়োকে রাজী করিয়ে অনেক কষ্টে তাকে গেটের কাছাকাছি এনে বেগুনের একটু আশা হ'ল। এই দুর্বল অসুস্থ শরীরে এই অথর্ব বৃদ্ধের ভার বয়ে আনা সহজ নয়। বেগুনের সমস্ত দেহ ভেঙে পড়তে চাইছিল কিন্তু গেটের কাছে পৌঁছোলেই কিছুদিনের মতো দুঃখের অবসান হবে ভেবে, আশায় সে প্রাণপণে এগিয়ে চলেছিল। হঠাৎ পেছন থেকে কে হাঁকলে, 'এই ও, খাড়া হো যাও—'

বেগুন তখনও এগিয়ে চলছিল। লালপাগড়ী-পরা পাহারাওয়ালা পেছন থেকে ছুটে এসে সামনে দাঁড়িয়ে কর্কশ কণ্ঠে বললে, 'এত্তা চিল্লাতা, শুনতে নেহি?'

সভয়ে বেগুন দাঁড়িয়ে পড়ল। বৃদ্ধের শিথিলপ্রায় দেহ তার কাঁধে ঝুলছিল।

'ইতো মাতোয়ালা বাড়, ডোণ্ড্রো ইস্‌কো—'

বৃদ্ধ অস্পষ্ট স্বরে বললে, 'হ্যাঁ বাবা, মাতাল বাড়।' বেগুন হতাশ হয়ে শেষ

চেষ্টা করে বললে, 'আমার স্বামী যে, পাহারাওয়ালা সাহেব!' দু'চারজন লোক মজা দেখতে জড় হয়েছিল, তারা হেসে উঠল।

'চুপ্, বদমাস মাগী, দিল্লাগি কর্‌তা—' পাহারাওয়ালা বৃদ্ধকে ধরে নিয়ে গেল। অনেকদিন বাদে বেগুনের চোখ সজল হয়ে উঠছিল বোধ হয়।

লোকের ভিড় অনেক কমে গেছল। রাত্রি অনেক হয়ে এসেছে। যে পথে প্রথম একজিবিশনের ভেতর গিয়েছিল সেই পথেই আবার বেগুন চলতে আরম্ভ করলে। এখন তার মনে হচ্ছিল প্রথম সুযোগ ত্যাগ করা তার ভয়ানক বোকামি হয়েছে।—ভাগ্যহীনার আবার স্বরূপ কুরূপ!

বেঞ্চিটা দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল। তার ওপর কে যেন শুয়ে আছে মনে হ'ল। ভাগ্যের এত পরিহাসের পর আর দুরাশা করবার তার সাহস ছিল না। কিন্তু নিজের সৌভাগ্য সে প্রথম বিশ্বাস করতেই পারল না। যাকে দেখে সে কিছু পূর্বে আতঙ্কে শিউরে উঠেছিল তার সেই বীভৎস মূর্তিই খানিক পরে তার এত আনন্দের কারণ হবে, এ কথাও সে কল্পনা করতে পারেনি। সেই মূর্তিমান দুঃস্বপ্নই বেঞ্চির উপর শুয়ে ঘুমোচ্ছিল। মনের অদ্ভুত বিতৃষ্ণা-ভরা আনন্দ দমন করে সে তাকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে বললে, 'রাত অনেক হয়ে গেছে—' এই জাগানোর অধিকার নিয়ে কোনো সন্দেহ কোনো সঙ্কোচ কোনো দ্বিধা তার মনে আর ছিল না।

লোকটা হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে তার দিকে বিমূঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। লোকটার গায়ে খাকী ছেঁড়া কোট, পরনে আধ-ময়লা কাপড় দেখে নিম্ন শ্রেণীর মিস্ত্রী-টিস্ত্রী হবে বলে মনে হয়। লোকটার হাত ধরে তুলে বেগুন কিন্তু অবিচলিতভাবে বললে, 'চলো, যাবে না?'

প্রথম ঘুমের ও বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে লোকটা দু'হাতে চোখ রগড়ে উঠে দাঁড়াল। মেলায় লোক আর ছিল না বললেই চলে। তারা দুজনে পাশাপাশি এগিয়ে চলল। ক্ষুধায় শ্রান্তিতে বেগুনের পা আর চলছিল না। খাবারের দোকানের সামনে এসে বেগুন তাকে থামিয়ে বললে, 'দাঁড়াও, কিছু খাবার আনি, কিছু রেস্ত বের করো দেখি।'

লোকটা ধীরে ধীরে একে একে তিনটে পকেটের ভেতরকার কাপড় উল্টে দেখালে।

কিছুক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে অবশেষে বেগুন তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলতে লাগল, '...পাৎ? ফাঁকি দিতে এসেছ হারামজাদা চোর !—'

লোকটা নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। তার অন্তরের কোনো ভাবই মুখের বিকৃত ভগ্ন আদলায় প্রতিফলিত হবার সম্ভাবনা ছিল না। বেগুন হতাশ হয়ে একবার তার পকেট ও পয়সা লুকোবার সমস্ত সম্ভব-স্থান নিজে হাতড়ে দেখলে। একটি দেশলাই ও গুটিকতক বিড়ি ছাড়া তার কোনো সম্বল ছিল না।

দাঁতে দাঁত চেপে অসীম অসহায় হতাশায় কপর্দকহীন সেই মূর্তিমান দুঃস্বপ্নের হাত ধরেই বেগুন বললে, 'চলো—'

এবার তাদের পথে কেউ বাধা দিলে না।

নিষ্কলঙ্ক

ধরণীধর গাঙ্গুলীর উচ্চহাসি বাইরের ঘর থেকেই শোনা গেল। অভ্যাগতদের বাড়ি দেখান শেষ করে তিনি নীচে নেমে আসছেন।

ধরণীধরের আজকাল এ রকম উচ্চহাসি প্রায়ই শোনা যায়। হাসবার অধিকারও তাঁর আছে। জীবনের এমন মধুর পরিপূর্ণ হেমন্তকাল আর ক'জনের ভাগ্যে আসে। না—ভাগ্য বলা চলে না বুঝি ধরণীধরের বেলায়।

একাগ্র সাধনা অনেকেই করে, জীবনে সফলও অবশ্য অনেকে হয়। কিন্তু তবু দৈবের কৃপা অনেকখানি থাকে তাতে, তার মধ্যে আত্মপ্রসাদের খুব বেশী অবকাশ বুঝি নেই। অনেকেরই সাফল্য শুধু বাইরের লোকের চোখে; আদর্শের নাগাল যে মেলেনি, একথা তার নিজের অগোচর থাকে না।

ধরণীধর কিন্তু লাখের মধ্যে এক ব্যতিক্রম। নিজের সৌভাগ্যের বিপুল আয়তন তিনি এই বাড়িটির মতোই নিজের সঙ্কল্প অনুযায়ী গড়ে তুলেছেন; প্রতি পদে নিজের আদর্শের সঙ্গে মাপ মিলিয়ে। প্রতি ধাপে নিজের সঙ্কল্পকে রূপ দিতে দিতে তিনি এগিয়ে এসেছেন। দৈব কোথাও এসে সমস্ত সাজানো ছক উল্টে দেয়নি, বা দিতে পারেনি। তাঁকে কোথাও রফা করতে হয়নি ভাগ্যের সাথে। যেমন করে কুমোর কাদার তালকে শাসন ক'রে নিজের নির্দিষ্ট রূপ দেয়, তেমনি করে ধরণীধর তাঁর সমস্ত জীবনকে নিজের উদ্দেশ্যের দিকে ফিরিয়েছেন, চালিয়েছেন। ওস্তাদ খেলোয়াড়ের মতো দাবার আগাগোড়া সব চাল তাঁর বাঁধা। ঘুঁটি কখনো এদিক ওদিক হতে পারেনি।

সহজে এতটা বিশ্বাস হয় না? কিন্তু ধরণীধরের জীবন গোড়া থেকে যারা অনুসরণ করে আসছে তাদের অনেকে এখনো সাক্ষ্য দিতে পারবে।

ছোট একটি গলির ভেতর ধরণীধরের সামান্য হ্যাণ্ড-মেশিনের প্রেস যারা দেখেছে তারা অনেকে এখনো বেঁচে। সস্তাদরের 'জবের' কাজ ছাড়া আর কিছু সেখানে হ'ত না। কিন্তু প্রেসটাই ছিল গলির ভেতর, তার মালিকের দৃষ্টি গলি ছাড়িয়ে অনেক দূরে ছিল নিবদ্ধ।

তখনই লোকে বলেছে, 'অত খেটো না ধরণী, তোমার এই শরীর। সইবে না—একটা শক্ত অসুখে পড়বে। প্রাণটা তো আগে।'

ধরণীধরের শরীর কোনকালে ভালো নয়। রোগা একহারাও তাকে বলা যায় না। যৌবনেই তাঁর চেহারা ছিল বুড়োর মতো শুকনো ও শীর্ণ। যৌবন বলতে আমরা যা বুঝি, তা কোনদিন তাঁর জীবনে এসেছিল কিনা সন্দেহ।

কিন্তু শুভানুধ্যায়ীদের কথায় ধরণীধর মনে মনে হেসেছেন। শরীর সম্বন্ধে কোনো দুর্ভাবনা তাঁর নেই। তিনি তখনই জানতেন খাটুনি তাঁর এই সবে সুরু।

সে প্রেসের পুরান ভাঙা অস্পষ্ট সাইনবোর্ডটা এখনও ধরণীধর গাঙ্গুলীর বিশাল টাইপ-ফাউণ্ড্রীর কারখানার কোনো কুঠুরীতে বোধ হয় পাওয়া যাবে। যে সাইনবোর্ডটি সযত্নে ধরণীধর যে রেখে দেননি আবার ফেলেও দেননি নির্মমভাবে, এতে হয়ত তাঁর চরিত্রের খানিকটা পরিচয় পাওয়া যাবে।

ধরণীধর সেই হাফ-বেঞ্চিনের যুগ থেকে ক্রমশঃ আরো পাকিয়ে আরো শুকিয়ে গিয়েছেন এবং তাঁর ব্যবসা দিন দিন ফেঁপে উঠেছে আশ্চর্যভাবে।

আশ্চর্য হয়েছে অবশ্য আর সকলে, ধরণীধর নিজে নয়। তিনি সমস্ত রাস্তার পথটা অনেক আগেই ছকে রেখেছেন। সমস্ত চাল তাঁর আগে থাকতে হিসেব করা।

একাগ্র তাঁর সাধনা, অক্লান্ত তাঁর অধ্যবসায়, অসীম তাঁর ধৈর্য; কিন্তু তবু জীবনে যাঁরা সিদ্ধিলাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে ধরণীধরের জীবন-কাহিনী লেখায় বোধ হয় কোনো উৎসাহ কেউ পাবে না। তার মধ্যে অনিশ্চিতের কোনো স্থান নাই, কোনো অবকাশ নেই কল্পনার। জ্যামিতির থিওরেমের মতো তা নির্ভুলভাবে নির্ধারিত।

কিন্তু ব্যবসার সাফল্যই ধরণীধরের একমাত্র সৌভাগ্য নয়। তাঁর জীবন অন্যদিক দিয়েও পরিপূর্ণ, সেকালের এই পড়ন্ত আলোয় যে রকম পরিপূর্ণতা লোকে কামনা করে! ধরণীধর সেই কথা বলতে বলতেই এখন নামছিলেন চওড়া মার্বেল দিয়ে বাঁধানো সিঁড়ি দিয়ে। সঙ্গে যাঁরা আছেন তাঁরা কেউ সমব্যবসায়ী, কেউ তাঁর বন্ধু পরিজন।

'আমি আর কতটুকু দেখতে পারি। আর শরীরে বয় না।'

ধরণীধর গাঙ্গুলী নিজমুখে তাঁর ক্লান্তি স্বীকার করছেন। সে স্বীকারোক্তিতে আবার আনন্দ।

অরোরা ট্রেডিংএর প্রশান্তবাবু একটু অবিশ্বাসের হাসি হাসেন, 'এখন না দেখেই চলছে বুঝি!'

'না না, অরুণই দেখে। তা না হ'লে কি আর পারতাম! শুনলে অবাক হবেন মশাই…'

প্রশান্তবাবুরা কিন্তু জানেন যে অবাক তাঁরা হবেন না, কারণ তাঁরা এ কথা ধরণীধরের মুখে অনেকবার শুনেছেন। ধরণীধরের এই দুর্বলতাটুকু তাঁরা জানেন। তাঁর ছেলে যে এই বয়সে ব্যবসায়-বুদ্ধিতে অসাধারণ পাকা হয়ে গেছে, তার দৃষ্টি যে তাঁর চেয়েও তীক্ষ্ণ, সে যে তাঁরই এখন ভুল শুধরে দেয়, এবং তিনি যে সমস্ত ব্যাপারে তার মতামতের ওপরেই নির্ভর করেন—একথা তাঁরা আজ পাঁচ বৎসর, তাঁর ছেলে ব্যবসায়ে যোগ দেওয়া অবধি শুনে আসছেন।

ধরণীধরবাবুর এইটুকু দুর্বলতা, এইটুকুই তাঁর পরম গর্ব। তাঁর বাইরের সমস্ত রুক্ষতার আড়ালে সরস এই একটি কোণ।

বিপুল এই যে ব্যবসায় তিনি গড়ে তুলেছেন তার সার্থকতা তিনি যেন ছেলেটির মধ্যে খুঁজে পান। আত্মপ্রসাদের কোনো অবকাশ তিনি জীবনে পাননি, সে উৎসাহও ছিল না। আজ আয়ুর সূর্য যখন পশ্চিমে হেলেছে তখন একটু নিজেকে প্রশ্রয় দিলে কিছু ক্ষতি নিশ্চয় নেই। আজ নিজের সাফল্য তিনি অরুণের মধ্যে উপভোগ করেন।

রাত্রে যখন সব কাজ শেষ হয়ে যায়, কারখানা নিস্তব্ধ, তাঁর ঘরটিতে ছাড়া আর সব ঘরের বাতি নিভে গেছে, তখন নিজের ঘরের চেয়ারে ঈষৎ হেলান দিয়ে অরুণের জন্য অপেক্ষা করতে কি ভালোই লাগে!

অরুণ নিজের অফিসের সমস্ত খাতাপত্র দেখা শেষ করে ওপরে আসে। চেহারায় বাপের সঙ্গে তার মিল নেই, মায়ের আদলই হয়তো পেয়েছে। তাকে একটু ক্লান্ত দেখায়, একটু অগোছালো।

অরুণকে সব সময়েই ক্লান্ত একটু দেখায়, ধরণীধর তা লক্ষ্য করেছেন, কিন্তু সেজন্যে খুব দুর্ভাবনা সত্যি তাঁর নেই। ক্লান্তিতে মানুষের ক্ষতি হয় না। ও ক্লান্তি একদিন সয়ে যাবে। তিনিও তখন ক্লান্ত ছিলেন। তাঁর শরীর ত আরো খারাপ। বলতে নেই, কিন্তু তাঁর ছেলে তার চেয়ে ঢের সবল। তাঁর ধাত সে পায় নি।

অরুণ এসে টেবিলের একধারে বসে। তারপর বাপ ও ছেলের আলাপ

চক্র,- নিছক ব্যবসায়ের কথা। কিন্তু জীবনে এর চেয়ে আনন্দ ধরণীধর কিছুতে জানেন নি। এই তাঁর পরম বিলাস। এই সময়টুকু তাঁর কাছে অমূল্য।

'দশ পয়েন্ট অ্যান্টিক নতুন ডিজাইন এখন আর করাব না।'

ধরণীধর বলেন, 'কেন! বদলান দরকার যে। সময়ও আর নেই।'

অরুণ বলে, 'ক'টা দিন দেখাই যাক্ না। বলভ কোম্পানীর নতুন সেট দু'দিন বাদেই বাজারে বেরুচ্ছে। সেটা দেখে করানই ভালো।'

ধরণীধরবাবু খুশি হয়ে একটু হাসেন। তিনি নিজেও তাই ভেবে রেখেছেন। কিন্তু ছেলের মুখ থেকে এই পরামর্শ টুকু নিতে তাঁর অপরূপ লাগে।

অরুণ বলে, 'বেঙ্গল প্রিণ্টার্সের অর্ডারটা কিন্তু চেপে রেখেছি।'

এবার হয়ত ধরণীধর সত্যিই অবাক্ হন, 'সে কি! আজই যে দু'বার আমাকে ফোন করেছে, অত্যন্ত জরুরী।'

'আগের দুটো বড় অর্ডারের এখনো পেমেন্ট বাকী।'

'তা থাক না, ওরকম ওদের থাকে। কখনো কিন্তু একটি পয়সার গোলমাল করেনি। তা ছাড়া অতবড় খদ্দের আমাদের ক'টা আছে?'

'কিন্তু পর পর দুটো কাগজে মার খেয়েছে, এখন সেদিন নেই।'

'তা নেই, কিন্তু আবার সেদিন ফিরতে কতক্ষণ? ওরা বনেদী ঘর। ওদের ভিৎ শক্ত।'

অরুণ গম্ভীরভাবে বলে, 'আজ খবর পেলাম ঘোষ ব্রাদার্সের ডায়রীর কন্ট্রাক্ট রাখতে পারেনি, সমস্তই গুনাগার। তা ছাড়া ভেতরে ভেতরে ম্যানেজমেন্টের কি সব গলদ নিয়ে ডিরেক্টরদের মধ্যে গণ্ডগোল। শনিবারের মিটিংটা না হওয়া পর্যন্ত চেপে রাখলাম।'

গর্ব, বিস্ময়, প্রশংসা, স্নেহে ধরণীধরের দু'চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।—'হ্যাঁ, শনিবার পর্যন্ত দেখা যেতে পারে।'

ধরণীধর তারপর জিজ্ঞাসা করেন, 'আজ কালিপদকে দেখিনি, কালও ত আসেনি। আবার অসুখ করল নাকি?'

অরুণ কঠিন মুখে বলে, 'না, পরশু থেকে আসছেন না। তাঁর জবাব হয়ে গেছে।'

এবার ধরণীধরের মুখেও ঠিক বেদনা না হ'লেও বিস্ময়ের রেখা বোঝা যায়। খানিকক্ষণ তিনি কোনো কথা বলতে পারেন না।

অরুণ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে।

ধরণীধর ধীরে ধীরে বলেন, 'কিন্তু…'

'পুরোনো লোক জানি, কিন্তু কতদিন এমন করে পোষা যায়। তাকে দিয়ে আর কোনো কাজ হয় না।'

ধরণীধর একটু সঙ্কুচিত ভাবেই বলেন, 'প্রকাণ্ড সংসার। একগাদা পুষ্যি, সব তার ওপর নির্ভর। অসুখে পড়েই এমন অকেজো অবস্থা হয়েছে।'

'ফাউণ্ড্রী ত আর হাসপাতাল নয়, অনাথ-আতুরের আশ্রমও না।'

ধরণীধরের এবার সামলাতে বুঝি একটু সময় যায়। অরুণ ঠিকই করেছে সন্দেহ নেই। এসব ব্যাপারে প্রয়োজনের খাতিরে নির্মম না হয়ে উপায় নেই। তিনিও চিরদিন তাই ছিলেন, নইলে এতদূর এগিয়ে আসতে পারতেন না। কিন্তু অরুণ যেন তাঁর চেয়েও বেশী কড়া। তিনি এতটা পারতেন না বোধ হয়। অনেক দিনের লোক। সেই হ্যাণ্ড-মেশিনের যুগ থেকে একসঙ্গে কাজ করে আসছে। তিনি নিজে হাতে গড়ে তুলেছেন। রোগে, শোকে, অভাবে এখন ভেঙে পড়েছে সত্য,—কোনো কাজে আর লাগে না, বরং পুরোনো লোক বলে একটু বেশী আশকারা নিয়ে সকলের উপর টিকটিক্ করে। তাদেরও সব সময়ে মান রাখে না। তাহ'লেও এ চাকরী গেলে একেবারে নিরুপায়…

যাক সে ভাবনা। অরুণ নিজের দায়িত্ব ভালোমতোই বোঝে। তার কাছে কোনো শৈথিল্যের কোথাও প্রশ্রয় নেই। এই ত দরকার। তাঁর দুর্বলতা আসছে কিন্তু অরুণ কঠিন অটল। ব্যবসার অন্যান্য কথা চলে আরো কিছুক্ষণ। তারপর ধরণীধর ওঠেন। গেটে গাড়ি প্রস্তুত।

অরুণ সঙ্গে সঙ্গে নীচে নেমে আসে। ধরণীধর মোটরে উঠে বলেন, 'আয়।'

'আমি একটু পরে যাচ্ছি, বাবা।'

ধরণীধর কিছু বলেন না আর; একটু হতাশ হন। ছেলের সঙ্গ তাঁর আরো একটু পেতে ইচ্ছে করে। একসঙ্গে দুজনে খেয়ে রাত্রে যে যার ঘরে না যাওয়া পর্যন্ত তাকে কাছে পেলে তিনি অনেক সুখী হন। অরুণের মা অনেকদিন আগেই গত হয়েছেন। বাপ ও ছেলে ছাড়া সংসারে আর কেউ নেই। ধরণীধরের একলা এইভাবে ফিরতে ভালো লাগে না। জীবন এতদিন শুধু কাজে ও চিন্তায় ঠাসা ছিল। তখন নিজেকে কোনদিন নিঃসঙ্গ মনে হয়নি। কোনদিন ফাঁকা ঠেকেনি।

আজকাল অরুণ, অনেক কেন, প্রায় সব দায়িত্ব নেওয়ায় চিন্তার ভিড় অনেকটা হাল্কা হয়ে গেছে। আজকাল তাই ফাঁকা ঠেকে একটু।

কিন্তু অরুণ কিছুদিন হ'ল একসঙ্গে আর বাড়ি ফেরে না। ধরণীধর কিছু জিজ্ঞাসা করেন না। তিনি হয়ত জানেন কিংবা জানেন না,—অরুণ কেন সঙ্গে আসতে চায় না। কিন্তু অরুণকে সে বিষয়ে কিছু বলতে তাঁর বাধে, আগে কোনদিন বলবার প্রয়োজন হয়নি। আজও তিনি বলবেন না।

ছেলের কথা বলতে বলতে অতিথিদের সঙ্গে প্রকাণ্ড ড্রয়িংরুমে ধরণীধর এসে উপস্থিত হন। বাড়ির অন্যান্য ঘরের মতো ড্রয়িংরুমের সাজসজ্জা উপকরণে শুধু ঐশ্বর্য নয়, রুচিরও পরিচয় আছে।

প্রশান্তবাবু ওরই মধ্যে সমঝদার। মনে মনে একটু ঈর্ষা করেন। একটু নাকও সিঁটকান। ধরণীধরবাবুর বাড়িতে আধুনিক ফার্নিচার, আধুনিক ডেকরেশান। ধরণীধরের সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরেই বল্লভ কোম্পানীকে ডুবিয়ে তাঁকে অরোয়া ট্রেডিং দাঁড় করাতে হয়েছে। মুখে তারিফ ক'রে বলেন, 'বাঃ চমৎকার, চমৎকার ম্যাচ্ করেছে।'

ধরণীধর পরিতৃপ্তির হাসি হেসে বলেন, 'সব অরুণের পছন্দমতো। ছেলেবেলা ওর বেশ ছবির হাত ছিল যে—চর্চা করলে ভালোই হ'ত। কিন্তু সময় কোথায়? আর লাভই বা কি! আমি তেমন উৎসাহ দিইনি। নিজেও ছেড়ে দিয়েছে।'

ধরণীধর অভ্যাগতদের আর একটু ধরে রাখতে চান। এক্ষুনি অরুণ আসবে। তার সঙ্গে দেখা করে না গেলে দুঃখিত হবে। কেন সে দেরী করছে কে জানে,—বিশেষ আজকের দিনে।

আজকের একটু বিশেষ দিন বইকি। এই বিশাল অপূর্ব প্রাসাদ তৈরী শেষ হয়েছে বলে নয়, আর একটি বিষয়ে মন তিনি ঠিক করে ফেলেছেন ব'লে। আজ তিনি অরুণকে বিস্মিত করতে চান। জীবনে তিনি কোনদিন যা করেননি আজ তাই করবেন, নিজের মতের পরিত্যাগ করবেন অরুণের জন্যে। এই তাঁর প্রথম ও শেষ পরাজয় স্বীকার। কিন্তু এ মধুর পরাজয়—অরুণকে সেই কথা আজ জানাবার দিন।

অরুণ কেন কিছুদিন ধরে অফিসের পর তাঁর সঙ্গে আসে না তিনি জানেন

বইকি! প্রাণে তিনি আঘাত পেয়েছেন। এটুকু তিনি আশা করেননি। অরুণের জীবনে এমন কিছু আসতে পারে তা ছিল তাঁর কল্পনার বাইরে। অরুণ সঙ্কোচে নিজেকে তাঁর কাছে গোপন করেছে;—তবু আশা ছিল বেশী দূর এ ব্যাপার গড়াবে না।

তিনি ছেলের সম্বন্ধে মনে মনে অন্য ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। ঐশ্বর্য তিনি প্রচুর সংগ্রহ করেছেন, কিন্তু আর কিছুর অভাব ছিল। অরুণকে সেই মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে যেতে চেয়েছেন। ধরণীধর গাঙ্গুলীর ধারা সম্মানিত হবে শুধু অর্থের জোরে নয়, সামাজিক মর্যাদার জোরেও—এই তাঁর সঙ্কল্প ছিল।

নয়ানগড়ের রায়েদের বাড়ির দিকেই তাঁর দৃষ্টি ছিল। তাদের পড়তির দিন। অর্থের ভাণ্ডার শূন্য হয়ে এসেছে। কিন্তু সমাজে এখনো তাদের মাথা সবার উঁচুতে। ছোট তরফের দেবকিশোর রায়কে মাঝে মাঝে ধরণীধরের অফিসঘরে দেখা যায়। লোকে কানাঘুষা করেছে,—ছোট তরফের টিকি পর্যন্ত নাকি বাঁধা ধরণীধরের কাছে। ধরণীধর কিন্তু স্বীকার করেন না। বলেন, 'বন্ধুত্বের খাতিরে আসে যায়। রায়েদের আবার কিসের অভাব।'

সে যাই হোক, নিজের ইচ্ছাটা দেবকিশোরের কাছে ইঙ্গিতে প্রকাশ করতে তিনি ভোলেন নি। অপর দিক থেকে উৎসাহ না থাক আপত্তিও দেখা যায়নি। সেই দিকেই কথাটা এতদিন এগোচ্ছিল এমন সময় অরুণের এই পরিবর্তন।

ধরণীধর প্রথমে অবশ্য বুঝতে পারেন নি। সুরেন তাঁরই দূর সম্পর্কের শালা। দুরবস্থায় পড়ে তাঁর কাছে এসেছিল চাকরীর খোঁজে। ধরাধরি করে একদিন অরুণকে নিয়ে গেছে বাড়িতে। ধরণীধরই সায় দিয়েছেন।

অরুণ রাত্রে বাড়িতে ফিরে বুঝি খেতে বসতে আর চায়নি। বলেছে, 'কিছুতেই ছাড়লে না, বাবা! খেয়ে আসতে হ'ল।'

তারপর হেসে বলেছে, 'অত বেশী যত্ন দেখালে আমি কিন্তু আড়ষ্ট হয়ে যাই। আর কিন্তু লৌকিকতার খাতিরেও যাচ্ছি না। মেয়েটি কিন্তু রাঁধে ভালো, আমাদের গোবর্ধনের মতো নয়!'

ধরণীধর বলেছেন, 'সুরেনের মেয়ে আছে নাকি? একটি ছেলেই ত জানতাম। তা হবে। সে কত কালের কথা।'

'একটি কেন। দুটি মেয়ে। বড়টি বেশ বড়ই হয়েছে।'

'সেই রাঁধলে বুঝি?' ধরণীধর নেহাত কথার কথা হিসাবে জিজ্ঞেস করেছেন।

'আর কে বাঁচবে! যা ও চিরকাল দেখে এলাম। রাঁধুনি রাখার অবস্থাও নয়।'

সেদিন আর কোনও কথা হয়নি। এ বিষয়ে আর কোনো কথা ভবিষ্যতে হতে পারে তাও ধরণীধরের মনে হয়নি।

তারপর অরুণ সেখানে মাঝে মাঝে যায় শুনে তিনি অবাক হয়েছেন। অবাক, যাওয়ার দরুন নয়, তাঁকে সে কথা জানাতে অরুণের সঙ্কোচ দেখে।

শেষের দিকে সমস্ত ব্যাপার বুঝে তিনি চিন্তিত হয়ে উঠেছেন আরো। তাঁর সঙ্কল্প কি এতদিন বাদে এমনভাবে ব্যর্থ হবে? মনে হয়েছে, সুরেনকে ডাকিয়ে একবার ধমক দিলে হয়। কিন্তু অরুণের কথা ভেবে নিরস্ত হয়েছেন। অরুণকে সোজাসুজি নিষেধ করা তাঁর নীতি নয়। ছেলেকে সেভাবে তিনি গড়ে তোলেন নি। ভিন্ন পথে গেলেও জানতে পেরে অরুণ হয়ত আঘাত পাবে। তাই ধরণীধর সময়ের হাতে ব্যাপারটা ছেড়ে দিয়েছেন। অপেক্ষা করার ধৈর্য তাঁর আছে।

কিন্তু একদিন হঠাৎ মনে হয়েছে—ধরণীধরের জীবনে সে এক আশ্চর্য দিন—কি দরকার বাধা দেবার? সর্বত্র তিনি নিজের সঙ্কল্পকে খাটিয়ে জয়ী হয়েছেন। অরুণের জীবনের বেলায় কিন্তু কেন বলা যায় না তাঁর দ্বিধা এসেছে একটিবার।

না, দরকার নেই সামাজিক মর্যাদায়। অরুণের জীবনে তাঁর সঙ্কল্প কোনো পথ রোধ করে যেন না দাঁড়ায়। অরুণ যদি এতেই সুখী হয় হোক্।

মেয়েটিকে ইতিমধ্যে তিনি একদিন দেখেছেন। ভালোই লেগেছে। মনে হয়েছে, অন্য ফ্রেমে খাটালে বে-মানান হবে না।

আজ অরুণকে সেই কথা জানিয়ে চিন্তিত করার দিন।

কিন্তু অরুণের দেখা নেই কেন? অভ্যাগতদের আর রাখা যায় না ধরে।, এক এক করে তারা বিদায় নেয়। ধরণীধর একলা বসে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেন। আজ তাঁর দেখা করা চাই।

অরুণ সত্যি অনেক রাত্রে ফিরল। ঘরের উজ্জ্বল আলোয় আজ তাকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে। ধরণীধরের এতদিন বাদে মনে হ'ল—এতটা না খাটলেও তার চলে, দিনকতক কোথাও তাকে পাঠিয়ে দিলে হয়। বিয়েটা হয়ে গেলেই সেই ব্যবস্থা করবেন। দিনকতক তাকে সম্পূর্ণ ছুটি দিতে হবে।

বললেন, 'তোমার বড় দেরী হ'ল। প্রশান্তবাবুদের আমি অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছিলাম।'

অরুণ ক্লান্তভাবে একটা সোফায় এসে বসল। একটু হেসে বললে, 'একটা নতুন খবর আছে বাবা, তোমায় এতদিন বলিনি।'

ধরণীধর একটু মনে মনে হাসলেন। এতদিনে অরুণের সঙ্কোচ তা'হলে কাটল!

মুখে ঔৎসুক্য দেখিয়ে বললেন, 'কি?'

'বেঙ্গল প্রিণ্টার্সের সমস্ত ভার নিলাম। বিশ বছরের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর-শিপ। এতদিন ধরে কথাবার্তা আয়োজন চলছিল। ভেতরে ভেতরে সব হিসেব করিয়েছি। লায়বিলিটি এমন কিছু বেশী নয়। আজ সব পাকা হয়ে গেল। মিটিংএ আজ অবশ্য অনেক বকাবকি করতে হয়েছে।'

ধরণীধর একটু বিমূঢ় ভাবেই অরুণের দিকে চেয়ে রইলেন। কথাগুলো যেন ভালো করে বুঝতে পারেননি। কি যে তাঁর মনে হচ্ছে তাও তিনি ঠিক ধরতে পারছেন না।

তবু বেঙ্গল প্রিণ্টার্স সম্বন্ধে আরো খানিকক্ষণ কথা চলল। ধরণীধরের এই প্রথম সে কথায় বিশেষ উৎসাহ নেই। এক সময়ে নিজের বক্তব্যটা সুযোগমতো পাড়লেন।

'ভাবছি, সুরেনকে আমাদের পুরোনো বাড়িটায় উঠে আসতে বলব।'

'সুরেন?—ওঃ! কিন্তু আমাদের বাড়িতে কেন?'

ধরণীধর একটু হাসলেন, 'নইলে কি ভালো দেখায়! কোন্ এঁদো গলির একটা ভাঙা বাড়িতে থাকে।'

অরুণের মুখ দেখে মনে হয় সে বুঝি সত্যিই অবাক হয়েছে,—'কিন্তু বরাবরই ত তাই আছে। ভালো বাড়িতে থাকবার অবস্থা ত নয়।'

না, অরুণ তাঁকে স্পষ্ট করে না বলিয়ে ছাড়বে না। এখনো সে ধরা দিতে রাজী নয়। ধরণীধর আবার হেসে বললেন, 'অবস্থা নয় বলেই ত আমাদের ব্যবস্থা করতে হবে। ও-বাড়ি থেকে কি কাজ হতে পারে!'

একটু থেমে অরুণের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'ওর বড় মেয়েটির সঙ্গেই তোর সম্বন্ধ ঠিক করেছি। মেয়েটি ভালো।'

অরুণের মুখ কি চকিতে একবার দীপ্ত হয়ে উঠল! কিন্তু সে দীপ্তি ক্ষণিক। অরুণ ক্লান্ত মুখে চুপ করে খানিকক্ষণ বসে রইল। তারপর ধীরে ধীরে দৃঢ়স্বরে বলে, 'সে তো হয় না, বাবা!'

'কেন, কেন?' ধরণীধরই বুঝি একটু উত্তেজিত।

'অনেকটা তফাৎ, বাবা। অবস্থার গরমিলটা তুচ্ছ করবার জিনিস নয়।' অরুণের স্বর কঠিন।

'ওসব কিছু নয়, আমি যখন মত দিচ্ছি…'

অরুণ উঠে পড়ল—'আমি ভেবে দেখেছি বাবা, সে ভালো হয় না।'

দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় অরুণ একবার ফিরে, হেসে বলে গেল, 'নয়নগড়ের দেবকিশোরবাবুর সঙ্গে আজ দেখা হ'ল। মিটিংএ উনিও ছিলেন। কথা শেষার বুঝি আছে—'

ধরণীধর খোলা দরজার দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে বসে রইলেন। তাঁর সত্যিকার খুশি হওয়া উচিত।

অত্যন্ত খুশি হওয়া উচিত নয় কি!

নিশাচর

দশ বৎসর আগে বাঙলার দুটি স্বামী-স্ত্রীর সাধারণ একটি দাম্পত্য কলহের যে নিদারুণ পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছিল, তাহার কথাই বলি।

বাড়িটি তেমন ভালো নয়—অত্যন্ত জীর্ণ। সংস্কার অভাবে তাহার চারিধারের দেওয়াল নানা জায়গাতেই ভাঙিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সে ভাঙা দেওয়ালের ফাঁক দিয়া সুদূর নীল পাহাড় আর শালের জঙ্গল যখন চোখে পড়ে, তখন তাহার জন্য কৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করিতে ইচ্ছা হয়।

ছোট খড়ের-ছাউনি-দেওয়া বাড়িটির সঙ্কীর্ণ বারান্দায় দাঁড়াইয়া কতদিন অমলা দূরের নীল পাহাড়-শ্রেণীর দিকে চাহিয়া আর চোখ ফিরাইতে পারে নাই। এমনটি আর সে কখনও দেখে নাই। বাঙলার সমতল আগাছা-আচ্ছন্ন পল্লীর সে মেয়ে। পৃথিবী যে এত বিশাল, এমন সুন্দর—এ ধারণাই তাহার ছিল না। কাজ করিতে করিতে দিনে অন্ততঃ একশতবার সে বারান্দায় খানিকক্ষণের জন্য দাঁড়াইয়া দূরের পাহাড়ের দিকে চাহিয়া থাকে। স্বামীকে অন্ততঃ একশতবার দিনে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সেই এক কথাই বলে, 'ভারী সুন্দর দেশ, না গা?'

বিভূতিভূষণের অত উৎসাহ নাই। সে শুধু সংক্ষেপে 'হুঁ' বলিয়া সায় দেয়। পৃথিবীর সৌন্দর্য দেখিয়া তারিফ করিবার তাহার সময় নাই। তাহাকে অনেক কিছু ভাবিতে হয়। এক মাসের ছুটি মঞ্জুর হইয়াছে, তাও আধা মাহিনায়। ছুটি ফুরাইলে আরেকটা দরখাস্ত করিতে হইবে, কিন্তু মনিবেরা আর গ্রাহ্য করিবে বলিয়া মনে হয় না। অথচ অমলা এক মাসে কি-ই বা এমন সারিবে। দিন কুড়ি হইয়া গেল, তবু নিয়মিত জ্বর ত এখনও আসিতেছে। এখানকার লোকেরা বলে অন্ততঃ তিন মাস না থাকিলে নাকি এখানকার জল ভালো করিয়া গায়েই বসে না। কিন্তু তিন মাস ছুটি যদি বা মিলে, এখানকার খরচ কুলাইবে কেমন করিয়া? সাহস করিয়া ভগবান ভরসা করিয়া সে রুগ্না স্ত্রীকে লইয়া চেঞ্জে আসিয়াছে, কিন্তু সাহসেরও একটা সীমা আছে। চেঞ্জের জায়গা হিসাবে বাড়িটির ভাড়া অত্যন্ত অল্পই বটে, কিন্তু সেই অল্পই যে তাহার কাছে দুর্বহ বোঝা।

অমলা ইতিমধ্যে আর একটা ঝি [illegible], সে [illegible] আর না।

অমলা একটু গলা চড়াইয়া বলে, 'হাঁ গো, কালা হয়েছ নাকি! অত কি ভাবছ বসে বসে?'

বিভূতি একটু অসহিষ্ণু হইয়া বলে, 'তোমার ও একঘেয়ে এ-সুন্দর তা-সুন্দর শুনতে আর ভালো লাগে না বাপু! সুন্দর দেখে ত আর পেট ভরবে না।'

অমলা উচ্ছ্বাসের মধ্যে বাধা পাইয়া লজ্জিত হইয়া ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণও হয়। স্বামীর ভাবনা যে কি তাহা সে জানে না, এমন নয়; কিন্তু স্বামী নিজেই তাহাকে বার বার সকল ভাবনা ত্যাগ করিতে বলিয়াছে। চেঞ্জে আসার কথায় খরচের কথা ভাবিয়া সে আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু স্বামী নানাভাবে বুঝাইয়া তাহার সে আপত্তি দূর করিয়াছে। সে সম্বন্ধে কোনো কথা পাড়িলে স্বামী বলিয়াছে, 'ভাবনা-টাবনা ছেড়ে তুমি শুধু তাড়াতাড়ি সেরে ওঠবার চেষ্টা করো দেখি।'

প্রথম প্রথম তাহাদের কি সুখেই কাটিয়াছে! নূতন দেশের সৌন্দর্য ও বিস্ময় দুচোখে শুধু দেখিয়া নয়, পরস্পরকে বলিয়া যেন তারা ফুরাইতে পারে নাই। কিন্তু গত কয়দিন হইতে স্বামীর ভাব যেন কেমন বদলাইতে সুরু করিয়াছে, অমলার মনে হয়, অবশ্য দোষ তাহারই। চেঞ্জে আসিয়াও তাড়াতাড়ি না সারিয়া ওঠা তাহার অন্যায়! না সারিলে এত টাকা খরচ বৃথাই হইবে।

তবু স্বামীর এই বিরক্তি সে আশা করে নাই। মুখখানি ম্লান করিয়া সে ঘরের ভিতর চলিয়া যায়। ভাবে, স্বামীর এ বিরক্তি নিশ্চয়ই ক্ষণিকের; এখনি সে অনুতপ্ত হইয়া হয়ত ক্ষমা চাহিতে আসিবে। না, রাগ করিয়া সে থাকিবে না; কিন্তু একটা মজা করিবে। শুধু সৌন্দর্য দেখিয়াই একদিন সে সব ভুলিত, পেট ভরাইবার জন্য ব্যস্ত হইত না, তাহাই স্মরণ করাইয়া দিবে।

কিন্তু অনেকক্ষণ কাটিয়া গেলেও বিভূতির আসিবার কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। অমলা রাগ করিবে না ভাবিয়াছিল বলিয়া বোধ হয় তাহার অভিমান হঠাৎ প্রচণ্ড হইয়া ওঠে। অকারণে স্বামীর সামনে দিয়া দু'চারবার যাতায়াত করিয়া সে ঘরে আসিয়া হঠাৎ খিল দেয়।

'দরজায় খিল দিলে কেন গো! কি হ'ল আবার?'

অমলা সাড়া দেয় না। বিভূতি দু'চারবার কড়া নাড়ে, খুলিবার জন্য অনুরোধ করে, তাহার পর নিজে হইতেই নিরস্ত হয়। মেয়েদের কোনো কাজের যুক্তি খোঁজার নিষ্ফলতা সে অনেকদিন আগেই উপলব্ধি করিয়াছে।

● মেঘের মিনার ●

খিল খুলিতে পেড়াপীড়ি করিলে বেশী দেরী হইবে একথা বুঝিয়া সে নীরবে খানিক বাদে নিজের কাজে চলিয়া যায়।

কিন্তু ঘণ্টাখানেক বাদেও ফিরিয়া আসিয়া দরজা বন্ধ দেখিয়া তাহার রাগ হয়। এতটা বাড়াবাড়ি কিসের জন্য! বিরক্ত হইয়া বলে, 'সন্ধ্যা হয়ে এল, বেড়াতে যেতে হবে না? খিল দিয়ে ঘরে বসে থাকলেই শরীর সারবে নাকি?'

এবার ভিতর হইতে অমলা উত্তর দেয়, 'বেড়াইতে সে যাইবে না, এ পোড়ার শরীর তাহার চিতায় পুড়িলেই একেবারে সারিবে।'

বিভূতির রাগ বাড়ে—কড়া নাড়িয়া উচ্চস্বরে বলে, 'ও সব ন্যাকামি রেখে তাড়াতাড়ি সাজ-পোশাক শেষ করে ফেলো দিকি! অন্ধকার ত হয়ে গেল, আর বেড়াবার সময় কই?'

অমলা তথাপি দরজা খোলে না। তাহার অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠ শোনা যায়, 'আমি হয়েছি তোমার আপদ-বালাই, মরলেই তোমার হাড় জুড়োয়। উঠতে-বসতে দাঁত খিঁচোবে যদি, তা'হলে ডেকে আসবার দরকার ছিল কি! কি হবে আমার শরীর সেরে?'

বিভূতির আর সহ্য হয় না। 'বেশ কাঁদো তাহ'লে ঘরের ভেতর বিনিয়ে বিনিয়ে। আমি একাই যাচ্ছি বেড়াতে।'—বলিয়া রাগে সে বাহির হইয়া যায়।

বেড়াইতে অবশ্য তাহার ভালো লাগে না। বাড়ির অদূরে একটা পাথরের উপর বসিয়া মেয়ে জাতটার এই অবুঝ অভিমানের কথাই সে ভাবে। এত রাগা-রাগি করিবার মতো কি কথা সে বলিয়াছে, আর যদি একটা রূঢ় কথা বাহির হইয়াই গিয়া থাকে, তাহার জন্য কি সন্ধ্যাটা মাটি করিতে হয় এমন করিয়া? আর ক'টা দিনই বা আছে। এখানের প্রত্যেকটি দিন যে তাহাকে কি মূল্যে কিনিতে হইয়াছে সে ভালো করিয়াই জানে। এই ক'টি দিনের উপর সে ভরসা করিয়া আছে। অমলার জ্বর সারান চাই-ই তাহার ভেতর। এই মূল্যবান দিনের একটি নষ্ট হইয়া গেল ভাবিয়া দুঃখের আর সীমা থাকে না। কে জানে কতটা উপকার এই দিনটিতেই হইতে পারিত! হয়ত কাল আর জ্বর আসিত না।

অন্ধকার হইতেই সে খিন্ন মনে বাড়ি ফিরিয়া আসে।

অমলা ঘর হইতে বাহির হইয়াছে। বেড়াইতে না যাক উনুন ধরাইয়া রান্না চড়াইতে সে ভোলে নাই। বিভূতির রাগ পড়িয়া তখন ক্ষোভ আসিয়াছে।

কাছে নিয়ে সে অত্যন্ত স্নেহের স্বরে বলে, 'মিছিমিছি রাগ করে আজ বেড়ানটা কেন নষ্ট করলে বলো দেখি! তুমি ভারী অবুঝ।'

অমলা কিন্তু কোঁস করিয়া তিক্তকণ্ঠে জবাব দেয়, 'যাও, আর সোহাগ জানাতে হবে না। নিজে বেড়িয়ে এসেছ ত তাহ'লেই হ'ল।'

বিভূতি আঘাত পাইয়াও হাসিয়া স্নিগ্ধস্বরে বলে, 'বাবারে, এখনও রাগ যায়নি তোমার! তোমার ভালোর জন্যেই বলছি, লক্ষ্মীটি, রাগ করে শরীরের ক্ষতি এমন করতে আছে!'

অমলা রাগিয়া বলে, 'আমার ভালো ত তুমি খুব চাও। চেঞ্জে আনতে টাকা খরচ হচ্ছে বলে বুক টন্‌টন্‌ করছে; উঠতে-বসতে মুখনাড়া দিচ্ছ তাই।'

অন্যদিন হইলে ইহার চেয়ে অনেক বেশীই হয়ত বিভূতি সহ্য করিত। হয়ত আর একবার মান ভাঙাইবার চেষ্টা করিলেই সব গোলমাল মিটিয়া যাইতে পারিত। কিন্তু আজ তাহার হঠাৎ আবার রাগ চড়িয়া যায়; উচ্চস্বরে বলে, 'তোমার জন্যে টাকা খরচ হচ্ছে বলে আমার বুক টন্‌টন্‌ করছে বটে?'

'করছেই ত।'

বিভূতি গলা চড়াইয়া বলে, 'করবে নাই বা কেন। টাকা রোজগার করতে মেহনৎ হয় না? অমনি আসে? চেঞ্জে এসে ঘরে খিল দিয়ে থাকবে ত টাকা খরচ করবার কি দরকার ছিল?'

'আমি তোমায় চেঞ্জে আনতে ত সাধিনি।'

বিভূতি সে কথায় কান না দিয়া খরগলায় বলিয়া যায়, 'বিয়ে হওয়া ইস্তক ত জালিয়ে-পুড়িয়ে মারলে! মরবে ত জানি, তা সোনামুখি আগে থাকতে মরলে ত আর আমার এত কষ্ট পোহাতে হয় না।'

অমলা সবেগে স্বামীর দিকে ফিরিয়া দাঁড়ায়, 'আমার জন্যে তোমার কষ্ট পোহাতে হচ্ছে?'

অন্ধকারে বিভূতি মুখ নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, উত্তর দেয় না।

স্বামীর দিকে চাহিয়া খানিক নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অমলা রুদ্ধকণ্ঠে বলে, 'বেশ, আজই তোমার সব কষ্ট ঘুচিয়ে দিচ্ছি।'

অন্ধকারে অমলা খোলা দরজা দিয়া হঠাৎ বাহির হইয়া যায়। বিভূতি ব্যাপারটা বুঝিতে কিন্তু বোধ হয় কি ভাবিয়া অবসাদে বিছানায় বসিয়া পড়ে।

• [illegible] •

অমলা ছেলেবেলা হইতে ভয়কাতর সে জানে। রাগ করিয়া বাহির হইয়া গেলেও বেশীক্ষণ সে থাকিতে পারিবে না। এখনি ফিরিবে।

কিন্তু একটু একটু করিয়া অনেকক্ষণ কাটিয়া যায়। তবু অমলা ফেরে না। বিভূতি এবার ভীত হইয়া ওঠে। দরজার কাছে আগাইয়া গিয়া বাহাকেও দেখিতে না পাইয়া মৃদুস্বরে ডাকে, 'অমলা!' কোনো সাড়া-শব্দ নাই। বিভূতি আরো জোরে স্ত্রীর নাম ধরিয়া ডাকে। তবু কোনো উত্তর মিলে না। এক অজানিত আশঙ্কায় তাহার বুক কাঁপিয়া ওঠে। ঘরে আসিয়া লণ্ঠনটা জ্বালিয়া লইয়া সে দ্রুতপদে অমলাকে খুঁজিতে বাহির হইয়া যায়।

নিস্তব্ধ অন্ধকার রাত্রি। তাহারই মাঝে সুদূর পথে থাকিয়া থাকিয়া বিভূতি-ভূষণের ব্যাকুল-কাতর আহ্বান শোনা যায়—'অমলা!'

• • •

ঘাটশীলার স্টেশনে বসিয়া গভীর এক অন্ধকার রাত্রে আমরা বিভূতি ও অমলার দাম্পত্য কলহের এই কাহিনীটি শুনিয়াছিলাম। কেমন করিয়া কি অবস্থায় শুনিয়াছিলাম, তাহার বিবরণ বড় অদ্ভুত।

ছিলাম চক্রধরপুরে। হঠাৎ রমেশের খেয়াল হইল অন্ধকার রাত্রে মোটরে করিয়া গেলুডিতে গিয়া বিভাসকে চমৎকৃত করিয়া দিতে হইবে। আগের দিন সকালবেলা বিভাসের বাড়ি হইতেই তিনজনে মোটরে করিয়া চক্রধরপুরে রওনা হইয়াছিলাম। হঠাৎ পরের দিন গভীর রাত্রে তাহার দরজায় গিয়া ডাক দিলে বিস্মিত হইবার কথা। শুধু বিভাসকে চমকাইয়া দিবার জন্ত এই রাত্রে এতখানি পথ যাইবার তেমন স্পৃহা আমার বা বীরেনের কাহারও ছিল না, কিন্তু রমেশের উৎসাহ দমাইয়া রাখা কঠিন। শেষ পর্যন্ত তাহার প্রস্তাবে রাজীই হইতে হইল। গোল বাধিল শুধু শোফারকে লইয়া। স্পষ্ট না বলিলেও ভাবে বোঝা গেল, এই অন্ধকার রাত্রে মোটর হাঁকাইয়া যাইতে তাহার বিশেষ আপত্তি আছে। সে সম্বন্ধে সবিশেষ প্রশ্ন করিয়া মনে হইল, ভয়টা তাহার পার্থিব কোনো প্রাণী বা দ্রব্যবিশেষের জন্ত নয়—তাহার ভয় ভৌতিক। এ পথে রাত্রে মোটর চালানো নাকি মোটেই নিরাপদ নয়।

কিন্তু তাহার কোনো আপত্তিই রমেশ টিঁকিতে দিল না। সন্ধ্যায় খানিক বাদেই রওনা হইয়া পড়িলাম। পরিষ্কার সোজা পথ। গাঢ় অন্ধকারের ভিতর দিয়া আমাদের প্রখর হেড-লাইট সে পথ ভেদ করিয়া চলিয়াছে—মনে হয় যেন

অন্ধকারের ভিতর হইতে আমাদের আলোয় পথ প্রতি মুহূর্তে আমরা সৃষ্টি করিয়া চলিতেছি। যে বেগে মোটর চলিতেছিল, তাহাতে পৌঁছিতে অতিরিক্ত দেরী হইবার কথা নয়।

রমেশ পা-টা সামনের সীটের উপর তুলিয়া দিয়া আরামে মাথা হেলান দিয়া বলিল, 'কি আরাম বলো দেখি! অন্ধকার রাত্রে মোটর চালাবার মতো মজা আছে? বিশেষতঃ এমনি পথে?'

বীরেন বলিল, 'কিন্তু কি ভয়ঙ্কর অন্ধকার বলো দেখি? মনে হয় যেন আমাদের হেড-লাইটকে সবলে ঠেলে এগুতে হচ্ছে।'

রমেশ কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু বলা হইল না। হঠাৎ সার্চ-লাইটটা নিবিয়া গেল; আর সেই মুহূর্তে মনে হইল—আমাদের চারিধারে অন্ধকার যেন ওৎ পাতিয়া বসিয়া ছিল, আলো নিবিতে-না-নিবিতে একেবারে সবেগে আসিয়া ঘিরিয়া ধরিল।

বীরেন বলিল, 'একি!'

শোফার গাড়ি থামাইয়া নামিয়া বলিল, 'কি জানি বুঝতে পারছি না!' তার কণ্ঠস্বরে সন্ধানের চেয়ে ভয় ও বিরক্তির পরিচয়ই বেশী পাইলাম।

দু'ধারে ঘন জঙ্গল, তাহার মাঝে সেই নির্জন পথে অন্ধকারে শুধু দেশলাইয়ের আলোক সম্বল করিয়া অনেকক্ষণ শোফার হেড-লাইট জ্বালিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া অবশেষে বলিল, 'না, এ জ্বলবে না।'

'তা হ'লে উপায়!'

শোফার বলিল, 'গাড়ির জন্য আলো জ্বলবে মনে হচ্ছে, কিন্তু তাতে পথ ভালো দেখা যাবে না।'

রমেশ বলিল, 'তাই চলো, এখান থেকে আর ফেরা যায় না।'

তাহাই হইল। মোটরের সে ম্লান আলোয় সে দুর্ভেদ্য অন্ধকার যতটুকু দূর করা যায় তাহাই করিয়া অগ্রসর হইতে সুরু করিলাম। আলোর জোর নাই, সুতরাং গাড়ির বেগ একটু কমাইয়া চলিতে হইল।

বীরেন বলিল, 'পথ চিনে ঠিক যেতে পারবে ত?'

প্রশ্নটা সকলের মনেই উঠিতেছিল। শোফার বলিল, 'তা কেমন করে বলি, বাবু! একবার মাত্র ত এপথে এসেছি, তাও দিনের বেলায়।'

তাহার গলায় বিরক্তির স্বর এবার স্পষ্ট। কিন্তু তখন তাহা লক্ষ্য করিবার

সময় নাই। ভীতভাবে বলিলাম, 'কিন্তু পথ ভুল হ'লে এই অজানা জায়গায় কি উপায় হবে বলো ত ?'

শোফার কথা বলিল না। মনে মনে রমেশের উপর রাগ হইতেছিল। গোয়াতুর্মি করিয়া অন্ধকার রাত্রে অজানা বিপদসঙ্কুল পথে এমন করিয়া তাহার জেদেই ত বাহির হইতে হইয়াছে।

বীরেন বলিল, 'ধরো, যদি ইঞ্জিনটাই কোনরকমে খারাপ হয়ে যায় !' এবং এই সম্ভাবনা ভালো করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিবার আগেই আবার বলিল, 'এসব বনে বাঘ আছে জান ত ?'

রমেশ আশ্বাস দিবার জন্য হাসিয়া বলিল, 'মোটর খারাপ হবে, এমন আজগুবি কথা ভাবছই বা কেন !' কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বরে মনে হইল, তাহার নিজের কথায় নিজেরই আস্থার একান্ত অভাব।

তাহার পর খানিক সবাই নীরবে চলিলাম। চারিদিকের নিস্তব্ধতা ও অন্ধকার আমাদের ছোট মোটরের শব্দ ও আলোয় আমরা ক্ষীণভাবে ভেদ করিয়া চলিয়াছি। পাশের গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ জঙ্গলের আবছা মূর্তি যেন এই উপদ্রবে প্রতি পদে ভ্রূকুটি করিতেছে মনে হইতেছিল। মোটরের সামান্য একটু বেয়াড়া শব্দেই বুক কাঁপিয়া উঠিতেছিল—এই বুঝি বন্ধ হইয়া যায় !

কিন্তু মোটর বন্ধ হওয়ার সমান বিপদই শেষ পর্যন্ত হইল। কত মাইল কতক্ষণ ধরিয়া তখন আসিয়াছি বলিতে পারি না। হঠাৎ একজায়গায় আসিয়া মোটর থামাইয়া শোফার বলিল, 'কিন্তু পথ যে সত্যি চিনতে পারছি না, বাবু ! ঠিক পথে এলে এতক্ষণ একজায়গায় রেল লাইন পার হবার কথা ব'লে মনে হচ্ছে।'

রমেশ বলিল, 'পার হয়ে আসনি, দেখেছ ঠিক !'

'দেখেছি বইকি !'

ইহার পর আর কি করা হইবে, কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না। এখান হইতে আগানো বা পিছানো সমান বিপদ। এই অন্ধকার রাত্রে গহন জঙ্গলের মাঝে এদিক-ওদিক ঘুরিয়া যদি মাঝপথে পেট্রোল ফুরাইয়া যায়, তাহা হইলেই সর্বনাশ। কি করা উচিত ভাবিতেছি, এমন সময় বীরেন বলিল, 'রোসো রোসো—একটা আলো দেখা যাচ্ছে না ? দেখো ত !'

সত্যি আলোই ত বটে ! অদূরে কে একজন লণ্ঠন হাতে করিয়া আমাদের দিকেই আসিতেছে মনে হইল। কাছে আসিতে দেখিলাম লোকটি আর যাহাই

হোক, প্রিয়দর্শন নয়। অন্ধকার রাতে তাহাকে হঠাৎ পথে দেখিলে আতকাইয়া উঠিবার কথা। শীর্ণ দীর্ঘ দেহ, তাহার ঝাঁকড়া চুল সেই শীর্ণ মুখের উপর কপাল [illegible] উঁচাইয়া আছে। হাড়-বাহির-করা মুখে সবচেয়ে অদ্ভুত তাহার কোটর-নিবিষ্ট চোখ দু'টি। হঠাৎ মনে হয় বুঝি উন্মাদ। কিন্তু তখন অত বিচারের সময় ছিল না। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এই রাস্তায় কি গেলুড়ি যাওয়া যায় জান?'

লোকটার ধরন-ধারণও অদ্ভুত। খানিক সে আমাদের কথায় কোনো উত্তরই দিল না। হয়ত শুনিতে পায় নাই ভাবিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছি, এমন সময় অত্যন্ত গম্ভীরগলায় বলিল, 'এই পথই বটে।'

লোকটার কথার ধরন দেখিয়া কিন্তু কেমন সন্দেহ হইল; বলিলাম, 'ঠিক জান ত!'

এতক্ষণ সে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাদের পর্যবেক্ষণ করিতেছিল, আমার কথায় হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, 'এইখানে বিশ বছর ধরে আছি আর গেলুড়ির পথ জানি না?'

যাক্, [illegible]। সোফার আবার গাড়ি ছাড়িয়া দিল। বলিলাম, 'যা হবার হয়ে গেছে, এখন চলো সামনে [illegible] পথ বেয়ে।'

বহুক্ষণ—প্রায় ঘণ্টা দুয়েক হইবে—এইভাবে চলিবার পর একজায়গায় আসিয়া কিন্তু বিষম ঠেকিয়া গেলাম। সামনে পথ দ্বিধাবিভক্ত হইয়া চলিয়া গিয়াছে। সোফার বলিল, 'কোনটায় যাব বুঝতে ত পারছি না!'

এবার সমস্যা সত্যই দারুণ। দুইটা পথই যে ঠিক নয় এটুকু বুঝিবার জন্য বেশী বুদ্ধির দরকার নাই। কিন্তু কোন্ পথে যাওয়া যায়? গাড়ি থামাইয়া আমরা সেই কথাই ভাবিতেছি, এমন সময়ে বীরেন বলিল, 'না, বিধাতা আমাদের সহায়। ঐ [illegible] আলো দেখা যাচ্ছে!'

[illegible] একটা ক্ষীণ আলো [illegible] দেখা যাইতেছিল বটে। বলিলাম, 'ঐ [illegible]—'

[illegible] লোকটা [illegible] সোফারই তাহাকে পথ জিজ্ঞাসা করিল। লোকটা বিড়বিড় করিয়া কি [illegible] শুনিতে পাইলাম না। কিন্তু সোফারকে [illegible] গাড়ি চালাইয়া দিতে দেখিয়া বুঝিলাম—সে এবার [illegible] বুঝিয়াছে।

হঠাৎ বীরেন বলিল, 'দাঁড়াও দাঁড়াও, গাড়ি একটু থামাও ত!'

ও [illegible] কিসের?

--তাহার উত্তেজিত ভাব দেখিয়া সভয়ে বলিলাম, 'কেন !'

বীরেন কম্পিত গলায় বলিল, 'লোকটাকে লক্ষ্য করেছ তোমরা !' এবং আমাদের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই বলিল, 'প্রথম যে লোকটা আমাদের পথ বলে দেয় একেবারে হুবহু সেই লোক !'

ঠিক অমনি একটা সন্দেহ আমারও হইতেছিল, কিন্তু ভয় ধরা পড়িবার লজ্জায় বলিতে পারি নাই। বীরেনের কথায় সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল—যথাসাধ্য সাহস সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিয়া বলিলাম, 'কিন্তু তাকে ত প্রায় বিশ মাইল দূরে ফেলে এসেছি।'

'সেই ত আশ্চর্য ব্যাপার ! এই জনমানবহীন জঙ্গলের পথে দু'-দু'বার মানুষের দেখা পাওয়াই অদ্ভুত ব্যাপার। তার ওপর বিশ মাইল পার হয়ে সেই একই লোক !'

শোফার হঠাৎ গীয়ার বদলাইয়া দ্বিগুণ বেগে গাড়ি ছাড়িয়া দিল। বলিলাম, 'ও কি করছ ?'

সে তিক্তকণ্ঠে বলিল, 'কি করব বাবু, আমার প্রাণের ভয় নেই ?'

বলিলাম, 'তুমিও দেখেছ নাকি !'

শোফার পিছন না ফিরিয়াই ভীতস্বরে বলিল, 'দেখেই না অত তাড়াতাড়ি গাড়ি ছেড়ে দিলাম !'

পরমুহূর্তে আমরা সকলে একসঙ্গে হৈ হৈ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলাম। শোফার প্রাণপণে ব্রেক কষিয়া গাড়ি রুখিতে গেল। গাড়ি থামিল না, স্টীয়ারিং হইল ঘুরিয়া একেবারে পাক খাইয়া পাশের গড়ানে খাদ দিয়া হড় হড় করিয়া নামিয়া চলিল। সামনের দিকে চাহিয়া সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তেও দেখিতে পাইলাম গভীর জল তারার আলোয় সাদাভ চিকচিক করিতেছে। বুঝিলাম, তাহার তলেই আমাদের সমাধি হইতে চলিয়াছে। ভয়ে চোখ বুজিলাম।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত রক্ষা পাইলাম। সামনে বুঝি উঁচু একটা তারের জাল ছিল, তাহাতে গাড়ি আটকাইয়া গেল। এ রকম অবস্থায় গাড়ি উল্টাইয়া যাইবার কথা, কিন্তু ভাগ্যক্রমে তাহা যায় নাই। চোখ খুলিয়া দেখিলাম, প্রবল ঝাঁকানি খাইয়াও অল্পের জন্যই সবাই রক্ষা পাইয়াছি।

প্রথম কথা কহিল বীরেন; আতঙ্কের স্বরে বলিল, 'লোকটার একেবারে কি চুকের তলায় দিয়ে গাড়ি গেছে, শোফার !'

[illegible]ের পায়ে আঘাত লাগিয়াছিল; খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে বাহির হইয়া বলিল, 'কে জানি বাবু, ব্রেক কষতে কষতেই গাড়ি ঘুরে গেছে। দেখবার সময় পাইনি।'

তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া বলিলাম, 'এখনই দেখতে হবে, চলো।'

সবাই মিলিয়া উপরে উঠিয়া আসিলাম। কিন্তু আশ্চর্য! তন্ন তন্ন করিয়া চারিদিক খুঁজিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। সামান্য কিছু নয়—একটা জোয়ান মানুষ, সবাই মিলিয়া স্পষ্ট তাহাকে গাড়ির ধাক্কা খাইয়া পড়িয়া যাইতে দেখিয়াছি। তাহার দেহ এই এক মিনিটের ভিতর কোথায় উধাও হইয়া যাইতে পারে! যেদিকে খাদ সেদিকেও সে পড়ে নাই। পড়িয়াছে একেবারে সম্পূর্ণ অন্য দিকে—সেখান হইতে মৃত বা জীবন্ত কাহারও এক মিনিটে অন্তর্ধান হওয়া একেবারেই সম্ভব নয়।

বীরেন বলিল, 'তাহ'লে কি?—'

তাহার কথা আর শেষ করিতে হইল না। একই নামহীন আতঙ্কে সবারই বুক কাঁপিতেছে। বলিলাম, 'ও মোটর আজ আর ওঠান যাবে না। চলো, সবাই মিলে এগিয়ে যাই।'

রমেশ বলিল, 'কিন্তু—কোথায়?'

বলিলাম, 'ওই দূরে ক'টা লাল আলো দেখা যাচ্ছে, বোধ হচ্ছে যেন স্টেশন একটা হবে।'

বীরেন বলিল, 'কিন্তু—আবার আলো!'

●

সেদিন অনেক হয়রানির পর অবশেষে স্টেশনে পৌঁছাইয়াছিলাম। পথ ভুল যে কতখানি হইয়াছে স্টেশনের নাম দেখিয়াই বোঝা গেল। সেলুতি আসিতে একেবারে ঘাটশীলায় আসিয়াছি। গভীর রাত্রে স্টেশনে তখন একা টেলিগ্রাফ-বাবুটিই জাগিয়া ছিলেন। লোকটি অত্যন্ত ভদ্র। আমাদের সাদর অভ্যর্থনা করিয়া আশ্রয় দিয়া বলিলেন, 'আজকের রাতটা এখানে থাকুন, কাল আপনাদের মোটর তোলবার ব্যবস্থা করিয়ে দেব।'

ঘুমাইবার ব্যবস্থা একপ্রকার তিনি করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু তখন আর ঘুমাইবার প্রবৃত্তি নাই। তাঁহাকে সমস্ত দুর্ঘটনার কাহিনীই বলিলাম।

ভদ্রলোক গম্ভীর হইয়া বলিলেন, 'আপনারা জানেন না তাই, নইলে এ অঞ্চলে

সাহেব-সুবোরাও রাত্রে ও-পথে মোটর নিয়ে যেতো না। আপনারা তবু প্রাণে বেঁচেছেন। পাঁচ-ছ'টা মোটর লোকজন সমেত এই রাত্রে আশ্চর্যভাবে চুরমার হয়ে গেছে।'

সভয়ে বলিলাম, 'কিন্তু কি ব্যাপার মশাই?'

'শুনি মোটরের উপরই তার যত আক্রোশ! সারারাত নাকি অমনি লণ্ঠন নিয়ে এই পথে ঘুরে বেড়ায়।'

ভীতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কে?'

সিগন্যালার মশাই ধীরে ধীরে বলিলেন, 'দশ বৎসর আগে এখানকার একটি লোক রাত্রে তার স্ত্রীকে খুঁজতে বেরিয়েছিল,—আর বাড়ি ফেরেনি!'

তারপর একটু থামিয়া বলিলেন, 'ওই পথে সে মোটর চাপা পড়ে মারা যায়। তবে শুনুন…'

পটভূমিকা

খুনে চৌকিদারের হাঁক আজকাল আর শোনা যায় না। সে এক রকম ছুটি পেয়েছে। গাঁয়ে ক'দিন ধরে একটা রাত-পাহারার দল তৈরী হয়েছে; সারারাত পালা করে তারা সমস্ত গাঁ টহল দিয়ে বেড়ায়। আর মাঝে মাঝে যা হাঁক ছাড়ে তাতে চোর-ডাকাতের চেয়ে গৃহস্থের রক্তই আগে শুকিয়ে যাবার কথা।

দলটি বেশ ভারী। ক'দিন আগে হারান বুড়োর গঙ্গাযাত্রার খাট বইবার জন্যে যেখানে চারটে জোয়ান ছেলে বোয়ানবাদি থেকে বীরগঞ্জ পর্যন্ত খুঁজে বার করতে হয়রান হতে হয়েছে, সেখানে ছেলের দল আজকাল পিলপিল করছে ঘরে ঘরে।

কলকাতায় বোমার ভয়েই বুঝি গাঁয়ের এমন বরাত খুলেছে হঠাৎ। ভিটেতে তিনপুরুষ যাদের সন্ধ্যা পড়েনি এতদিন, তাদেরও পোড়ো বাড়িতে হঠাৎ জনমজুর লেগে গেছে বাড়ি মেরামত করতে। হেঁজি-পেঁজি থেকে হোমরা-চোমরা, গাঁয়ে যার এতটুকু আস্তানা আছে কেউ আর আসতে বাকি নেই।

সামন্তদের ভুতুড়ে ভিটেটাতেও দেখা যায় রাত্রে আলো জ্বলে। সামনের জঙ্গল পরিষ্কার হয়ে দুটো নতুন ঘরের চালাও এরই মধ্যে তোলা হয়ে গেছে।

ছেলের দলের অনেকেরই গাঁয়ের সঙ্গে এই প্রথম সাক্ষাৎ। তবু কানাঘুষায় তারা ইতিমধ্যে অনেক কথা হয়ত শুনেছে। মজুমদার বাড়ির রবি একটু বেশী জোরেই সবার আগে হঠাৎ তাদের মার্কামারা পিলে-চমকান ডাক ছাড়ে, 'এ—হো! —হারা—রা—রা—রা—রা!'

সবাইকে সমস্বরে যোগ দিতে হয়। হাঁক শেষ হ'লে বিভূতি হেসে বলে, 'খাঁটি ভয় পেয়েছে—বুঝলি?'

'ভয়!—বাঃ, ভয় পাব আমি?'—রবি প্রতিবাদ জানায়। 'ভয়টা আমার কিসের শুনি! আমি ত তোদের মতো শহরে মজা নই যে কেঁচো দেখে কেউটে ভাবব। গাঁয়ের ছেলে গাঁয়ে আবার ভয় কিসের!'

বিভূতি হেসে বলে, 'গাঁয়ের ছেলে বলেই ত গাঁয়ে বেশী ভয়। শহরে ছেলে কেঁচো কেউটে কিছুই চেনে না, আর তোরা যে গাঁয়ের আনাচে কানাচে

আদাড়ে পাঁদাড়ে সব ভূত-পেরেত জুড়ু বসিয়ে রেখেছিস্! সাবন্তদের ঐ পোড়ো ভিটেটায় ত তোদের কোন্ শাকচুন্নীর বাস না?'

তর্কটা আরও কিছুদূর হয়ত চলত কিন্তু অমল হঠাৎ চাপাগলায় বলে, 'আলো নিয়ে কে বেরুচ্ছে যে বাড়ি থেকে!'

সকলেরই গলা বন্ধ হয়ে যায়। পোড়ো ভিটের ভেতর থেকে আলো হাতে সত্যিই কে বেরিয়ে আসছে।

রবি তাড়াতাড়ি বলে, 'চ ভাই, চ, এগিয়ে যাই।'

'কেন ভয় কিসের!—' বিভূতি শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে।

রবি ভয়ের অপবাদে একটু রেগে উঠেই বলে, 'আহা, ভয়ের জন্যে কি যেতে বলছি! কিন্তু রাতদুপুরে গোলমাল করে লাভ কি। বুড়ো শুনেছি বড় বেয়াড়া লোক।'

'আমরাও বেয়াড়া ছেলে। আর খেয়ে ত ফেলবে না!'—বিভূতি যেন গোঁ ধরে দাঁড়িয়ে থাকে।

রবি শুধু নয়, এ ব্যাপারে রুখে দাঁড়ানটা দেখা যায় অনেকেরই পছন্দ নয়। অমল বলে, 'না—না, দোষ ত আমাদের। রাতদুপুরে ডাকাত-পড়া চীৎকার ক'রে তা নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি করে লাভ কি! বুড়োর আবার মাথায় নাকি ছিট্ আছে।'

ভুবন যারুই এতক্ষণ বাবুদের কথায় মাথা গলায়নি। এবার সায় দিয়ে বলে, 'আজ্ঞে হাঁ বাবু, দুদিন চাল ছাইতে গিয়েই আমি টের পেয়েছি। যেমন বুড়ো তেমনি মেয়েটা—কি যেন একরকম, বাবু! আর সহজ মানুষ হ'লে কি ওই অজগর পুরীতে কেউ ডেরা বাঁধে? অপদেবতার ভয় না থাক সাপখোপের ভয়ও কি নেই!'

বিভূতির ভাব দেখে মনে হ'ল এসব কোনো কথাতেই তাকে বুঝি টলান যাবে না। কিন্তু ব্যাপারটা আপনা থেকেই আর এগোয় না। পোড়ো ভিটের আলোটা খানিক এগিয়েই এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকে। দূর থেকে সে অস্পষ্ট আলোয় বিশেষ কিছু দেখা যায় না। খানিক বাদে আলোটা আবার দেখা যায় ভেতরের দিকে সরে যাচ্ছে।

বিভূতি এবার একটা অবজ্ঞা-মেশান জয়ের হাসি হেসে বলে, 'বেয়াড়া লোক শুনে ভয় পাবার ছেলে বিভূতি ঘোষ নয়। এমন ঢের বেয়াড়া আমরা সিধে করেছি।'

সবাই আবার সামনের দিকে এগোয়। বিভূতির বাহাদুরিতে খুশি বোধ হয়

মনে মনে কেউ হাসি। বিভূতি যেন অত্যন্ত অন্যায় ভাবে সকলের উপর একটা টেক্কা দিয়ে ফেলেছে। তার সব বিষয়ে টেক্কা দেওয়ার ধরনটাই কারুর ভালো লাগে না।

গাজনতলা পার না হওয়া পর্যন্ত আর কারুর হাঁক দেওয়ার কথা মনে থাকে না। হাঁকটাও এবার কেমন যেন ঝাঁঝালো নয়। রাত প্রায় দুটো বাজে। প্রথম দলের পাহারার পালা এবার শেষ। ভদ্রেশ্বরীর মন্দির বাঁয়ে রেখে এবার সবাই চৌধুরী বাড়ির পথ ধরে। সেখানে চৌধুরীদের নাটমণ্ডপে শেষরাতের পাহারার দল অপেক্ষা করে আছে।

সবাইকার পা একটু জোরেই চলে এবার। অন্ধকার তিথির রাত-পাহারা তেমন যেন জমে না। শুধু অমল একটু পিছিয়ে পড়ে বুঝি ইচ্ছে করেই।

অমল সত্যিই দল-ছাড়া। রাত-পাহারার দলে সে নাম লিখিয়েছে কিন্তু আর সবাইকার মতো শুধু হুজুগে প'ড়ে বা চৌধুরীদের কথা ঠেলতে না পেরে নয়। চৌধুরী বাড়ি থেকে পাহারার দলের জন্যে রোজ সন্ধ্যায় যে চা জলখাবার আসে তার লোভও আর যার থাক তার অন্ততঃ নেই। রাত-পাহারায় সমস্ত নির্জন গ্রাম টহল দিয়ে বেড়াইতেই তার বড় ভালো লাগে।

গাজনতলা পার হয়ে ভদ্রেশ্বরী মন্দিরের কাছে এলেই তার মনটা কেমন যেন করে ওঠে। প্রথম রাত-পাহারার বেলাই তার এমন হয়েছিল, এতদিনেও কিন্তু সে অনুভূতিটা পুরোনো হ'ল না। এখনও সমস্ত দেহে কিরকম যেন একটা নেশা লাগতে থাকে,—একটা অদ্ভুত আনন্দ।

কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী বা নবমী। বাঁয়ে শীতলবাঁধের তালগাছগুলোর ফাঁকে আকাশে নিভু-নিভু আগুনের মতো একটা মরা লালচে রঙের ছোপ দেখা যাচ্ছে। খানিক বাদেই মাঝরাতের ক্ষয়ে-যাওয়া চাঁদ দেখা দেবে। এই মরা লালচে আলোর কেমন একটা থমথমে ভাব আছে, কেমন যেন আতঙ্কের আভাস। ভদ্রেশ্বরীর মন্দিরের সবটাই অন্ধকারে অস্পষ্ট, শুধু তে-কলা পেতলের চুড়োটা কি-একটা ভয়ের ইঙ্গিত নিয়ে যেন আকাশের দিকে উঁচিয়ে আছে।

ভদ্রেশ্বরী আজকাল অত্যন্ত ভদ্র শান্ত দেবী। চৌধুরীরা অনেককাল তাঁর সেবা করে আসছে। তারা চারপুরুষ ধরে বৈষ্ণব। ভদ্রেশ্বরীর তাই দশা-দুধচোর বেশী আর আজকাল কিছুতে লোভ নেই। কিন্তু একদিন ছিল যখন এ মন্দিরের চত্বর রক্তে ভেসে গেছে। নর-রক্তও নাকি বাদ যায়নি। কিন্তু সেও

বুঝি সেদিনের কথা। দেবীমূর্তিকে অন্ধকার গর্ভগৃহে দেখবার সৌভাগ্য এরমির অমলের ইতিমধ্যে হয়েছে। অমল খুব বেশী কিছু জানে না, কিন্তু মূর্তিটি যে চিরদিন এমন রক্তলোভাতুরা ছিলেন না এটুকু বুঝতে তার বেশী লাগেনি। তারা, না মৈত্রেয়ী, না শীলভদ্রা—বৌদ্ধযুগে কি তাঁর নাম ছিল কে জানে! সে নাম কোথায় হারিয়ে গিয়েছে। তারপর কবে কেমন করে পরিচয় ও প্রকৃতি দুই-ই তাঁর নূতন ভক্তের হাতে বদলে গেছে কেউ জানে না। সে কতকালের কথা অমল ভাবতেও পারে না। তবু গভীর শীতের রাত্রে এই নির্জন পথ দিয়ে যেতে তার শরীরে কেমন যেন একটা শিহরণ লাগে। সেই সুদূর অতীত তার সমস্ত বর্ণ-সমারোহ নিয়ে যেন এই অন্ধকারের তলাতেই জেগে আছে। একটু ঘষে নিলেই যেন ধুলো-পড়া কাঁচের মতো তার তলায় সে মূর্তি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

কি ছিল তখন এই গ্রামের রূপ। ভদ্রেশ্বরীর মন্দিরের পাশে ছায়াকরা এই প্রাচীন বটগাছ বুঝি শুধু সেদিনের সাক্ষী। শীতলবাঁধের পাশে ওই বিরাট মাটির ঢিবি হয়ত সেদিন ছিল আচার্য-শ্রমণ-ভিক্ষুদের কণ্ঠোচ্চারিত মন্ত্রে মুখর নির্জন অরণ্য-বেষ্টিত সঙ্ঘারাম। প্রাচীন যুগের কত চিহ্ন কত জন ত সেখানে কুড়িয়ে পেয়েছে। এই নির্জন সঙ্ঘারামে হয়ত কোনো এক এমনি গভীর শীতের রাত্রি উজ্জ্বল মশালের আলোয় বিকশিত হয়ে উঠেছে।···শোনা গেছে বহু পদাতিক, অশ্ব ও হস্তীর পদধ্বনি ও কোলাহল। বহুদূর থেকে কোনো প্রবলপ্রতাপ সদ্ধর্ম-অনুরাগী রাজা এই অরণ্য-বেষ্টিত সঙ্ঘারামের মহাস্থবির প্রধান আচার্যের অসামান্য বিভূতির কথা শুনেছেন। গভীর রাত্রে তিনি এসেছেন সদলে আচার্যের কাছে তাঁর গোপন অভিপ্রায়-সিদ্ধির সহায়তা প্রার্থনা করতে। কে জানে এই সঙ্ঘারামেও তখন সদ্ধর্ম বাভিচারে বিকৃত হয়ে উঠেছে কিনা! কে জানে এই প্রাচীন বট কত অমানুষিক অনুষ্ঠানের স্মৃতি তার গোপন মর্ম-কোষে সঞ্চিত করে রেখেছে! কিংবা হয়ত এ সঙ্ঘারাম সত্যই তখনো তথাগতের অমৃতবাণী বিস্মৃত হয়নি। সামান্য ঐহিক ইষ্ট সাধনের উদ্দেশ্যে এসে সৌম্য শান্ত করুণার্দ্রনয়ন মহাস্থবিরের কাছ থেকে রাজা হয়ত শাশ্বত জীবনের শ্রেষ্ঠ মন্ত্র নিয়ে ফিরে গেছেন। শান্ত নির্জন সঙ্ঘারামের চারিধার থেকে রাজ-সমারোহ শীতের কুয়াশার মতো মিলিয়ে গেছে···

আবার পড়েছে কালের যবনিকা। দীর্ঘকাল সে যবনিকা আর ওঠেনি। সঙ্ঘারাম তখনই বুঝি ওই মাটির ঢিবিতে পরিণত। এখানকার অরণ্যে শুধু হিংস্র শ্বাপদ ঘুরে বেড়ায়। তারপর একদিন ভদ্রেশ্বরীর কেমন করে প্রতিষ্ঠা হয়েছে সে

সম্বন্ধে অস্পষ্ট কিংবদন্তী ছাড়া আর কিছুই জানবার উপায় নেই। সে কিংবদন্তী অবশ্য সমস্ত কিংবদন্তীর মতোই সত্যে মিথ্যায়, আজগুবি কল্পনায় মেশান। কোনো দূর দেশের উগ্র উদ্ধত এক সৈনিক নিজের ভাইকে হত্যা করে রাজার কোপ থেকে পালিয়ে এই অরণ্যে বুঝি আশ্রয় নিয়েছিল। দীর্ঘ অবিরাম পর্যটনে ক্লান্ত ক্ষতবিক্ষত হয়ে ক্ষুধায় পিপাসায় সে তখন মুমূর্ষু। হঠাৎ সে দেখতে পায় পরমাসুন্দরী এক মেয়ে তার কাছে বসে তার মুখে অমৃতধারার মতো মধুর জল ঢেলে দিচ্ছে। এই অরণ্যে সেই মেয়েটির সেবায় পরিচর্যায় সে ক্রমে সুস্থ ও সবল হয়ে ওঠে। কিন্তু তারপরেই তার স্বরূপ প্রকাশ পায়। এই সেবার প্রতিদানে জোর করে সে মেয়েটিকে সঙ্গে ধরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। মেয়েটির কোনো অনুনয় মিনতি সে শুনতে চায় না। তখন মেয়েটি হঠাৎ অমানুষিক শক্তিতে তার হাত থেকে মুক্ত হয়ে বজ্রস্বরে জানায় যে,—ভাইয়ের রক্ত যে হাতে এখনও লেগে আছে সে-হাত তাকে স্পর্শ করবার যোগ্য নয়। ক্রোধে কামনায় অন্ধ হয়ে সৈনিক তারপরও তাকে ধরবার চেষ্টা করে। তখন মেয়েটি ওই প্রাচীন বটের তলায় এক পাথরের মূর্তিতে পরিণত হয়ে তাকে জানিয়ে যায় যে, ভ্রাতৃহত্যার পাতক রক্তে না ধুয়ে ফেলা পর্যন্ত তার মার্জনা নেই। সেই পাথরের মূর্তিই ভদ্রেশ্বরী দেবী, আর সেই সৈনিকই সামন্তদের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা রাঘব সামন্ত। রাঘব সামন্তই এদিকের সমস্ত অরণ্যভূমি জয় করে সেখানে বিস্তীর্ণ জনপদের পত্তন করে। দেবীর নির্দেশ সে নাকি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। ভদ্রেশ্বরী মন্দিরের পথ প্রতিদিন অসংখ্য বলির রক্তে পিচ্ছিল না করা পর্যন্ত তার তৃপ্তি হ'ত না। দেবীর অনুগ্রহেই বোধ হয় তার সৌভাগ্যসূর্য দেখতে দেখতে চরম শিখরে উঠেছে। সামন্তদের পরিধি তখন এই গ্রামটুকুর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না। রাঘব সামন্তর কাছে মাথা নীচু করেনি এমন কোনো লোক এ অঞ্চলে ছিল না।

রাঘব সামন্ত সম্বন্ধে আর কিছুই শোনা যায় না। কিন্তু সামন্তদের উত্থান ও পতনের ইতিহাস কিংবদন্তী-আকারে এখনো অনেকের মনে আছে। সামন্তদের প্রতাপ ও প্রতিপত্তি দিন দিন অবশ্য বেড়েই গেছে। নামে রাজা না হ'লেও তারাই ছিল এ অঞ্চলের একচ্ছত্র অধীশ্বর। সামন্তদের সৌভাগ্যের সঙ্গে ভদ্রেশ্বরীর মন্দিরেরও উন্নতি হয়েছে। সে মন্দির বিরাট ও নতুন করে যিনি তৈরী করিয়ে তাতে সোনার চূড়া দিয়েছিলেন বলে প্রবাদ, সেই উদয়রাম সামন্তর পর থেকেই কিন্তু সামন্তদের পতনের সূত্রপাত। লোকে বলে উদয়রামের একমাত্র ছেলে

নরহরি সামন্ত নাকি বংশের অযোগ্য, নেহাত্ত অকর্মণ্য ভালোমানুষ ছিলেন। না ছিল তাঁর মধ্যে সামন্তদের তেজ-বীর্য, না তাঁদের বিষয়বুদ্ধি। চৌধুরীরা তখন থেকেই সামনবেড়ে একটু একটু করে শিকড় চালাতে সুরু করেছে। নরহরি বিষয়কর্ম দেখেন না। দেখলেও বোঝেন কিনা সন্দেহ। সামন্তদের বিরাট প্রাসাদ তাঁর সময় থেকেই ধ্বংস হতে সুরু হয়েছে। প্রাসাদের সংস্কার করবার কোনো উৎসাহ নরহরির ছিল না। তিনি তারই পাশে ছোট একটা কোঠাঘর তৈরী করিয়ে নিয়ে তাতেই নিতান্ত সাধারণ ভাবে বাস করতেন। লোকে অনুযোগ করলে হেসে বলতেন, 'অত অগুনতি ঘর নিয়ে থাকলে বার হব কোথায়!'

নরহরির এসব পাগলামিতে হয়ত কিছু আসত যেত না। কিন্তু তাঁর এক সাংঘাতিক বাতিক ছিল। তিনি যত রাজ্যের বেদে ডাকিয়ে নানারকম বিষধর সাপের বিষ সংগ্রহ করতেন। কোথা থেকে তাঁর মাথায় এক অদ্ভুত খেয়াল ঢুকেছিল যে, এই সব সাপের বিষ থেকে এমন এক ওষুধ তিনি তৈরী করবেন, যা হবে মৃতসঞ্জীবনী। যাতে মরণ তাইতেই জীবন, এই ছিল তাঁর যুক্তি। সারা দিনরাত তাঁর বেদেদের সঙ্গে আর বিষ নিয়েই কেটে যেত। বিষ থেকে তিনি অমৃত ছেঁকে তুলবেন, পৃথিবীর সমস্ত আধিব্যাধি তাতে দূর হয়ে যাবে—এই ছিল তাঁর ক্ষ্যাপামি! তাঁর স্ত্রী একটি মাত্র সন্তান প্রসব করে মারা গেছলেন অনেক আগে। ছেলেটিকে তার মামারা এই পাগল বাপের প্রভাব থেকে বাঁচাবার জন্যে নিজেদের কাছে নিয়ে গিয়ে মানুষ করছিল। নরহরির বাতিকে বাধা দেবার সুতরাং আর কিছু ছিল না। সারাদিন তিনি নানা রকমের বিষ জ্বাল দিতেন, কত কি মেশাতেন আর কি যে পরীক্ষা করতেন কেউ জানে না। কিন্তু অমৃত আর তাঁর হাতে তৈরী হ'ল না। শুধু 'নরহরির বড়ি' বলে এ-অঞ্চলের একটা কথা এখনো তাঁর ব্যর্থ সাধনার প্রতি বিদ্রূপ বহন করে আসছে। সামন্তদের বিরাট জমিদারীতে অনেকদিন ধরেই গোলমাল চলছিল। তারপর কয়েক বছর উপরি-উপরি অজন্মা অনাবৃষ্টি হয়ে হঠাৎ দেখা দিল দারুণ দুর্ভিক্ষ। আগের বছর চাষীরা মাঠ থেকে শুধু ক'টা শুকনো খড় ঘরে তুলে এনেছে। পেটের জ্বালায় বেশীর ভাগ চাষী তাদের বীজধান খেয়ে শেষ করেছে। যারা উপোস করে একবেলা খেয়ে বীজধান কোনমতে বাঁচিয়েছে, তারাও আকাশের দিকে হা-পিত্যেশ করে চেয়ে। জ্যৈষ্ঠ গেছে, আষাঢ় যায়-যায়—আকাশ যেন দেবতার কোপ-দৃষ্টি—শুধু আগুন ঝরছে।

আকাশ যেমন শুকনো, অগ্রেশ্বরীর মন্দির তেমনি রক্তে ভেসে যাচ্ছে। মেঘের

বহু কালের থেকে ভদ্রেশ্বরীর কাছে দিনরাত পূজা-মানতের আর বিরাম নেই। রোগে বলির জন্য ছাগল মহিষ স্তূপীকৃত হয়ে এল। বিদেশী একদল বেদের সঙ্গে নরহরি বুঝি বেরিয়েছিলেন হরপোতাডাঙার সাপের খোঁজে। তারা নাকি তাঁকে চন্দ্রচূড়ের টাটকা বিষ যোগাড় করে দেবে। ফেরবার পথে ভদ্রেশ্বরীর সামনে দিয়ে প্রণাম করে মানত দিতে গিয়ে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। রক্ত! রক্ত! চারিদিকে শুধু রক্ত। তার মধ্যে একটি পাঁচ-ছ'বছরের ছোট উলঙ্গ মাঝিদের মেয়ের কান্না তাঁর কানে তীক্ষ্ণ তীরের মতো বিঁধল। ছোট একটা মিশকালো ছাগলছানা দু'হাতে জড়িয়ে ধরে সে হাপুস নয়নে কাঁদছে। ছাড়বে না, সে কিছুতেই তার ছাগলছানা ছাড়বে না। অনেকক্ষণ তার বাপ, মা, আশপাশের লোক বুঝি বুঝিয়েছে। বলেছে,—নতুন ছাগলছানা অমন কত হবে, একটার বদলে অনেক ছানা তাকে দেওয়া হবে। বোকা মেয়ে তবু অঙ্কের হিসেব বোঝে না। বিরক্ত হয়ে ছাগল-ছানাটাকে তারপরে তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিল সবাই। স্বয়ং নরহরি মাধব উপস্থিত! পুরোহিত থেকে খাঁড়াধারী পর্যন্ত সবাই নিজেকে একটু বেশী করে জাহির করবার জন্যে ব্যাকুল। কে একজন ঠাট্টা করে শাসিয়ে গেল,—আর কাঁদলে ও-পাঁঠার সঙ্গে তাকেও বলি দেওয়া হবে।

মেয়েটা আর কাঁদল না। দাঁতে দাঁত চেপে সে বলির উদ্যোগ-অনুষ্ঠানের দিকে চেয়ে রইল একদৃষ্টে। অনুষ্ঠান সাঙ্গ হ'ল। বলির পাঁঠার কপালে সিঁদুর মাখান হ'ল; গলায় উঠল রক্তজবার মালা। তারপর নিপুণ হাতের এক কোপে হাঁড়িকাঠে-গলান পিছমোড়া-দিয়ে-টানা ধড় থেকে তার মাথাটা খসে পড়ল মাটিতে। ছেড়ে-দেওয়া রক্তাক্ত ধড়টা তখনও ছটফট করছে। মেয়েটা চীৎকার পর্যন্ত করল না, শুধু তার ছোট্ট কোমল মুখটা কেমন যেন একবার শিউরে সিঁটকে উঠল। তার মাকে বাবা ধমক দিয়ে উঠল, 'মেয়েটা শিউরে গেল যে! আল খাওয়া মুখে! বলিহারি আক্কেল! আহ্লাদ ক'রে অমন মেয়েকে সঙ্গে করে এনেছিলেই বা কেন?'

নরহরি মাধব সেখান থেকে ফিরে এলেন। তাঁর প্রণাম অনেক আগেই সারা হয়েছিল কিন্তু এতক্ষণ তিনি কেন কে জানে সেখান থেকে নড়তে পারেননি।

পরের দিন সবাই স্তম্ভিত হয়ে শুনলে ভদ্রেশ্বরীর মন্দিরে বলি বন্ধ হয়ে গেছে,—নরহরির আদেশ। চারিদিকে আতঙ্কের সাড়া পড়ে গেল। কিন্তু নরহরির আদেশের নড়চড় হ'ল না। নরহরির এইটিই নাকি চরম ও শেষ খ্যাপামি।

বৃষ্টি নেই। আকাশে মেঘ যদি-বা দেখা দেয়, কোথা থেকে আগুনের হল্কার মতো ঝড় এসে তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। লোকে বললে, জয়েশ্বরীর শাপ লেগেছে। দেখতে দেখতে দুর্ভিক্ষের সঙ্গে মড়ক দেখা দিলে। কাতারে কাতারে গ্রামে গ্রামে লোক মারা যেতে লাগল। বড়-ছোট ইতর-ভদ্র সবাই এসে ধন্না দিয়ে পড়ল নরহরির কাছে। 'জয়েশ্বরীকে শান্ত করুন,—আবার বলির আদেশ দিন!'

নরহরি অটল। 'রক্তের দামে জল কিনব না,—দেবীর কাছেও না'—এই তাঁর বুলি। হতাশ হয়ে সবাই ফিরে গেল। মড়ক সর্বনাশা রূপ ধরলে। দেশে বুঝি আর মানুষ থাকবে না! দেবীর ভক্তদের মুখে শোনা গেল, বলি বন্ধ করার এত বড় অপমান দেবী কখনো ক্ষমা করবেন না। যদি ক্ষমা করেন তাহ'লে ছাগরক্তে আর নয়। নর-রক্ত চাই।

দেশব্যাপী হাহাকার। নরহরি বাইরে বার হতে পারেন না। শ্মশান আর গ্রাম এক হয়ে গেছে। ঘরের মধ্যেও তাঁর নিশ্চিন্ত মনে অমৃত-গবেষণার উপায় নেই। ক্ষুধার্ত রোগোন্মত্ত গ্রামবাসীর দল তাঁর ঘর পর্যন্ত চড়াও হয়ে আসে। জয়েশ্বরীর প্রৌঢ় পুরোহিত একদিন ঝড়ের মতো এসে উপস্থিত হলেন। উন্মাদের মতো তাঁর চেহারা, মহামারীতে তাঁর স্ত্রী-পুত্র-পরিবার সব নিয়ে শুধু তাঁকে ফেলে গেছে। পুরোহিত ক্ষিপ্তভাবে যেন অগ্নিবৃষ্টি নিক্ষেপ করে নরহরিকে বললেন, 'তুমি নাস্তিক, তুমি পাষণ্ড, তুমি বংশের কলঙ্ক—বামাচারী পিশাচ! সমস্ত দেশ তুমি শ্মশান করে দিয়েছ মড়কে। তবু কি তোমার তৃপ্তি নেই! দেবী রক্ত চান। এখনো হয়ত সময় আছে। এখনো তাঁকে তুষ্ট করো। নইলে কেউ রক্ষা পাবে না।'

পুরোহিত আরো অনেক কিছু বললেন। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে নরহরি বললেন, 'আপনি যান। দেবীকে আমি তুষ্ট করব।'

তার পরদিনই সকালে নাকি নরহরির মৃতদেহ পাওয়া গেছল দেবীর মন্দিরে, তাঁর গর্ভগৃহের সামনে। কেউ বলে তিনি নিজের হাতে নিজের শিরশ্ছেদ করেছিলেন, কেউ বলে যে-বিষ তিনি অমৃতে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন তারই পাত্র নাকি তাঁর হাতে।

দেবী তুষ্ট হলেন কিনা বলা যায় না। কিন্তু বৃষ্টি হ'ল একেবারে আকাশ ভেঙে অবিরাম। অতিবৃষ্টিতে দেশ ভেসে গেল,—সেই সঙ্গে সান্যালদের সমস্ত আভিজাত্য-গৌরব।

নরহরির যে ছেলে মামার বাড়িতে মানুষ হচ্ছিল তাকে গ্রামে ফিরিয়ে এনে [illegible] অনেক চেষ্টা করলে এ ভাঙনকে ঠেকাবার, কিন্তু বন্যা বাঁধ মানলে না। দেশের চেহারা চারদিকে তখন বদল হচ্ছে। ঢাকা থেকে দেওয়ানী দপ্তর সবে এসেছে মুর্শিদাবাদে। চৌধুরীরা ভালো করেই মাথা চাড়া দিয়েছে। মুর্শিদাবাদের 'রায়রায়ানে'র দপ্তরে তাদের সৌভাগ্যের সূত্রপাত। সেখান থেকে মুকুন্দরাম চৌধুরী নতুন ফার্সী বয়েত আর তার চেয়ে বেশী জৌলুসের বাদশাহী মোহর আমদানি করে সামনবেড়ের চাকা একেবারে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিলেন। সামনবেড়ে থেকে এর আগে কেউ আর ম্লেচ্ছ যবনের চাকুরি করতে চায়নি। কিন্তু মোহরে সব দোষ খণ্ডায়, দেখতে দেখতে সামন্তদের তালুক-মুলুক একে একে চৌধুরীদের হাতে গিয়ে উঠল। স্বয়ং ভদ্রেশ্বরীও ভাগ্যবানের উপর গিয়ে ভর করলেন। ধ্বসে-যাওয়া ভাঙা ভিটেতে আরো কয়েক পুরুষ সামন্তদের সন্ধ্যাপ্রদীপ টিমটিম করে জ্বলল। তারপর একদিন আর সে আলো দেখা গেল না। বছর সত্তর-আশী আগে দীননাথ সামন্ত তাঁর স্ত্রীকে এখানকার শ্মশানে রেখে সদ্যোজাত শিশুটিকে নিয়ে এ পোড়ো ভিটে ছেড়ে চলে গেছলেন। তারপর আর তাঁদের কথা সামনবেড়েতে শোনা যায়নি। সামন্তদের বিরাট বাসভূমির ধ্বংসাবশেষ জঙ্গলে ঢেকে গিয়ে বিষাক্ত সাপ ও গ্রামবাসীর কল্পনায় তার চেয়ে ভয়ংকর অপদেবতার আশ্রয় হয়ে উঠেছে।

ভদ্রেশ্বরী চৌধুরীদের উপর অনুগ্রহ করে আছেন সেই থেকে। তাঁর বলি নরহরির মৃত্যুর পর থেকেই আবার প্রচলিত হয়েছিল। কিন্তু বেশী দিনের জন্যে নয়। দীননাথ সামন্ত যখন সামনবেড়ে ছেড়ে যান তার আগেই চৌধুরীদের পূর্বপুরুষ রাঘবরাম চৌধুরী বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নিয়েছেন। ভদ্রেশ্বরীর মন্দিরে রক্তপাত তখন থেকে বন্ধ। ছাগ-শিশুর বদলে সেখানে কুমড়ো বলি হয়। ভদ্রেশ্বরীই এখন চৌধুরীদের প্রধান উপাস্য। কিন্তু ভদ্রেশ্বরীর অপমানিত বোধ করার কোনো লক্ষণই নেই। দুর্ভিক্ষও যায়নি, মহামারীও নয়। চৌধুরীদের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি শুধু বাড়বাড়ন্তই দেখা যাচ্ছে।

অমলের হঠাৎ যেন চমক ভাঙল। রবি বামুনপুকুরের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে তাকে ডাকছে, 'কি রে, জঙ্গল পাহারা দেবার মতলব নাকি! বাড়ি ফিরতে হবে না?'

দলের সবাই এগিয়ে গেছে যে যার বাড়িতে। একা রবিই দাঁড়িয়ে আছে তার অপেক্ষায়। দাঁড়িয়ে থাকাটা নিছক বন্ধুপ্রীতি নয়। দুজনে এক পাড়াতেই থাকে বটে তবে বড় রাস্তা থেকে যে-পথটা মনসা-তলা দিয়ে তাদের বাড়ির দিকে গেছে সেখানে রবির আর একটা ভয়ের জায়গা আছে। হারান বুড়ো মরবার পর থেকে তার বাড়ির পাশে বাদামতলায় ডোবার কাছটা নাকি মোটেই নিরাপদ জায়গা নয়। বুড়ো হারান নাকি অনেক টাকা কোথায় গোপনে পুঁতে রেখেছিল। মরবার সময়, এতদিন ধরে যার সেবা খেয়েছে, সেই একমাত্র উত্তরাধিকারিণী বিধবা ভাগনীকে সে পোতা টাকার গোপন সন্ধান দিতে গিয়ে কিছুতেই নাকি জায়গাটা নিজেই সে মনে করতে পারেনি। এমনি তখন তার ভীমরতি। সেই আপসোস নিয়ে মরে সে নাকি এখনও সেই গুপ্তধনের সন্ধানে রাত্রে সেই বাদাম-তলার ডোবার পাশে ঝোপেঝাড়ে ঘুরে বেড়ায়। রবি রাত্রে তাই পারতপক্ষে সেখান দিয়ে একলা যায় না।

দুজনে নিঃশব্দেই আগু-পিছু সঙ্কীর্ণ পথটা পার হয়ে যাচ্ছিল। চাঁদ এখন আরো খানিকটা উপরে উঠে এসেছে। ক্ষীণ জ্যোৎস্নালোকে ঝোপঝাড় গাছের ছায়ায় পথটা আলো-আঁধারি। হঠাৎ পেছন থেকে রবি অমলের জামাটা টেনে ধ'রে ভীত অস্ফুট গলায় বলে, 'দেখেছ!'

অমলও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। ভয় তার একেবারে নেই তা নয়, কিন্তু রবির মতো অমন 'আটাশে' তাকে বলা যায় না। কিন্তু সত্যিই বাদামতলায় ডোবার ধারে একটা অস্পষ্ট মূর্তি যে দেখা যাচ্ছে!

খানিক দুজনেই চুপ করে থাকে, তারপর মূর্তিটা একটু নড়তেই অমল হাঁক দেয়, 'কে? কে ওখানে?' ভেতরের অস্পষ্ট ভয়ের দরুনই তার হাঁকটা একটু বেশী জোরেই বার হয়।

ডোবার পাড় থেকে মূর্তিটা এবার তাদের দিকেই আসতে আসতে বলে, 'আমি গো আমি। দামী চোর—ধরবি নাকি?'

এবার রবিই লজ্জিত হয়ে বলে, 'আরে! সিধু খুড়ো। দেখেছ ব্যাপার খাও!'

গলাটা একটু চড়িয়ে সে তারপর বলে, 'এত রাত্রে ঝোপে জঙ্গলে কি করছ, সিধু খুড়ো?'

'চুরি করছি বাবা, চুরি করছি—আমায় ধরে নিয়ে যাবি না?'—সিধু খুড়ো

ওদের সামনে এসেই দাঁড়ায়। এই শীতেও কোমরে একটা খাটো কাপড় ছাড়া অন্য কিছু তার গায়ে নেই। আবছা অন্ধকারে দাড়ি-গোঁপ সমেত বিরাট দীর্ঘ চেহারাটা সত্যি ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে।

ভয় করবার তাকে কিন্তু কিছু নেই। অমল হেসে বলে, 'ধরব কি করে? হাতকড়া নেই যে।'

'তবে কি ছাই তোদের রাত-পাহারা! রাতে নয় বাবা, রাতে নয়—পাহারা দেবে দিনমানে। যত চুরি সব দিনের বেলায়।' সিধু খুড়ো নিজের মনেই বকতে বকতে চলে যায়।

রবি ও অমল একটু হেসে আবার এগিয়ে চলে। পেছন থেকে হঠাৎ বেসুরো কর্কশ গলায় সিধু খুড়োর গান শোনা যায়:

তোর বিচারের এমনি মজা!
সাবাস হ'ল দিনের চুরি,
শুধু রাতের চুরির বেলায় সাজা।...

রবি সসম্ভ্রমে বলে, 'সিধু খুড়ো অমনি খ্যাপা সেজে থাকে,—বুঝেছিস। আসলে ও সিদ্ধ পুরুষ। মুখে মুখে যখন তখন কি রকম গান বাঁধে দেখছিস!'

পথে প্রথমেই রবিদের বাড়ি পড়ে। সে বিদায় নিয়ে চলে যায়। অমল খানিকটা এগিয়ে তাদের নিজেদের বাড়ি ঢোকে। বার-বাড়ির উঠানে অনেকগুলো গরুর গাড়ি বিরাট ফড়িংএর মতো ল্যাজ উঁচু করে দাঁড়িয়ে। মধুবন থেকে প্রজারা বৎসরের বরাদ্দ কাঠ এনেছে। এখনো মাল খালাস হয়নি। আশেপাশের গরুগুলোর ভারী নিশ্বাসের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। তারই সঙ্গে মানুষের নাক-ডাকার শব্দ। বার-দালানের বারান্দায় গাড়োয়ানেরা যে যেখানে পেরেছে কাঁথা কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে।

বার-দরজাটা ভেজানই ছিল। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পুরোনো আমলের সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি দিয়ে অমল নিজের ঘরের দিকে চলে।

সারা বাড়ি নিষুতি। অমল খেয়েদেয়েই রাত-পাহারায় বেরিয়েছিল। সুতরাং তার জন্যে কেউ অপেক্ষা করে নেই। কিন্তু ওপরের বারান্দায় ঢোকবার মুখেই দরজায় আলো দেখা যায়। সঙ্গে চুড়ির মৃদু আওয়াজ।

অমল জিজ্ঞাসা করে, 'কে? মনু নাকি?'

মৃদু হাসির সঙ্গে শোনা যায়, 'কষ্টা ডাকাত ধরে আনলে গো, অমলদা!'

অমল দাঁড়িয়ে পড়ে হেসে বলে, 'ধরেছিলাম একটা। আনতে পারলাম না।'

'কাকে গো ?'

'আমাদের সিধু খুড়োকে।'

মঞ্জরীর মুখে এবার সত্যি উদ্বেগ দেখা যায়।

বলে, 'সিধু খুড়ো বুঝি আবার গাঁয়ে এসেছে ? এতদিন কোন্ শ্মশানে-মশানে ছিল কে জানে। কিন্তু ওকে যেন কিছু বোলো না। জানো ত ও পিশাচ-সিদ্ধ কাপালিক, রাগলে কী না করতে পারে !'

অমল হেসে বলে, 'আচ্ছা, উপদেশটা মনে রাখব। কিন্তু এত রাত পর্যন্ত তুই জেগে যে ?'

'কি করব বলো, দুপুর রাতে ছ'গাড়ি কাঠ নিয়ে এল, গাড়োয়ানগুলোকে ত আর উপোস করিয়ে রাখতে পারি না ? এইত খানিক আগে সব পাট চুকল। তারপরও কি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে যাবার জো আছে—পাশের বাড়িতে যদি ডাকাত-পড়া শোরগোল হয় ?'

'ডাকাত-পড়া শোরগোল আবার কিসের ?'

'কুমুদ ডাক্তারের দরজায় দুমদুম করে লাথি গো—ওই সেই ভুতুড়ে বাড়ির নেপালী চাকরটার কীর্তি।'

'নেপালী নয় সে, বর্মী'—অমল শুধরে দিয়ে বলে, 'কিন্তু রাতদুপুরে ডাক্তারের বাড়িতে কেন ? কারুর অসুখ নাকি ?'

'হবে নিশ্চয়। কুমুদ ডাক্তার ত প্রথম বেরুতেই চায় না। আর তারই বা দোষ কি। রাতদুপুরে সামন্তদের সেই ভুতুড়ে ভিটেতে কেউ সাধ করে যায় !'

'ডাক্তার গেছে ত শেষ পর্যন্ত ?' অমল একটু কৌতূহলী হয়েই জিজ্ঞাসা করে।

'পাগল ! সে আবার যায় ! সে নিজে বলে বাতে পঙ্গু। এই শীতের রাতে আধ ক্রোশ হেঁটে সেই ভাঙনে যাবে ! সব শুনেটুনে কি একটা ওষুধ দিয়ে বললে, —সকালে যাবে।'

তাচ্ছিল্য ভাবেই প্রসঙ্গটা শেষ করে মঞ্জরী বলে, 'তোমার গরম জল দরকার থাকে ত বলো, এখনো উনুনে আঁচ আছে।'

অমলের শরীর খুব সবল নয়, কিন্তু উৎসাহটা সব সময়ে স্বাস্থ্যের মাত্রার খেয়াল রাখে না। পরে ধাতা সামলাতে তাই তাকে অনেক কিছু করতে হয়।

বুড়োর রাতে পাহারা সেরে এসে এক এক দিন ঠাণ্ডা লাগায় তবে সে গরম জলে ধূপ দিয়ে পূজা করে। অবশ্য মঞ্জরীর কৃপাতেই গরম জল যোগাড় হয় অত রাত্রে।

আজ কিন্তু ওসব দিকে অমলের মন নেই। সে মাথা নেড়ে জানায় গরম জল তার আজ লাগবে না। তারপর একটু অপ্রসন্ন স্বরে বলে, 'কুমুদ ডাক্তারের কিন্তু যাওয়া উচিত ছিল। অত রাত্রে ডাকতে এসেছিল, কিছু বিপদ নিশ্চয় হয়েছে।'

মঞ্জরীর কিন্তু কর্তার চেয়ে ডাক্তারের ওপরই সহানুভূতি বেশী। বলে, 'ডাক্তারেরও ত মানুষের শরীর। বুড়ো বেতোরুগী ঠাণ্ডা লাগিয়ে মারা পড়বে নাকি?'

কথাটা তারপর ঘুরিয়ে মঞ্জরী বলে, 'তোমার মশারি আমি ফেলে গুঁজে দিয়ে এসেছি। যাও, শুয়ে পড়গে। আর মাথার দিকের জানলাটা যেন খুলো না আবার।'

বাতিটা হাতে নিয়ে মঞ্জরী নীচে চলে যায়।

বিছানায় শুয়ে অমলের কিন্তু প্রথমটা ভালো করে ঘুম আসে না। আধতন্দ্রার আচ্ছন্নতার মধ্যে অসংলগ্ন চিন্তার জট। ভগ্নেশ্বরী……পিশাচ-সিদ্ধ সিধু খুড়ো… অমৃতসন্ধানী নরহরি……সামন্তদের ভুতুড়ে ভিটের অপরিচিত বুড়ো আর তার মেয়ের রহস্য……কে জানে কার গুরুতর অসুখ হয়েছে হঠাৎ……কুমুদ ডাক্তার ছাড়া গাঁয়ে আর ডাক্তার নেই……ডাক্তার একজন এখানে অত্যন্ত দরকার। পাশ করে এসে সেও ত গাঁয়েই বসতে পারে……না, তা হবার নয়……বড় সঙ্কীর্ণ জীবন………চারি ধারে বেড়া দেওয়া………অদ্ভুত মেয়ে মঞ্জরী; সেবায়, যত্নে, তৎপরতায়, মায়া-মমতায় তার তুলনা মেলে না। একা এই এতবড় সংসার সে-ই চালায় বললে হয়। যাকে সে চোখে দেখতে পায়, হোক সে সামান্য অচেনা পশু-পাখির পাহারোয়ান—তার জন্যে কোনো পরিশ্রম কোনো কষ্ট সে গ্রাহ্য করে না। কিন্তু তার নিজের ছোট গণ্ডির বাইরে যাকে সে চোখে দেখেনি তার কোনো দাম তার কাছে নেই। হোক সে অসহায় শিশু……হোক সে অসুস্থ……

অনেক রাত্রে ঘুমিয়েছে। সকালে অমলের ঘুম ভাঙল একটু বেলায়। মঞ্জরী হাত গুনতে জানে বোধ হয়। তার ঘুম ভাঙতে-না-ভাঙতে চায়ের বাটিটি নিয়ে সে ঘরে ঢুকল।

চায়ের বাটিটা টেবিলের ওপর রেখে মশারি গুটোতে গুটোতে সে বললে,

'তোমার আর রাত-পাহারায় যেতে হবে না, বাপু। বেলা ন'টা পর্যন্ত ঘুম! এতে শরীর খারাপ হয় না?'

মশারি গুটিয়ে বিছানা তুলে মঞ্জরী চলে গেল।

চায়ের পেয়ালা তুলে নিয়ে অমল তখন জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। বেলা অনেকটা হয়েছে বটে, শরীরেও কেমন একটা জড়তা। তবু শীতের সকালের রোদটা কি মিষ্টিই না লাগছে! দূরে চৌধুরীদের শ্যামসুন্দরের বাসকের চূড়োটা আম-কাঁটালের বনের মাথায় ঝকঝক করছে সোনালী রোদে, আর একদিকে কুমুদ ডাক্তারের দোতলা দালান আর তাদের বার-বাড়ির দেয়ালের ফাঁক দিয়ে সুদূর দিগন্তের একটা ফালি দেখা যাচ্ছে—ধান-কেটে-নেওয়া শূন্য মাঠ, তার ওপারে সুবর্ণডাঙার রাঙামাটির ঢেউ। এখানে ওখানে ছড়ানো বাবলা বন যেন আকাশে সেই ঢেউয়ের ছিটে। কি অপরূপই লাগছে শীতের এই প্রসন্ন নীল আকাশের তলায়! পৌষের আকাশের চোখে মধুর একটি পরিতৃপ্তি। ঘরে ঘরে সে মরাই ভরে দিয়েছে ধানে। অতি দুঃখীর মুখেও হাসি ফুটিয়েছে দু'দিনের……

অমল হাতমুখ ধুয়ে চৌধুরীদের বাড়িতেই একটু যাবার উদ্যোগ করছে, এমন সময় মোহিত এসে বলে, 'বোয়ানবাদী যাবে, অমলদা? চলো যাই। শিউলীরা কাল নতুন 'লবাং' তৈরী করেছে, নিয়ে আসব।'

অমলের এসব ব্যাপারে উৎসাহ নেই। তবু মোহিতের আগ্রহ দেখে তাকে নিরাশ করতে তার ইচ্ছে করে না। আপত্তি না করে মোহিতের সঙ্গেই সে বেরিয়ে পড়ে। বাড়ির উঠোন দিয়ে যাবার সময় খিড়কী পুকুরে চুবড়ি হাতে মাছ ধুতে যেতে যেতে মঞ্জরী বলে, 'অমলদাকে নিয়ে বেরুচ্ছ, আজ কিন্তু সেদিনকার মতো বেলা দুপুর কোরো না, ছোড়দা। শীতের দিনে ভাত তরকারি সব জল হয়ে থাকবে।'

'আচ্ছা আচ্ছা, তোকে আর মুরব্বিয়ানা করতে হবে না।' মোহিত তাচ্ছিল্যের সুরেই বলবার চেষ্টা করে, কিন্তু সুরটা তার নরম।

মোহিত মঞ্জরীর বড় ভাই, বছর কয়েকের বড়। কিন্তু বেঁটে খাটো, ম্যালেরিয়ার শীর্ণ চেহারা—দেখায় যেন মঞ্জরীর ছোট। মঞ্জরীকে আর সবাইকার মতো সে একটু সমীহ করে চলে। মোহিতকে দেখলে অমলের সত্যি কেমন মায়া হয়। একেবারেই পাড়াগাঁয়ের ছেলে,—চেহারায় চিন্তায় পোশাকে-আশাকে

সব বিষয়েই কেমন একটা জড়তা। লেখাপড়া করবার বেশী সুযোগ তার হয়নি। সাংসারিক অভাব, তার ওপর রোগ তার লেগেই আছে। বাড়ির আর সবাইকার চেয়ে ম্যালেরিয়া যেন তাকেই বেশী করে পেয়ে বসেছে। হেমন্ত গিয়ে শীত এসেছে, তবু এখনো ঘুরে ফিরে সে জ্বরে পড়ছে। সুস্থ থাকলে চাষ-আবাদ জমিজমা সে একটু আধটু দেখাশোনা করে। সে বিষয়ে তার উৎসাহ কিন্তু যথেষ্ট। জমিজমা চাষবাস সংক্রান্ত এত খুঁটিনাটি সে জানে যে অমলের অবাক লাগে। মনে হয় এই পাড়াগাঁয়ের জগৎই বুঝি তার সব। তাই নিয়েই সে খুশি। কিন্তু আসলে সে তা নয়, এইখানেই মুশকিল। মোহিত শহরে যেতে চায়, কলকাতাই তার কল্পনায় স্বর্গ। সেখানে সে একটা পানের দোকান দেবে, না হয় অফিসে বেয়ারাগিরি করবে—তবু এই গ্রামে সে পচে মরবে না। কি আছে এখানে? সকাল থেকে সন্ধ্যা, দিন থেকে মাস, মাস থেকে বৎসর—সব এখানে নির্দিষ্ট বাঁধা-ধরা। বড় জোর কোনো বছর বৃষ্টি হবে বেশী, কোনো বছর হবে না। কোনবার আক ফলবে ভালো, কোনবার ধান, কখনো ধানে পোকা লাগবে, কখনো বেগুনের গোড়া যাবে পচে। বর্ষায় আগাছার জঙ্গল বাড়বে, ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়া দেখা দেবে—লোকে ভুগবে, মারা যাবে, সেরে উঠবে। বুড়োরা সারা শীত কাশবে আর একটু একটু করে বিশাই নদীর ধারের শ্মশানের দিকে এগুবে। সেই ত তাদের জীবনের সীমানা! না, মোহিত এখানে কিছুতেই থাকতে চায় না। এখানের সব কিছু তার মুখস্থ হয়ে গেছে—কার ক্ষেতে কত ধান, কার বরোজে কত পান, কোন্ গাছের আম আগে পাকবে, কার পুকুরের জল আগে শুকোবে—কিছুই তার আর জানতে বাকি নেই। সে তাই অজানা রহস্যময় সেই অদ্ভুত রূপকথার পুরীতে যেতে চায়; সেখানে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে আশ্চর্য কিছু, অবিশ্বাস্য কিছু ঘটে যাওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। যেখানে সে মোটরে চাপা যেতে পারে, হয়ত মোটরে চড়তেও পারে, ফকির হতে পারে কিংবা হঠাৎ এক মহলার আলাদীনের প্রদীপ পেয়ে যেতে পারে। যেখানে প্রতিদিন সেই এক চেনা মুখ ঘুরে ফিরে দেখতে হয় না—যেখানে অন্তহীন আকস্মিকতা, যেখানে চমকের অফুরন্ত মিছিল।

অমলের সঙ্গে যাবার জন্তে তাই সে এত লালায়িত। অমল সেই কাল্পনিক স্বর্গের প্রতিনিধি। ইচ্ছা করলে সে তাকে একটা কাজ কি সেখানে দিতে পারে না—একটা কোনো সুযোগ, তবু একটু দাঁড়াবার জায়গা। আজও সে একবার

কথাটা পাড়ে। অমল হেসে বলে, 'পাগল! এখন কেউ যায়? লোকে বরং সেখান থেকে পালাতে পেলে বাঁচে।'

মোহিত কিন্তু সে কথা বোঝে না। কলকাতা থেকে পালিয়ে আসা তার কাছে একটা অর্থহীন ছেলেমানুষী। বোমার ভয় তার নেই, বোমা কি জিনিস সে কল্পনাই করতে পারে না ভালো করে। সামনবেড়ের ওপর দিয়ে মাঝে মাঝে এরোপ্লেন উড়ে যায়—সে দেখেছে। সে এরোপ্লেন ত একটা পরম বিস্ময়ের বস্তু। লোকে বলে, সেই এরোপ্লেন উড়ে আসবে ঝাঁকে ঝাঁকে, তা থেকে বাজের মতো বোমা পড়বে, শহর ফেটে চৌচির! এমন দৃশ্য দেখবার জন্যে এই ম্যালেরিয়ায় জীর্ণ জীবনটার সে তোয়াক্কা রাখে নাকি? তা ছাড়া শহরে কি কেউ আর নেই? যারা পালাবার তারা পালিয়েছে, শহর ত চলছে। সেই শহরেই সে যেতে চায়। লেখাপড়া সে ভালো জানে না, পরিশ্রম করবার তার তেমন ক্ষমতা নেই,—না থাক, তবু সেখানে একবার যেতে পারলে সে একটা পথ খুঁজে বার করবেই। সাধন তেলীর ছোট ছেলেটো যে সেবার পালিয়ে গেছল। লেখাপড়া সেই বা কি জানে। শরীরও তার এমন কিছু সবল নয় মোহিতের চেয়ে। তবু সে ত সেখানে একটা কাজ যোগাড় করে নিয়েছে, কি একটা পাউরুটি-বিস্কুটের দোকানে। মোহিত কি তার চেয়ে অযোগ্য! অমলদা ইচ্ছে করলেই তাকে একটা চিঠি লিখে দিতে পারে,—তার কত চেনা লোক সেখানে।

অমল হেসে তাকে আশ্বাস দেয়,—আচ্ছা আর দু'দিন যাক, যুদ্ধটা কোন্ দিকে যায় দেখা যাক, সে-ই তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে।

মোহিতের জন্যে অমলের সত্যি দুঃখ হয়। কেন তার মধ্যে এই অদ্ভুত আত্মঘাতী দুরাশা। কলকাতা যে কি, তা তার ধারণাই নেই। তার মতো ছেলে সেখানে কি করতে পারে! নির্বিকার নির্মম মহানগরের বিরাট রথচক্রে তার মতো কত নিষ্ফল জীবন প্রতিদিন গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যাচ্ছে সে জানে না। কলকাতা মোহিতের কাছে হয়ত একটা বিরাট মুক্তি। সে ত জানে না সেখানে আকাশ কত ছোট হতে পারে—এই গাঁয়ের চেয়ে কত সঙ্কীর্ণ।

অবশ্য এখানেও মোহিতের মতো ছেলের জীবন ঈর্ষা করবার মতো নয়, অমল বোঝে। অত্যন্ত দুঃস্থ দরিদ্র পরিবার। জমিজমা কিছু তাদের নেই বললেই হয়। স্বামী মারা যাবার পর অনাথ ছেলেটি ও মেয়েটি নিয়ে মোহিতের মা অকূল পাথারে পড়েছিলেন। অমলের মায়ের সঙ্গে তাঁর দূর সম্পর্কের কিরকম একটা

সহজ নয়। অমলরা বহুদিন থেকে গ্রাম-ছাড়া, কালেভদ্রে গাঁয়ের বাড়িতে আসে। ক্ষেত-খামার থেকে ঠিকমতো আদায় হয় না, বাগানের ফলমূল যে পারে লুটে খায়। তাই, মোহিতদের দুঃখ দেখে, বিশেষ করে নিজেদেরও বাড়ি ক্ষেত-বাগান দেখাশুনো হবার সুবিধে হবে বলে অমলের মা তাদের এ বাড়িতে এসে থাকতে দিয়েছেন। সে প্রায় বছর আষ্টেক হ'ল। মোহিতদের তাতে অনেকটা ঘুচেছে। অমলদের গাছের যা কিছু ফল ফসল তারাই ভোগ করে। অমলদের তাতে আপত্তি নেই। গাঁয়ের বাস তারা ছেড়েই দিয়েছে। এবার বিদেশে পড়তে নেহাত এখানে আসা। ঈর্ষাতুর গাঁয়ের লোক অবশ্য কলকাতায় গিয়ে মোহিতদের সব নামে তাদের কাছে লাগাতে কসুর করে না। অমলদের জমিজমা থেকে তিনি নাকি বেশ দু'পয়সা করে নিচ্ছেন। নিজেদের বাপ-পিতামহ'র সম্পত্তি এভাবে লুট হতে দেওয়া তাদের উচিত নয়, ইত্যাদি। অমলের মা সামনে তাদের প্রতিবাদ করেন নি; পরে হেসে বলেছেন, 'একজনের বদলে সবাই লুট করে খেলে বোধহয় আমার বেশী সুখ হতো!' না, আপাততঃ মোহিতদের ভাবনার কোনো কারণ নেই। অমল বা তার মা, মোহিতদের পারতপক্ষে অনুগ্রহ করবেন না। তাঁদের দরকারই বা কি? শহরের বাড়ির ছেড়ে গ্রামে এসে বাস করবার কোনো ব্যাকুলতা তাঁদের নেই। আপাততঃ বাধ্য হয়েই ক'দিনের জন্যে এসেছেন। মোহিতরা যতদিন খুশি এখানে থাকতে পারে। কিন্তু হাজার হ'লেও পরের বাড়ি ঘর সম্পত্তি, চেষ্টা করলেও একেবারে সেকথা ভুলতে পারা বোধহয় সম্ভব নয়। সুতরাং মোহিতের কোনদিকে কি কথা বলবার আছে? প্রত্যক্ষ না হ'লেও পরের অনুগ্রহের ওপর নির্ভর। তার ওপর বড়দির বিয়ের ভাবনা। পাড়াগাঁয়ের হিসেবে তার বিয়ের বয়স অনেক দিন পার হয়ে গেছে। আগেকার দিন হ'লে কথা উঠতো, আজকাল ঘরে ঘরে এই অভাবের সমস্যা। তাই কোনরকমে মুখ বন্ধ আছে। কিন্তু আর বেশীদিন থাকবে না।

অমলের মনটা কেমন ভারাক্রান্ত হয়ে যায়। এবার ঘুম ভেঙে ওঠার সে প্রসন্নতা কখন গেছে হারিয়ে। দিনের সে নির্মল রোদে-ভেজা রূপ আর নেই। পায়ে পায়ে এলো মেলো আর বেল-বাঁশ-জঙ্গলের পাশ দিয়ে যেতে যেতে গ্রামকে এবার অন্যরকমই দেখায়। ভোরের সে মায়া-মাধুর্যও নেই মনকে আচ্ছন্ন করে রাখবার। চোখে পড়ে একঘেয়েমি উদ্দেশ্যহীন ভাবে দাঁড়ানো অনাবাদি জমিটা। না আছে শ্রী

না হায়। বেশীর ভাগই অস্পষ্ট হাড়-বার-করা নোনা-ধরা ইটের ধ্বংসাবশেষ, তাইনে বাঁয়ে পানায় পচা ডোবার বিষ-নিশ্বাসে ধুঁকছে। এই নাবাল পাঁতসেঁতে জমি শুধু চাষেরই উপযুক্ত। কতবার অমলের মনে হয়েছে, এ গ্রামের যারা পত্তন করেছিল তারা পাশেই সুবর্ণোডাঙার উঁচু শুকনো রাঙামাটি ছেড়ে এই অস্বাস্থ্যকর নীচু জমিতে কি জন্যে প্রথম ভিৎ গড়েছিল। শুধু বোধ হয় জলের সুবিধের জন্যে। মাটি আঁচড়ালেই যেখানে জল ওঠে সেই তাদের কাছে স্বর্গ। তারা আশু সুবিধেটাই দেখেছে, ভবিষ্যৎ বিপদটা ভাবেনি; কিংবা তাদের এ বিষয়ে কোনো ধারণাই ছিল না। নিজেদের চাষ-আবাদের মাঝখানেই তারা থাকতে চেয়েছে, চোর-ডাকাতের ভয়ে বাড়িগুলো গায়ে গায়ে ঘেঁষাঘেঁষি করে তাল পাকিয়ে উঠেছে মাটির বিস্ফোটকের মতো। কারণে অকারণে যেখানে সেখানে তারা ডোবা কেটেছে ভবিষ্যৎ সর্বনাশের রাস্তা প্রশস্ত করতে।

গ্রামের সীমানা পেরিয়ে তারা এখন সুবর্ণোডাঙার কাছাকাছি এসে পড়েছে। সুবর্ণোডাঙার এই দিকটায় কিছুদিন থেকে ক'ঘর সাঁওতাল এসে বসতি করেছে। গাঁয়ের কুশ্রীতার পাশে তাদের ঝকঝকে তকতকে শুকনো নিকানো উঠোন, ছোট্ট কুঁড়েগুলির পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রূপ বড় বেশী চোখে পড়ে। সাঁওতালরা গরীব। গাঁয়ের নেহাত নিরেস অকেজো জমি তারা ভাগে চাষ করতে পায়, কেউ-বা অতি সামান্য মজুরিতে লোকের বাড়ি খাটে। কিন্তু তবু তাদের জীবনে কেমন একটি সহজ স্বাভাবিক শ্রী আছে। জীবনের কি যেন একটা সহজ মন্ত্র তারা জানে। বাউরীদের মতো তাদের দারিদ্র্য কুৎসিত হয়ে ওঠেনা কখনো। জীবনকে সুন্দর করে রাখতে বেশী কিছু উপকরণ ত তাদের লাগে না। দুটো বনের ফুল, একটা বাঁশের বাঁশী, হাতে বোনা তাঁতের একটা মোটা কাপড় কি শাড়ী—আর কিছু তাদের দরকার নেই। তাই দিয়েই তারা নিজেদের জীবনকে মধুর একটি সৌষ্ঠব দিতে পারে। পরিশ্রম আর অবকাশকে কি সহজ সঙীন ছন্দে তারা মিলিয়ে দেয়। জীবনের এ সহজ মন্ত্র তারা কোথা থেকে পেয়েছে কে জানে। কোনো সুদূর সহজ এক বিস্মৃত সভ্যতার ধারা হয়ত আজও তাদের মধ্যে বইছে। সে সভ্যতায় উপকরণের বাহুল্য ছিল না, ছিল না নিরর্থক জটিলতা। সুদূর অতীতে কাঁকর-পাহাড়ের রাঙামাটির দেশে যারা বড় বড় পাথরের চাই দিয়ে 'ডলমেন' সাজিয়েছিল অজানা দেবতার উদ্দেশে, প্রথম যারা মাটির গর্ভ থেকে তামা খাঁচড়ে তুলেছে—পৃথিবীর হতাজো ফুল-বাগান সেই

সাঁওতাল বাহিনরাই হয়ত তাদের প্রথম দীক্ষাগুরু। কে জানে! সাঁওতাল মেয়েরা হ্রদের কমল-দ' থেকে জল নিয়ে আসছে। জলের কলসী তাদের মাথায় যেন ভার নয়, হঠাৎ শরীরের একটা শোভন অলঙ্কার। জল তাদেরও দরকার, কিন্তু তাই বলে কেঁচোর মতো নরম মাটি খুঁজে তারা আস্তানা গাড়ে না। জীবন-যাত্রা সম্বন্ধে একটি সহজাত শুভবুদ্ধি তাদের আছে। তারা গ্রাম থেকে শুকনো উঁচু জমি বেছে বাসা বাঁধে। মাটি আঁচড়ে জল পাবার জন্যে তারা ব্যাকুল নয়।

প্রথম প্রথম অমলের গ্রামের লোকের ওপর রাগ হয়েছে। এখনো তারা এই মৃত্যুবীজ-আকীর্ণ ধ্বসে যাওয়া গ্রাম ছেড়ে সুখপোতাডাঙায় নতুন করে গ্রামের পত্তন ত করতে পারে। সেখানে অবাধ আলো বাতাস; পচা ডোবার নিশ্বাসে আকাশ সেখানে বিষাক্ত হয়ে উঠবে না। কিন্তু অমল আজকাল বোঝে গ্রামের লোকেরা কত নিরুপায়। এই আগাছার জঙ্গল, এই পচা ডোবা, নোনাধরা ইটের এই ধ্বংসস্তূপের সঙ্গে তাদের জীবন অচ্ছেদ্য ভাবে মরণ-শৃঙ্খলে জড়ান। সে শৃঙ্খল তারা ছিঁড়তে পারবে না কোনদিন।

বাঁয়ে এবার শীতলবাঁধের দক্ষিণ পাড়টা দেখা যাচ্ছে। বিরাট উঁচু আলমাটির সুদীর্ঘ স্তূপ। যুগযুগান্তরের রোদ আর বৃষ্টিধারা তার ওপর স্থাপত্য চালিয়েছে। বিচিত্র এলোমেলো ছাদ ও খাদ। কাঁটা ঝোপ জন্মেছে এখানে সেখানে। কালের স্পর্শে মানুষের হাতের ছাপ গেছে মুছে। দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন লম্বা পাথুরে ঢিবি—ছোটখাট পাহাড়ের ভূমিকা।

মোহিত হঠাৎ বেশ একটু উত্তেজনার সঙ্গে অমলের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করে বলে, 'ওই দেখো, সেই মেয়েটা!'

অমলের চোখেও তখন পড়েছে। বাঁধের পাড় যেখানে পশ্চিমে ঘুরে গিয়েছে সেখানে একটি ঢিবির ওপর মেয়েটি দাঁড়িয়ে। মুখ ভালো করে এত দূর থেকে দেখা যায় না, কিন্তু দেহের দীর্ঘ সুঠাম গড়নটি খুব বাঙালী-সুলভ নয়।

এই গ্রামের পক্ষে দৃশ্যটা এমন বিস্ময়কর যে গোড়াতে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করবার কথাই অমলের মনে হয়নি। মেয়েটিকে ঢালু পাড়ের ওপর দিয়ে সন্তর্পণে নেমে আসতে দেখে অমল জিজ্ঞাসা করে, 'সেই মেয়েটি মানে,—কে ও?'

'বাঃ, ওই ত সেই সুন্দর মেয়ে—[illegible] সেই কুকুর ছিটকে থাকে।

জানো অমলদা, মেয়েটার ভয়ডর লজ্জাসরম নেই। যখন তখন একা একা ঘুঘপোডাঙায় ঘুরে বেড়ায়।'

মেয়েটি আজ কিন্তু একা আসেনি দেখা যায়। একটু দূরে বাঁধের পাড়ের একটা সহজ নামবার জায়গা দিয়ে প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক নেমে আসছেন। মেয়েটি তাঁরই জন্যে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছে। প্রৌঢ় ভদ্রলোকের একটা হাত ব্যাণ্ডেজ হয়ে কাঁধে বাঁধা স্লিংএ ঝোলান। অমল বুঝতে পারে কাল হঠাৎ এই হাত ভাঙার দরুনই নিশ্চয় রাত্রে কুমুদ ডাক্তারের ডাক পড়েছিল। যাক, কিছু গুরুতর ব্যাপার তাহ'লে নয়। কিন্তু বুড়োর শখ ত খুব! হাত-ভাঙা অবস্থাতেও সকালে শীতলবাঁধে বেড়াতে এসেছে, তাও আবার বাঁধের পাড় বেয়ে ভেতরে ঢুকে! কি আছে এমন সেখানে দেখবার? সব শুকিয়ে শুধু মাঝখানে একটু জলায় মতো হয়ে আছে মাত্র। ভুবন বাক্‌ই তার আশেপাশে হেলায় ছেদ্দায় দুটো ধান বোনে কি বছর।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক এবং মেয়েটি তাদের পাশ দিয়েই চলে যায়। প্রৌঢ়ের শুকনো পাকানো চেহারা। বয়সের অনুপাতে সামর্থ্য কিন্তু অটুট আছে বলেই মনে হয়।

মেয়েটির সত্যিই লজ্জাসরম নেই। অসঙ্কোচে সে অমলকে বেশ ভালো ভাবেই পর্যবেক্ষণ করতে করতে যায়। লজ্জায় প্রথম চোখ নামাতে হয় অমলকেই। কিন্তু মোহিতকে দেখে মেয়েটি ও প্রৌঢ় দুজনেই একটু হাসে। মেয়েটি বলে, 'আর যে আমাদের বাড়ি যাও না—'

মোহিত অত্যন্ত অপ্রস্তুত ভাবে বলে, 'যাব একদিন।'

তারা একটু দূরে চলে গেলে অমল আর না জিজ্ঞাসা করে পারে না, 'তোমায় ত ওরা চেনে দেখছি।'

অত্যন্ত লজ্জিত ভাবে মোহিত বলে, 'হ্যাঁ, একদিন গেছলাম ওদের বাড়ি।' নিজের লজ্জাটা কাটাবার জন্যেই মোহিত আবার বলে, 'জানো অমলদা, মেয়েটার কি অদ্ভুত নাম—ঝিরা। ঝিরা আবার নাম হয় নাকি!'

ঝিরা নামটা অদ্ভুত বটে। মেয়েটিও ত সাধারণ নয়। তার চোখের তুলতে অচেনা বিদেশী টান, বিদেশী টান তার কথায়।

মোহিত তাদের বাড়ি গেছে। এ গাঁয়ে মোহিতের অজানা কিছু থাকবার যো নেই। অমলের আরো অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু করে না।

আজ আবার সিধু খুড়োর সঙ্গে খানিক দূরেই দেখা। মাঠের মাঝে একটা পড়ো শিবমন্দিরের চৌচির ভিংটা শুধু দাঁড়িয়ে আছে। চারিদিকে বোয়ান ঝোপের মাঝে টুকরো-টাকরা পাথর ছড়ানো। সিধু খুড়ো সেখানে বসে আপন মনে কি বকছে।

'এখানে বসে যে সিধু খুড়ো', মোহিত জিজ্ঞাসা করে। 'তাঁতী-ঘর খুঁজতে এসেছিলাম রে, তাঁতী-ঘর! কাপড়টা বড় ছিঁড়ে গেছে কিনা। একটা কাপড় চাই।—' সিধু খুড়ো আবার অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

পথে যেতে যেতে মোহিত বলে, 'সিধু খুড়ো ভুল কিছু বলেনি, অমলদা। জান ও এখানে পঞ্চাশ বছর আগেও অমন বিশ ত্রিশ ঘর তাঁতী, বিশ ত্রিশ ঘর তেলী ছিল। এখন দেখছ শুকনো বাঁজা ডাঙা, তখনও পর্যন্ত কিন্তু শীতলবাঁধের জলে এখানে সোনা ফলত। শীতলবাঁধও শুকিয়েছে, তারাও কোথায় উজাড় হয়ে গেছে…সিধু খুড়োর বয়সের সত্যি গাছপাথর নেই—এখানে সে তাঁতী-ঘর দেখেছে, সে কবেকার কথা!'

মোহিত আরো অনেক কিছু বলে চলে। কিন্তু অমলের কানে যায় কিনা সন্দেহ। অনেকক্ষণ থেকে সে অন্য কিছু একটা ভাবছে।

রাত-পাহারার দলটা ভেঙে গেল। প্রভাত ক'দিনের জন্যে কলকাতায় গেছল। ফিরে এসে একদিন বললে, 'না, রাত-পাহারায় আর কাজ নেই। ও তুলে দাও।'

তাই হ'ল। রাত-পাহারার বদলে সন্ধ্যে-সকাল চৌধুরী বাড়ির বৈঠকখানায় আজকাল আড্ডা বসে।

এক রকম ভালোই হয়েছে। শীতের রাত্রে টহল দিয়ে বেড়াতে আর ক'দিন ভালো লাগে? তবে—তবে একটু কথা আছে। ব্যাপারটার আরম্ভ কি থেকে তা অনেকেই জানে, কিন্তু শেষটা সবাই অন্য রকম আশা করেছিল। চৌধুরী বাড়ির ছেলে হয়ে প্রভাত, ভুবন বারুই-এর কাছে হার মেনে পিছিয়ে যাবে এটা কেউ আশা করেনি।

ভুবন বারুই ও তারই মতো আরো জনকয়েককে ক'দিন ধরে রাত-পাহারায় দেখা যাচ্ছিল না। খবর পাঠালেও তারা দেখা করে না। দেখা ক'রে গিয়ে ব'লে এলেও গায়ে মাখে না। জরিমানার ভয়েও না।

সবাই প্রভাতের জন্যেই অপেক্ষা করেছে তারপর। রাত-পাহারার মজলিস

তারই মাথা থেকে বেরিয়েছে। সে-ই গাঁয়ের ইতর ভদ্র সব ঘর থেকে জোয়ান ছেলেদের একত্র করে এই দলটি গড়েছিল। দিনকাল খারাপ, নিজেদের ধন মান প্রাণ নিজেরাই সামলাবার জন্যে তৈরী হতে হবে—এই কথাই সে সকলকে বুঝিয়েছে। গোড়ার দিকে সকলের কাছে সাড়াও পাওয়া গেছে ভালো। খানিকটা লজ্জা, খানিকটা চৌধুরী বাড়ির সম্মান, আর বাকিটা জলখাবারের ঢালাও ব্যবস্থায় কারুরই এ ব্যাপারে উৎসাহের অভাব দেখা যায়নি। তারপর প্রভাত ক'দিনের জন্যে গেছল কলকাতায় ফিরে। তখন থেকেই ভাঙন সুরু। প্রথমে ভুবন বাগ্দই একাই কামাই করলে একদিন। তারপর মাঝি ও তেলীদের যে ক'জন দলে নাম লিখিয়েছিল, একে একে বিশু লোহার ছাড়া সবাই খসে পড়ল। ভুবন বাগ্দই-ই নাকি শোনা গেল তাদের পাণ্ডা। সেই নাকি তাদের বুঝিয়েছে যে বাবুদের সঙ্গে অত দহরম মহরম ভালো নয়। বাবুদের প্রাণে শখ আছে তারা রাত জেগে গায়ে টহল দিয়ে বেড়াক, গরীব ছোটলোকের ছেলেদের তা পোষায় না, ভালোও দেখায় না।

প্রভাত ফিরে এসে সব শোনে। বিভূতির সব বিষয়েই টেক্কা দেওয়া চাই। বললে, 'নেহাত তোমার জন্যেই অপেক্ষা করে আছি, নইলে দু'দিনে সিধে করে দিতে পারতাম। তখনই তোমায় বলেছিলাম ওদের অত আস্কারা দিও না—ওরা কি সেই জাত, লাথির ঢেঁকি কি চড়ে ওঠে!'

প্রভাত এক এক করে সবাইকে একবার ডেকে পাঠালে। ভুবন বাগ্দই ছাড়া সবাই এসে হেঁট মাথায় দেখা করে গেল। তাদের সবার কথাতেই বোঝা গেল হাত-পাহারার জন্যে বিশেষ করে ছোটবাবুর কথায় তারা জান দিতে প্রস্তুত। তবে পঙ্কু তেলীর ক'দিন ধরে জ্বর আসছে রাত্রে, লক্ষ্মণ মাঝি গেছল তার কুটুম বাড়ি, হাবু মাঝির ছোট ছেলেটা যায় যায়……অর্থাৎ সবারই কামাই করবার একটা-না-একটা গুরুতর কারণ আছে।

প্রভাত সব শুনে কিছু না বলেই তাদের বিদেয় করে দিল। বিশু লোহার বললে, 'সব মিছে কথা ছোটবাবু, আপনি কিছু বলেন না তাই ওরাও জো পায়। বড়বাবুর কাছেই ওরা টিট্ থাকে।'

প্রভাত একটু হেসে বললে, 'তবে তুই আসিস্ কেন বলতে পারিস!'

'আজ্ঞে, আমার কথা আলাদা; আমি ত আর নেমকহারাম নই ওদের মতো। সাতপুরুষ আপনাদের খেয়ে মানুষ, আপনাদের সঙ্গে বেইমানি করলে ধর্মে সইবে!'

প্রভাত খুশি হ'ল কিনা বলা যায় না। অমলকে সঙ্গে নিয়ে পরের দিন সে ভুবন বাগ্দি-এর বাড়ি নিজেই গেল।

গাঁয়ের এক প্রান্তে ভুবন বাগ্দি-এর ঘর। অত্যন্ত নীচু একটা কুঁড়ে, পাশে একটা খোলা চালায় ঢেঁকিশাল। ছোট উঠোনটায় দুটো ছাগল বাঁধা। গোটা তিনেক হাঁস তাদের আসতে দেখে উচ্চৈঃস্বরে ডাকতে ডাকতে পাশের জলায় গিয়ে নামল। সেখানে নীচু জমিতে বর্ষার জল এখনো শুকোয় নি। নোংরা উঠোনের মাঝখানে একটা বছরখানেকের হাড়-পাঁজরা বেরুনো লিকলিকে পেট-মোটা ছেলে মাটির ওপরই রোদ্দুরে উপুড় হয়ে শুয়ে আপন মনে খেলা করছে। তার মাথা ও পিঠ ঢেকে একটা ছোট কাপড়ের টুকরো দোলাই-এর মতো করে বাঁধা। তা ছাড়া গায়ে আর তার কিছু নেই। ভুবন আর তার বৌ উঠোনের এক ধারে প্রকাণ্ড একতাল মাটি তৈরী করছিল ঘরের দেওয়াল সারতে। ভুবনের বৌ তাদের দেখে একহাত ঘোমটা দিয়ে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ভুবন একেবারে তটস্থ হয়ে উঠে এল কাদামাখা হাতে। ছোটবাবু নিজে তার বাড়িতে আসবেন এ তার কল্পনার বাইরে। কি করবে সে ভেবেই পায় না।

'কি লজ্জার কথা, আপনি নিজে কেন এলেন ছোটবাবু! আমি ত আজই যাচ্ছিলাম—'

প্রভাত হেসে বললে, 'তাতে আর কি হয়েছে। কিন্তু তোর ব্যাপারটা কি বল ত!'

ভুবন তখন ছোটবাবুর খাতির নিয়েই ব্যস্ত। তাড়াতাড়ি হাত ধুয়ে নীচু দাওয়ার ওপর ঘর থেকে একটা তালপাতার চাটাই এনে পেতে দিয়ে বললে, 'দেখুন ত। আপনাদের কি করে এতে বসতে বলি।'

ছেলেটা তখন নতুন লোক দেখেই বোধ হয় কাঁদতে শুরু করেছে। বৌকে ধমক দিয়ে বললে, 'যা, নিয়ে যা এখান থেকে!'

প্রভাত ও অমল চাটাই-এর ওপর বসবার আগে গামছা দিয়ে চাটাইটা বারকয়েক ঝেড়ে, অকারণ খানিকটা ধুলো উড়িয়ে সে অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে জানালে, 'গরীবের ঘরে টুল চৌকি ত নেই, ছোটবাবুর এখানে বসতে কত কষ্ট হবে।'

প্রভাত সরাসরি আসল কথাটাই আবার পাড়লে, 'তুই কি রাত-পাহারায় আর যাবি না ভুবন?'

অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে মাথা চুলকে ভুবন বললে, 'আজ্ঞে, যাব না কেন? তবে কি না……'

'তবে কি?—'

'আজ্ঞে, ওরা সব কি যে বলছে!'

'কি বলছে? কারা বলছে—বল?'

ভুবন এবার যেন সাহস করে বলেই ফেললে কথাটা, 'আজ্ঞে, সবাই বলছে রাত-পাহারার দলে নাম লেখালে যুদ্ধে যেতে হবে।'

'যুদ্ধে যেতে হবে!—' অমল ও প্রভাত দুজনেই এবার না হেসে পারলে না। —'যুদ্ধে যেতে হবে কি রে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, পুলিশে নাকি সব নাম লিখে নিয়ে যাচ্ছে, দরকার হ'লেই যেখানে খুশি চালান করে দেবে। ওদের এখন অনেক লোক দরকার কিনা।'

এবার তারা হাসতে পারলে না। খানিক গম্ভীরভাবে চুপ করে থেকে প্রভাত বললে, 'তোদের কি আমাদের ওপর কিছু বিশ্বাস নেই, ভুবন! যুদ্ধে যাবার ব্যাপার হ'লে তোদের কাছে আমি কি কথাটা লুকিয়ে রাখতাম!'

'আজ্ঞে না বাবু, তা কি আমরা জানি না?'—ভুবন একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, 'আমি ত সেই কথাই ওদের বলি। বলি, ছোটবাবু কি তেমনি মানুষ যে, ফাঁকি দিয়ে আমাদের যুদ্ধে পাঠাবে। তবু ওরা বলে কি জানেন?'

'কি বলে আবার?' অমলই জিজ্ঞাসা করলে একটু রেগে।

প্রভাত বললে, 'স্পষ্ট করেই কথাটা বলে ফেল, ভুবন।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, বলব বৈকি। আপনার কাছে বলব না ত কার কাছে বলব। ওরা বলে যে, বাবুদের শখ হয়েছে পাহারা দিয়ে বেড়াক, সারাদিন গতর খাটিয়ে আমাদের মিনিমাগ্‌না আবার রাত জেগে টহল দেওয়া কি পোষায়! তা ছাড়া আমাদের কি-ই বা কার আছে যে, পাহারা দিয়ে আগলাতে হবে!'

কথাটা বলে ফেলে ভুবন অত্যন্ত লজ্জিত ভাবে মুখ কাঁচুমাচু করে রইল।

অমল একটু রেগেই জিজ্ঞাসা করতে গেল, '"ওরা ওরা" বলছিস, "ওরা" কারা বল ত?'

প্রভাত কিন্তু সে কথার উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করলে না। অত্যন্ত গম্ভীরমুখে অমলকে নিয়ে সে উঠে গেল।

ভুবন পেছন থেকে বললে, 'আমার কোনো অপরাধ নেবেন না, বাবু। আপনি হুকুম করলে আমি আজই গিয়ে হাজিরে দেব।'

প্রভাত সে কথার কোনো উত্তর দিল না।

সবাই তারপর আশা করেছিল প্রভাত এর একটা বিহিত করবেই। ক'দিন ধরে তাকে যে রকম চিন্তিত দেখা গেছে তাতে সবাই ভেবেছে একটা কিছু মতলব সে নিশ্চয়ই আঁটছে। বলতে গেলে এটা একরকম চৌধুরী বাড়ির অপমান। প্রভাত যত ভালো মানুষই হোক, এ অপমান গায়ে পেতে নেবে না।

কিন্তু সবাইকে অবাক করে প্রভাত একদিন দল ভেঙে দেওয়ার সঙ্কল্প জানিয়েছে। অনেকে আপত্তি জানিয়েছে। বিভূতি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেছে—'ছোটলোকের আস্পর্ধার তাহ'লে আর সীমা থাকবে না। বাবুদের এর পর তারা আর তোয়াক্কা করবে?' প্রভাত কারুর কথায় প্রতিবাদ করেনি, কিন্তু মতও তার বদলায় নি।

প্রভাত সাধারণতঃ কথা বলে অত্যন্ত কম। এ ব্যাপার নিয়ে শুধু একটি মন্তব্য তার মুখে একদিন শোনা গেছে। অমল বুঝি রাত-পাহারার দল সম্বন্ধে কি বলতে গেছল। প্রভাত গম্ভীর মুখে বলেছিল, 'অষ্টধাতু যে আগুনে গ'লে মিশে যায়, খড়ের নুড়ো জালিয়ে তা হয় না। আমার সেইখানেই ভুল হয়েছিল।'

অমল এ সম্বন্ধে আর কোনো কথা কোনদিন বলেনি। প্রভাতের সঙ্গে অনেক বিষয়েই তার গরমিল, কিন্তু তবুও প্রভাতের জন্যে তার মনে খুব উঁচু একটা আসন পাতা আছে। এই একটি মাত্র লোকের কাছে নিজেকে ছোট বলে স্বীকার করতে তার লজ্জা নেই। প্রভাত, চৌধুরী বাড়ির তিন ভাইয়ের সবচেয়ে ছোট এবং সকল দিক দিয়ে সে বাড়ি-ছাড়া। চৌধুরীদের জমিদার হিসাবে বদনাম নেই। তারা বিষয়বুদ্ধিতে পাকা, নরম গরম কি-ভাবে মিশিয়ে সংসারে চলতে হয় তারা জানে। বিশেষ করে বড় ভাই প্রকাশ চৌধুরী—যিনি আজকাল চৌধুরীদের বিষয়-আশয় নিজে দেখেন, গরীবের মা-বাপ বলে তাঁর একটা সুখ্যাতিই আছে। দানধ্যান তাঁর যথেষ্ট, নিজেদের খরচায় গাঁয়ে একটা বাঙলা স্কুল তিনি বসিয়েছেন। বৎসরে বারকয়েক পূজোয় পার্বণে আশপাশের অনাথ আতুর কাঙালীরা শ্যামসুন্দরের মন্দিরের প্রাঙ্গণে পেট ভরে ভালোমন্দ খেয়ে চৌধুরীদের জয়গান করে যায়। মেজ ভাই প্রতাপ চৌধুরী বিলেত থেকে

ব্যারিস্টারী পাস করে এসে কলকাতাতে প্র্যাক্‌টিস করেন, গাঁয়ে পূজা-পার্বণ উৎসবে অনুষ্ঠানে তাঁকে আসতে দেখা যায়। কিন্তু বিলেত-ফেরত হলেও তাঁর এতটুকু সাহেবি নেই, না বেশভূষায় না চালচলনে। গাঁয়ের লোক তাঁর অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ। দেশের বাড়িতে এসে তিনি আত্মীয়-স্বজন, জ্ঞাত-গোত্র সকলের খোঁজ নেন, নিজে থেকে আগে সকলের বাড়িতে গিয়ে দেখা করেন। অদ্ভুত তাঁর স্মরণশক্তি, আশ্চর্য তাঁর সকলের উপর টান। হয়ত রবিদের বাড়ি গেছেন। তারা আসন পেতে দেওয়ার আগেই দাওয়ার ওপর ধুলোয় বসে পড়েন। বাড়ির সকলেই তখন শশব্যস্ত। বড়রা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। ছেলেমেয়েগুলো একদিকে জড় হয়ে হয়ত সসম্ভ্রমে তাঁকে দেখছে, পাতলা ছিপ্‌ছিপে শ্যামবর্ণ একটি ফ্রক-পরা মেয়েকে তার মধ্যে ডেকে আদর করে তিনি বলেন, 'বল্‌ দেখি ভেলী, এবার আমায় পছন্দ হচ্ছে ত! ভালো করে দেখ্‌। বয়সটা আমার সব এবার কলকাতায় ছাটিয়ে এসেছি। চুলগুলো সব কলি-ফেরান।' ভেলী এখন একটু বড় হয়েছে। ঠাট্টার মানে বোঝে। লজ্জায় এতটুকু হয়ে পালাতে পারলে সে বাঁচে। সকলের মধ্যে হাসির ধুম পড়ে যায়। বাবাঃ, মেজবাবুর এতও মনে থাকে! ভেলী রবির ভাগ্নী, সম্পর্কে মেজবাবুর নাতনী। বছর দুই আগে এমনি একদিন এ বাড়িতে বেড়াতে এসে তাকে হাত-পা ছুঁড়ে বায়না করে কাঁদতে দেখে তিনি ঠাট্টা করে বলেছিলেন, 'কাঁদিসনি কাঁদিসনি, তোকে বিয়ে করে নিয়ে যাব দেখ্‌ না।' ভেলী তখন ছ'-সাত বছরের মেয়ে। রাগের মাথায় বলেছিল, 'তোমায় বিয়ে করতে বয়ে গেছে—তুমি ত বুড়ো।' মেজবাবু হেসে বলেছিলেন, 'বটে! আচ্ছা দাঁড়া, এবার কলকাতায় কি রকম বয়স তাড়িয়ে আসি দেখবি।' দু'বছর বাদেও সে কথা মেজবাবুর মনে আছে—ভেলীর নামটা পর্যন্ত।

শুধু কি ভেলী, মেজবাবুর সকলের কথা মনে থাকে—সকলের নাড়ীনক্ষত্রের খবর। প্রত্যেক বার ফিরে যাবার সময় তিনি দুঃখ করে যান, 'নেহাত পেশার দায় তাই, নইলে দেশ ছেড়ে সেই কলকাতা থাকতে কি ভালো লাগে!'

প্রভাত ভায়েদের থেকে একেবারে আলাদা। সেজ ভায়ের মতো মিশুক সে নয়; মানুষকে সহজে আপনার করার কোনো কৌশল সে জানে না, আবার বড় ভাইয়ের মতো স্বাভাবিক দুর্লভ্যতাও তার চারিপাশে নেই। আর দু'ভাই জীবনে ভিন্ন ভিন্ন পথ বেছে নিলেও সুনির্দিষ্ট একটি ধারা অনুসরণ করে এসেছেন।

ওঁরা বংশের প্রাচীন গৌরবের কথা তোলেননি, আধুনিক কালের দাবিকেও অস্বীকার করেননি। পৃথিবীতে ওঁদের জায়গা যে কোথায় এবং ওঁদের সার্থকতা এ কিসে, তা ওঁরা ভালো করেই জানেন। সবশুদ্ধ জড়িয়ে ওঁদের চরিত্র ও জীবনের তাই একটা স্পষ্ট রূপ আছে, কিন্তু প্রভাত যেন এখনও হাতড়ে ফিরছে। মত ও পথ কিছু যে সে বাছাই করে উঠতে পারছে না! তার এই হাতড়ে বেড়ানোর আন্তরিকতাই অনলকে সবচেয়ে মুগ্ধ করে। তার নিজের ভেতরও হয়ত এমনি একটি অনিশ্চয়তার দ্বন্দ্ব আছে। তবে প্রভাতের মতো সে দ্বন্দ্ব এত তীব্র—তার প্রকাশ এমন উগ্র নয়। প্রভাত এ পর্যন্ত অনেক কিছু করেছে এবং যখন করেছে তখন চরম ভাবেই করেছে। সে খদ্দর পরেছে, জেলে গিয়েছে, লাঠি খেয়েছে, তারপর সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে দিনকতক শুধু পড়াশুনায় মন দিয়েছে। কিন্তু কলেজের পড়া বেশী দিন সে করতে পারেনি। আবার নতুন এক প্রেরণা নিয়ে নতুন এক আন্দোলনে নেমে ফ্যাক্টরিতে, কারখানায়, মজুরদের বস্তিতে বস্তিতে বক্তৃতা দিয়ে বেড়িয়েছে, লাঠিগুঁতি মার খেয়েছে ও জেলে গিয়েছে। এবারে জেল থেকে ফিরে সে কিন্তু বদলে গেছে আবার। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অনেকদূর এগিয়েছে। প্রভাত কোনো আন্দোলনে আর যোগ দেয়নি। সুবোধ ছেলের মতো গ্রামে ফিরে গেছে। কিছুদিন আগে সে বাড়ি থেকে টাকা নেওয়া বন্ধ করেছিল। জমিদারীর এক কপর্দক সে স্পর্শ করবেনা এই ছিল নাকি তার পণ। এবার দেখা গেছে সে-সব পাগলামি আর নেই। দাদারা নিশ্চিন্ত হয়েছেন। ওঁরা বুঝেছেন রোগ প্রায় কেটে গেছে। ডাক-পাহারার ভার পরখ করতে একটু আধটু [illegible] বড়বাবু অনন্ত চৌধুরী প্রভাতকেই দিয়েছেন। [illegible] প্রভাত [illegible] দিতে [illegible] মনে মনে হেসেছেন। মাঠ বন ভেঙে সবাইকে একদিন বাঁধা রাস্তা ধরতে হয়।

কিন্তু সত্যি কি প্রভাত চৌধুরী এবার বাঁধা রাস্তায় পা বাড়িয়েছে। আঁকা-বাঁকা [illegible] রাস্তা ঘুরে সে কি শেষ পর্যন্ত চৌধুরীদের রাজপথেই ফিরে মিশবে?

প্রভাত আজকাল শুধু [illegible] নিয়ে এক এক দিন বেড়াতে বেরোয়। সেদিন [illegible] সে আর [illegible]। [illegible] অনেকক্ষণ চুপ করে এক [illegible] উঠে [illegible] হঠাৎ [illegible], [illegible] এই [illegible] গেছে। এ [illegible] কি [illegible]

• [illegible] •

ছিল গাঁয়ের লোকের মনেও নেই।' খানিক বাদে সে আবার বলেছে, 'নতুন ওষুধ যে চালাতে চায়, নিজের ওপর পরীক্ষা করবার সাহস তার আগে চাই।'

অমল প্রভাতের কথার সূত্র ঠিক ধরতে পারেনি, কিন্তু জিজ্ঞাসাও করেনি। ফেরবার পথে সেদিনই বুঝি আবার খিয়া আর তার বাবার সঙ্গে দেখা। নরেশ্বর-বাবু দাঁড়িয়ে পড়ে বলেছিলেন, 'এ ক'দিন তোমায় দেখিনি ত অমল, এখানে ছিলেনা নাকি?'

খিয়া হেসে বলেছিল, 'ছিলেন নিশ্চয়, তবে বোধ হয় সাপের ভয়ে যাননি।'

হ্যাঁ, খিয়াদের সঙ্গে অমলের ইতিমধ্যে আলাপ হয়েছে। সেখানে যাতায়াতও করেছে মাঝে মাঝে। আরো অনেকেই যায় আজকাল। চৌধুরী বাড়ির আড্ডাটাই ক্রমশঃ যেন ভেঙে যাচ্ছে। সামন্ত-ভিটের চালচলন নিয়ে গাঁয়ে অবশ্য বেশ একটু আন্দোলন সুরু হয়েছে,—নরেশ্বরবাবুর ইতিহাস কিছু কিছু আজকাল সবাই জানে। দু'পুরুষ তাঁরা নাকি বর্মায় কাটিয়েছেন, যুদ্ধের জন্যে শেষে বাধ্য হয়েছেন পালিয়ে আসতে। পুরোপুরি বাঙালীও নাকি তাঁরা নন। খিয়ার মা অন্ততঃ বাঙালী ছিলেন না। মেয়েটাও তাই নাকি অমনি বেয়াড়া বেহায়া,—গাঁয়ের ছেলেগুলোর মাথা চিবিয়ে খাচ্ছে। এই হ'ল গাঁয়ের ধারণা। নিজেদের মাথা বাঁচাবার কোনো ব্যাকুলতা কিন্তু ছেলেদের দেখা যায় না। তারা প্রায় সবাই নানা ছুতোয় সেখানে যায়। অমলও গেছে কয়েক বার।

অবশ্য সাপের ভয়ে সেখানে যাওয়া সে বন্ধ করেনি। একদিন আর একটু হ'লে হ'লে একটা খরিশের ঘাড়ে পা দিয়েছিল বটে। সেদিন গল্প করতে করতে একটু রাত হয়ে গেছল, পোড়ো ভিটের পাশ দিয়ে বড় রাস্তায় যাবার পথটা খিয়াই আলো দেখিয়ে এগিয়ে দিতে এসেছিল। অমল একটু সামনে ছিল, খিয়া আলো নিয়ে পেছনে। হঠাৎ খিয়া পেছন থেকে জামা ধরে তাকে সজোরে টেনে চীৎকার করে উঠেছিল, 'সাপ! সাপ!'

বেশ বড় একটা খরিশ। একটা পা বাড়ালেই আর বোধহয় রক্ষা ছিল না। সাপটা রাস্তা পার হয়ে যাচ্ছিল বোধ হয়। আলো দেখে সে স্থির হয়ে গেল।

কয়েকটা উত্তপ্ত মুহূর্ত। খিয়া তাকে সজোরে জড়িয়ে আছে। মুখের মুখোমুখি দ্রুত নিশ্বাস-পতনে খিয়ার বুকের ওঠা-নামা অমল টের পাচ্ছিল, তার সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের সবল হাতুড়ি-পেটার শব্দ; কিন্তু সেটা তার, না খিয়ার—আলাদা করে বোঝা যায় না।

খিয়ার চীৎকারে নরেশ্বর রোয়াকে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কি হয়েছে, কি!'

অমলকে ছেড়ে দিয়ে খিয়া উত্তেজিত ভাবে বর্মী ভাষাতেই বুঝি কি বলেছিল। নরেশ্বর হেসে বলেছিলেন, 'যাক্, চলে গেছে ত, আর ভয় নেই! বাধা পড়েছে যখন, তখন আর একটু বসে যাও, অমল।'

অমল আপত্তি করেনি, ফিরে এসে বলেছিল, 'এরকম জায়গায় বাস করা আপনাদের উচিত নয়। কতকালের পুরোনো পোড়ো বাড়ি, এ ত সাপখোপেরই রাজত্ব—পদে পদে এখানে বিপদ হতে পারে।'

ঠাট্টা করে তারপর বলেছিল, 'তা ছাড়া নরহরি সামন্তর ওপর সাপেদের আক্রোশ ত আছে!'

অকস্মাৎ নরেশ্বরের মুখের চেহারা অদ্ভুত ভাবে বদলে গেছে, গলার স্বর অত্যন্ত কঠিন রুক্ষ হয়ে উঠেছে, 'নরহরির কথা তুমি কি জান?'

কেন যে এই নিরীহ ভালোমানুষের বদমেজাজি বলে প্রথম দুর্নাম রটেছিল অমল যেন বুঝতে পেরেছে। নরেশ্বর কিন্তু পরমুহূর্তেই সামলে নিয়ে হেসে বলেছেন, ' "নরহরির বড়ি" ' থাকতে আমাদের সাপের ভয় কি?'

'নরহরির বড়ির কথা আপনিও শুনেছেন দেখছি!'—অমল একটু আশ্চর্য হয়ে বলেছে, 'কিন্তু জানেন ত, সাপুড়ে ওঝারা যা দেখায় সব বুজরুকি। সাপের বিষের সত্যি কোনো ওষুধ নেই।'

খিয়া হঠাৎ হেসে ফেলেছে; অমল অবাক হয়ে তার দিকে চাইতে হাসি থামিয়ে বলেছে, 'সাপে কামড়ান ভালো নয়, মাঝে মাঝে সাপ দেখা কিন্তু ভালো!'

অমল তারপর যাবার জন্যে উঠে পড়েছে। নরেশ্বর বলেছেন, 'খাতাটা কিন্তু আর একদিন মনে করে এনো ঠিক!'

নরেশ্বরের এখানে এসে এক বাতিক হয়েছে, সামনবেড়ের যত প্রাচীন পরিবারের ইতিহাস সংগ্রহ করা। অমলরা চৌধুরীদের দৌহিত্র বংশ। অমলের প্রপিতামহ ব্রজবিনোদ রায় চৌধুরীবাড়ির প্রথম বৈভব রামদয়াল চৌধুরীর একমাত্র মেয়ের ছেলে। তিনি মাতামহের যা বিষয় পেয়েছিলেন, নিজের চেষ্টায় ও কৃতিত্বে তা বহুগুণ বাড়িয়ে শেষ পর্যন্ত চৌধুরীদেরও নাকি টেক্কা দেবার উপক্রম

করেছিলেন। মাতুলদের সঙ্গে দাঙ্গা-হাঙ্গামা পর্যন্ত তাঁর চলেছিল। কোম্পানীর আমলে তিনি এ অঞ্চলে প্রথম দারোগা হন। অত্যন্ত দুর্দান্ত ছিলেন বলে লোকে তাঁর নাম দিয়েছিল বাঘা বক্সী। কিন্তু শারীরিক বল ও সাহস ছাড়াও তাঁর অনেক গুণ ছিল। তখনকার দিনে তিনি একটি খাতায় প্রতিদিনের খবর লিখে রাখতেন। গাঁয়ের বড় বড় ঘরের কুলজিও তিনি নাকি তৈয়ারী করেছিলেন। অমল প্রাচীন একটা সিন্দুক ঘাঁটতে ঘাঁটতে একদিন সেই রোজনামচা ও কুলজির দুটো ছেঁড়া পাতা পেয়েছিল। নরেশ্বরের কাছে একদিন সে কথা বলায় তিনি অত্যন্ত আগ্রহ-ভরে সেগুলি চেয়েছেন।

খাতা আনবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অমল চলে আসছিল। এবারেও খিরা আলো হাতে তাকে এগিয়ে দিতে গিয়ে হঠাৎ হেসে বলেছিল, 'না, আপনার সঙ্গে যেতে সাহস হয় না। আবার যদি সাপ বেরোয়!'

তারপর সত্যি সত্যি বর্মী চাকরটাকে ডাকিয়ে সে তাকে আলো নিয়ে এগিয়ে দিয়ে আসতে হুকুম করেছিল।

অমল কয়েক পা যেতে-না-যেতেই কিন্তু পিছন থেকে ডেকে বলেছিল, 'শুনুন!'

অমল ফিরে দাঁড়িয়েছিল অবাক হয়ে।

'আমি ভেবেছিলাম যেরকম সাপের ভয়, আজ আপনি এখানেই থাকতে চাইবেন।'

খিরা সোজাসুজি তার মুখের দিকে তাকিয়ে। তার দৃষ্টিতে দুর্বোধ কৌতুকের ঝিলিক। অমল আরক্ত মুখে কিছু না বলেই চলে এসেছিল।

চাতক পাখীদের ডানা অক্লান্ত। ঝাঁকে ঝাঁকে শুধু যেন আকাশ ফেনিয়ে তোলার উল্লাসে ধনুকের মতো বাঁকান পাখায় তারা শূন্যে অবিরাম চক্কর দেয় পরস্পরের পিছু পিছু। এ যেন মূক পাখায় ছন্দে অপরূপ সন্ধ্যাবন্দনা।

সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমশঃ আরো গাঢ় হয়ে আসে। চাতক পাখীর ঝাঁকও একে একে চৌধুরী বাড়ির রাসমঞ্চের ওপরকার চূড়ার ফোকরে অদৃশ্য হয়ে যায়।

গাঢ় অন্ধকারে এখানে সেখানে একটা-দুটো জোনাকি যেন রাত্রির হৃৎস্পন্দনের মতো দপ্ দপ্ করে। কোথায় দূরে, থেকে থেকে বাউরী পাড়ার ঢোলকের শব্দ। 'কারা—কারা-কারা'—কার হাঁস বুঝি এখনো ঘরে ফেরেনি সে ডেকে সারা হচ্ছে। সে সমস্ত শব্দও গাঢ় নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার ধীরে ধীরে যেন শুষে নেয়। অনেকক্ষণ

বসে ছাদের ওপর অমল একা। সুদূর ছায়াপথ থেকে যেন একটা অস্ফুট দীর্ঘশ্বাস খিড়কী পুকুরের অশথগাছের পাতাগুলোকে একটু কাঁপিয়ে চলে যায়……

মঞ্জরী আলো নিয়ে ওপরে উঠে এসেছে,—'তুমি অন্ধকারে ছাদে বসে আছ, আর আমি খুঁজে সারা হচ্ছি। কি ব্যাপার বলো ত! খেতে যেতে হবে না?'

মঞ্জরী আলোটা নামিয়ে রাখে। নামহীন বেদনার বিরাট সীমাহীন রাত্রি ওই আলোয়-ঘেরা ছাদটুকুতে আবার সঙ্কুচিত হয়ে আসে।

'চ, যাচ্ছি'—বলে অমল উঠে পড়ে। সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি দিয়ে মঞ্জরী আগে আগে আলো দেখাতে দেখাতে নামে।

'মাথায় তুই কি তেল মাখিস বল ত?'—অমল জিজ্ঞাসা করে।

'কি আর মাখব, যা যখন পাই।'

'আচ্ছা, এবার একটা ভালো তেল তোকে এনে দেব'—অমল কথা দেয়।

সিধু খুড়ো এক এক দিন হঠাৎ চৌধুরী বাড়ির আড্ডাতে এসে হাজির হয়ে বলে, 'দে দেখি একটা খবরের কাগজ, যুদ্ধটার কি হ'ল দেখি।'

বিভূতি হয়ত হেসে বললে, 'যুদ্ধের আর কাগজে কি দেখবে সিধু খুড়ো, চোখেই দেখতে পাবে এবার।'

সিধু খুড়ো অন্যমনস্কভাবে খানিক একদিকে তাকিয়ে থেকে বলে, 'কিন্তু যুদ্ধ আমি করব না।'

সবাই এবার হেসে ওঠে।

'সে কি কথা, সিধু খুড়ো! তুমি না যুদ্ধ করলে আমাদের উপায় কি!'

'না,—যুদ্ধ আমি কিছুতেই করব না।' সবেগে মাথা নেড়ে সিধু খুড়ো হঠাৎ উঠে চলে যায়। খবরের কাগজের কথা তার মনেই নেই।

সবাই হাসতে থাকে। বাইরে খানিক বাদে যথারীতি সিধু খুড়োর বেসুরো গান শোনা যায়:

> যতই খোঁচা দিস্-না কেন—
> কিছুতে করব না লড়াই,
> এমন হারা হারব এবার
> ভাঙবে তোর ওই জোরের বড়াই।

রবিই বুঝি হেসে বলে, 'যাক্, সিধু খুড়োর একটা গানের তবু মানে পাওয়া গেল।'

সিধু খুড়োর খুব কম গানেরই কিন্তু মানে পাওয়া যায়। কোনদিন হয়ত সে সন্ধ্যাবেলা অমলদের বার-বাড়িতেই একটা শালপাতার পাত পেতে নিয়ে বসে। প্রতিদিন কোনো-না-কোনো বাড়িতে এমনি পাত পেতে বসা তার দস্তুর। পাতটা সে নিজেই যত্ন করে সুষপোডাঙা থেকে শালপাতা কুড়িয়ে তৈরী করে আনে, কিন্তু মুখ ফুটে কোথাও খাবার কথা বলতে কেউ তাকে শোনেনি। বেশীর ভাগ বাড়ি থেকেই তাকে ফিরতে হয় না। অনেকে ভয়ে-ভক্তিতে বেশ একটু যত্ন করেই খাওয়ায়—মঞ্জরী তাদের মধ্যে একজন।

খেতে খেতে সিধু খুড়ো বলে, 'একটা নতুন গান বেঁধেছি, শুনবি?'

জবাবের অপেক্ষা না করেই সে গান ধরে :

হাত বাড়ালে পাতে ভাত,
পা বাড়ালে রাস্তা,
পিঠ দেখালেই চাবুক দিয়ে
চাপাস্ চিনির বস্তা।
—কি তোর আজব বিধান!...

কুমোর পোকাটা মুখে মাটি নিয়ে জানলার পাল্লা থেকে কড়িকাঠ পর্যন্ত চারিদিকে বাসা বাঁধবার জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছে। শীত যায় যায়, তারই খবর এই প্রথম কুমোর পোকার গুঞ্জনে। খিড়কী পুকুরের অশথ গাছটার শুকনো ঝরা পাতায় ঘরদোর উঠোন ছেয়ে গেল। ক'টা পাতা ঘুরতে ঘুরতে অমলের ঘরেই এসে পড়ে। শীতের দিন সত্যি ফুরিয়ে এসেছে। সুষপোডাঙা থেকে এখনই দুপুরে মাঝে মাঝে কেমন একটা উন্মনা দমকা হাওয়া এসে সব কিছু নাড়া দিয়ে যায়।

গাঁয়ে অনেক কিছু হয়ে গেছে এরই মধ্যে। মোহিত একদিন পালিয়ে গেছে কলকাতায়। স্যাকরা বাড়ি থেকে মঞ্জরীর চুড়ি ক'গাছা পালিশ করিয়ে আনতে গিয়ে আর ফেরেনি। কি বিপদই না হয়েছিল! সেই রাত্রেই মঞ্জরীর বিয়ে। অমলের মা নিজের চুড়ি ক'গাছা খুলে দিয়েছিলেন। এমন বিয়ের সম্বন্ধটা নইলে ভেঙে যাবে। অমলের মার মন সত্যি অনেক উঁচু।

মঞ্জরীর বিয়ে হ'ল ভারী আশ্চর্যভাবে। সকালবেলাও কেউ কিছু জানে না। মঞ্জরী প্রতিদিনের মতো সংসারের সমস্ত কাজকর্ম করেছে—গাই দুয়েছে, ভাঁড়ার

যার করেছে, সবাইকে চা জলখাবার করে খাইয়েছে, সরকারী পুকুরের মাছের ভাগ বুঝে নিয়েছে, হেঁসেলে রান্নায় বসেছে।

কুমুদ ডাক্তারের মেয়ে মমতার সেইদিনই বিয়ে। মমতা মঞ্জরীর ছেলেবেলার সই। দুপুরে সকলের খাওয়া-দাওয়া হ'লে মঞ্জরী বিয়ের কনেকে দেখতে গেছল। ঘণ্টাখানেক বাদে নিজেই তাকে বিয়ের কনে হতে হবে কে জানত!

পাড়াগাঁয়ের বিয়ে। বরপক্ষ আগের দিন রাত্রেই গ্রামে এসেছিল। অমলদের বার-দালানেই তাদের থাকতে দেওয়া হয়েছে। বরপক্ষে কর্তা হয়ে এসেছিলেন বরের এক বড় জ্যাঠতুত ভাই। একটু বয়স হয়েছে। প্রথম স্ত্রী মারা যাবার পর অনেক পেড়াপীড়িতেও আর বিয়ে করেননি। আত্মীয়-স্বজন একরকম আশা ছেড়েই দিয়েছিল তাঁকে রাজী করাবার। মঞ্জরীর মার অবস্থা সবাই জানে। তার ওপর দয়া করে কুমুদ ডাক্তার নিজেই বুঝি গরীবের মেয়েকে উদ্ধার করবার জন্যে অনুরোধ করেছিলেন—নেহাত ভাসা ভাসা অনুরোধ। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, ভদ্রলোক এক কথায় রাজী হয়ে গেছেন। মঞ্জরীকে ইতিমধ্যে তিনি কুমুদ ডাক্তারের বাড়ি যাতায়াত করতে দেখেছিলেন কিনা কে জানে, কিন্তু মেয়ে দেখবারও তিনি নাম করেন নি।

মোহিত গয়না নিয়ে ফিরে না আসায় বেশ একটু গোল বেধেছিল অবশ্য। কিন্তু অমলের মার অনুগ্রহে সব ঠিক হয়ে গেছে। বিয়ের পরদিনই মঞ্জরী চলে গেছে স্বামীর সঙ্গে। তার সই মমতা শশুরবাড়ি যেতে কেঁদে ভাসিয়েছে, কিন্তু মঞ্জরীর চোখে একফোঁটা জল কেউ দেখেনি। তবু মমতার ত বলতে গেলে কাছেই শশুরঘর। একদিনে যাওয়া-আসা হয়। আর মঞ্জরীর স্বামী চাকুরি করে সুদূর বিদেশে—সেই আসামে কোন্ চায়ের বাগানে। কালেভদ্রেও কখনো আসতে পারবে কিনা সন্দেহ। সবাই অবাক হয়ে গেছে তাই মঞ্জরীর ব্যবহারে। এ সংসারে পাখীটা পোকাটা পর্যন্ত যার অত আপনার ছিল সে অমন করে সব মায়া একমুহূর্তে কাটায় কি করে!

আর সকলের সঙ্গে যাবার সময় অমলকেও মঞ্জরী প্রণাম করে গেছল; পায়ের ধুলো নিয়ে হেসে বলেছিল, 'তোমার কাছে আমার একটা কিন্তু পাওনা আছে, অমলদা!'

অমল হেসে বলেছিল, 'খুব হিসেবী মেয়ে ত। যাবার আগে যত পাওনাগণ্ডা বুঝি বুঝে নিচ্ছিস্! কি আবার পাওনা ছিল তোর?'

● প্রেমেন্দ্র মিত্র ●

'একটা মাথার তেল। মনে আছে বোধ হয় ?'

অমল হেসে ফেলেছিল, 'আচ্ছা, খুব লজ্জা দিয়েছিস্! সত্যি একেবারে ভুলে গেছলাম।'

'মনে করিয়ে দিলাম, এখন একটা কিনে পাঠাবে ত !'

অমল সকৌতুকে বলেছে, 'তেল কিনে পাঠাব সেই আসামে! আমি তেল না পাঠালে তুই রুক্ষু চুলে থাকবি নাকি !'

'তাই যদি থাকি !—' বলে হেসে মঞ্জরী চলে গেছল।

গাঁয়ের আরো নতুন খবর আছে বইকি! বিভূতি ঘোষ বসে থাকবার ছেলে নয়। সে একটা বিড়ির ফ্যাক্টরি করেছে গাঁয়ে। খুব ভালোই চালাচ্ছে। মানি, বাউরীর ছেলেগুলোর একটা হিল্লে হয়েছে। ক্ষেত-খামারের কাজে এখন তাদের পাওয়া দায়। রঙীন গেঞ্জি পরে বিড়ি ফ্যাক্টরির আটচালায় বিড়ি পাকানই তারা পছন্দ করে বেশী। সিধু খুড়োকে কিছুদিন থেকে আর দেখা যাচ্ছে না। ক'দিন আগে তার এক নতুন পাগলামি হয়েছিল,—যখন তখন 'পেয়েছি! পেয়েছি!' বলে চীৎকার করা। তারপর সে একেবারে নিরুদ্দেশ।

আরো খবর আছে। চৌধুরীদের নামে থিয়ার বাবা নরেশ্বর মামলা করেছেন, শীতলবাঁধের স্বত্ব দাবি করে। তিনিই নাকি সামন্তদের শেষ বংশধর।

অমলরা বোধহয় সামনবেড়ে ছেড়ে আবার কলকাতায় ফিরে যাবে। ব্রজবিনোদ রায়ের রোজনামচার ছেঁড়া খাতাটা মোহিতকে দিয়ে অনেকদিন আগে নরেশ্বরবাবুর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল। সেগুলো ফিরিয়ে আনতে একদিন থিয়াদের বাড়ি যাবে ভেবেছিল, কিন্তু আর এখন যাওয়া চলে না।

এক অমানুষিক আত্মত্যাগ

খবরের কাগজ যাঁহারা নিয়মিতভাবে পড়িয়া থাকেন তাঁহাদের বোধ হয় স্মরণ আছে যে, ১৩৪৫ সালের ৩রা ভাদ্র তারিখের বঙ্গবাণী পত্রিকার সাতের পাতায় তৃতীয় কলমের ৩০ লাইন পরে একটি বিস্ময়কর সংবাদ বাহির হইয়াছিল। স্মরণশক্তি যাঁহাদের সবল নয় তাঁহাদের জন্য উক্ত সংবাদটি এখানে যথাযথভাবে আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :

"গৌহাটি নগরে বিষম চাঞ্চল্য

রাজপথে ব্যাঘ্রের আবির্ভাব

গতকল্য সন্ধ্যার পর কেমন করিয়া একটি বৃহদাকার ব্যাঘ্র নগরের ভিতর প্রবেশ লাভ করে। অনেক রাত্রি পর্যন্ত সহরের নানাস্থানে বহু ব্যক্তি তাহাকে দেখিয়া ভীত হয়। ব্যাঘ্রটিও সহরের ভিতর হইতে বাহির হইবার পথ খুঁজিয়া না পাইয়া স্থান হইতে স্থানান্তরে উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়! সকাল বেলা জনৈক শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীর বাড়ির নিকট দিয়া যাইবার সময় উক্ত ভদ্রলোকের বন্দুকের গুলীতে তাহার ভবলীলা সাঙ্গ হইয়াছে। সুখের বিষয় নগরের কোনো ব্যক্তির তাহার দ্বারা কোনো অনিষ্ট হয় নাই। ২রা ভাদ্র, গৌহাটি।"

বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকেরা একবাক্যে চিরকাল প্রচার করিয়া আসিতেছেন যে, নিশ্চয় কোনো ঘটনাই অকারণ বা নিরর্থক নয়। সুতরাং গৌহাটি শহরে এই ব্যাঘ্ররাজের আবির্ভাবেরও কোনো-না-কোনো দিক দিয়া নিশ্চয়ই প্রয়োজন ছিল।

সে প্রয়োজন যে কি তাহা বুঝিবার পূর্বে কিন্তু আমাদের আজনাথের জীবন-বৃত্তান্ত কিছু জানা আবশ্যক।

আজনাথ কিন্তু শতাব্দী অপেক্ষা বয়সে বছর আষ্টেকের ছোট হইলেও কল্পনায় চিন্তায় তাহাকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। আগামী বর্ষের মোটরকারের মডেল অপেক্ষাও সে ঝকঝকে, তকতকে, আধুনিক; কলিকাতা নগরীতে এমন কোনো সভা-সমিতি বা সম্মিলনী হয় না যেখানে আজনাথকে তাহার রূপা-বাঁধানো ছড়ি, গগল্‌স চশমা ও বাহারী চাদর সমেত দেখা না যায়। তাহার কবিতা বাংলার প্রায় সমস্ত মাসিকেরই পাদপূরণ করিয়া থাকে এবং এদেশের যে-কোনো [illegible]

পত্রিকা খুলিলেই দেখা যায় আশুনাথের রচিত গল্প তাহার গৌরবর্ধন করিতেছে।

ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিবার পূর্বে আশুনাথ কখনও ইলেকট্রিক লাইট দেখে নাই এবং তাহাদের পদ্মাতীরস্থ গ্রামের মৈমু-মাঝির 'গহনা'র নৌকা ছাড়া কোনো বাহন ব্যবহার করে নাই। সেই জন্যই কলেজে পড়িবার জন্য প্রথম কলিকাতায় আসিয়া আশুনাথ শহরের ঐশ্বর্যে ও আড়ম্বরে একেবারে অভিভূত হইয়া গেল। এবং দুই বৎসরের মধ্যে আশুনাথকে আর চিনিবার উপায় রহিল না। পরিবর্তন যে শুধু তাহার বেশভূষায় ও আচরণে ঘটিল তাহা নয়, তাহার মনোজগতেও সমস্ত ওলট-পালট হইয়া গেল। আশুনাথের সে উৎকট উৎকর্ষের পরিচয় কিন্তু আমরা দিতে অক্ষম, পাঠকদের অনুমানের উপরই তাহা ছাড়িয়া দিলাম।

কলেজে পড়িতে আসিয়া প্রথম প্রথম আশুনাথ ছুটিতে দেশে যাইত, কিন্তু ক্রমশঃ দেখা গেল কলিকাতাতে তাহার কাজ এত বেশী যে দেশে যাইবার তাহার অবসর নাই। অন্ততঃ মা চিঠির পর চিঠিতে তাহাকে আসিতে লিখিয়া ওই কথাই জবাব পাইতেন।

আশুনাথের দেশের প্রতি বিরাগের কারণ ছিল। তাহার পিতা সেকেলে লোক, একালের প্রয়োজনে ছেলেকে লেখাপড়া শিখিতে দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার রীতিনীতির পরিবর্তন সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন না।

আশুনাথ যতবড় আধুনিকই হোক না, রাশভারী পিতার মুখের উপর কথা কহিবার সাহস সঞ্চয় করিতে পারে নাই। দেশে গিয়া তাহার নব্য রুচি ও মতামত প্রতিক্ষণেই ক্ষুণ্ণ হইত।

সেখানে সকালে গৃহদেবতা শ্যামসুন্দরের পূজার আগে আহার নিষেধ। সেখানে রাতদিন জামা গায় দিয়া থাকা অনাবশ্যক বিলাস, সেখানে পানীয় হিসাবে চায়ের কোনো মূল্য নাই এবং সেখানে জুতোর স্থান একমাত্র বাহিরের ঘরে। শুধু তাই নয়, সেখানে নিত্য-নিয়মিত ভাবে গৃহের পুরোহিতকে প্রতিদিন প্রণাম করিয়া প্রসাদ লইতে হয়।

আজকালকার দিনে কোনো সংসারের এমন নিষ্ঠার কথা শুনিলে যদি বাড়াবাড়ি মনে হয় তাহা হইলে আমরা নাচার। আশুনাথের পিতৃভাগ্য এমনি।

দেশে থাকিতে আশুনাথ এ-সমস্ত বিধি-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে পারে না। সেজন্য এ-সমস্ত এড়াইবার সহজ উপায়স্বরূপ সে দেশে যাওয়াই বন্ধ করিয়াছে।

আশুনাথ কয়েক বৎসর এমনি করিয়া কলিকাতায় থাকিয়া আধুনিকতা খানিকটা আহরণ করিল, বিদ্যাটা তেমন করিয়া পারিল না। বি. এ. পরীক্ষায় বার দুই ফেল করিয়া আরো পৃথিবীর অনেক বড় বড় মনীষীর মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মূল্য সম্বন্ধে সে বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিল।

কিন্তু লেখাপড়া ছাড়িলে সঙ্গে সঙ্গে পিতার প্রদত্ত মাসহারার আশা ও কলিকাতায় থাকাও ছাড়িতে হয়, এ কথা আশুনাথ জানিত। উপায়ও সে একটা করিল। ইতিপূর্বে খ্যাত অখ্যাত নানা মাসিকে ও সাপ্তাহিকে বাঙলা সাহিত্যকে কয়েক যুগ আগাইয়া দিবার সে বিস্তর চেষ্টা করিয়াছে—তাহারই জোরে একটি বাঙলা কাগজে তাহার কাজ জুটিয়া গেল। এবং সংবাদটা আশুনাথের ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক কোনো রকমে দেশে পৌঁছিল।

পুত্রের চাকরির সংবাদে খুশি হওয়া দূরে থাক পিতা পত্রে লিখিলেন, 'তোমার লেখাপড়া ছাড়িয়া দেওয়ার সংবাদে দুঃখিত হইলাম। যাহাই হউক এই পত্র পাওয়ামাত্র দেশে চলিয়া আসিবে। তোমার চাকরির কোনো প্রয়োজন নাই। এখনও রায় পরিবারের যাহা আছে তাহাতে তাহাদের বংশের কাহাকেও চাকরি করিতে হইবে না।' মাতা সে চিঠির সঙ্গে একটি ছোট কাগজে লিখিয়া পাঠাইলেন, 'তোমার বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক করিয়াছি। কলিকাতায় আর তোমার থাকিবার দরকার নাই।'

বলা বাহুল্য আশুনাথ কোনও পত্র পাইয়াই খুশি হইতে পারিল না। চাকরি করার প্রয়োজন না থাকিলেও কলিকাতায় বাস তাহার না করিলেই নয়। দেশে সাচ্ছল্য ও স্বাচ্ছন্দ্য যাহাই থাক, তাহার মনের উৎকর্ষের উপযোগী চিন্তা ও স্ফূর্তির আবহাওয়া নাই। সেখানে সে কোনো মতেই আর বাস করিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, জীবনের সঙ্গিনীরূপে যে মানসীকে সে এতদিন ধরিয়া সৃষ্টি করিয়াছে, মাতার পছন্দ-করা পাড়াগেঁয়ে মল ও নোলক পরা মেয়ের সহিত তাহার কোনো দিক হইতে মিল হইবে না, সে জানে। আশুনাথ নানা রকম ওজর আপত্তি তুলিয়া দেশে যাওয়া ও আসন্ন বিবাহ, উভয় বিপদই কোনরকমে ঠেকাইয়া রাখিল। কিন্তু বেশীদিন এমন করা চলিল না।

মাতার সাংঘাতিক অসুখের তার পাইয়া আশুনাথ দেশে গিয়া দেখিল বিবাহের আয়োজন চলিতেছে।

এই প্রবঞ্চনায় আশুনাথ চটিল, কিন্তু পিতার সামনা-সামনি প্রতিবাদ করিতে সাহস করিল না। বিবাহ তাহার হইয়া গেল।

যেমনই হোক বিবাহের রাত্রের বোধহয় একটা নেশা আছে। নিজের অনিচ্ছা-সত্ত্বেও বিবাহ করিতে বাধ্য হইলেও আত্মনাথের আগাগোড়া ব্যাপারটা খুব খারাপ লাগিতেছিল বলা যায় না। শুভদৃষ্টির সময় মেয়েটিকে অত্যন্ত কঠোর সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখিয়াও চেহারায় খুঁত সে বিশেষ বাহির করিতে পারে নাই। শেষ পর্যন্ত হয়ত সব ভালোই হইত কিন্তু বাসরঘরে শ্যালিকা-সম্পর্কীয়া গ্রাম্য মেয়েরা তাহার মেজাজ একেবারে চটাইয়া দিল। বাঙলার আধুনিক চিন্তা ও শিল্পজগতের একজন উদীয়মান দিক্‌পালের কোনো সম্মান তাহারা রাখিল না। নানাপ্রকার অসভ্য, অভদ্র, ইতরজনোচিত রসিকতা করিয়া তাহাকে একেবারে নাকাল করিয়া তুলিল। ইহার উপর আবার তাহার নববিবাহিতা বধূ নীলিমা একসঙ্গে তাহার লাঞ্ছনায় ঘোমটার তলাতেও হাসি চাপিতে না পারিয়া তাহার মন একেবারে বিষ করিয়া দিল।

নীলিমার ভাগ্য মন্দ। ফুলশয্যার রাত্রে স্বামী তাহার সহিত কথা-ই কহিল না এবং তাহার পরদিন যখন সে শুনিল যে আত্মনাথ কাহাকেও কিছু না বলিয়া কলিকাতায় পলাইয়া গিয়াছে, তখন তাহার লজ্জা ও দুঃখের অবধি রহিল না।

ইহার পর আর বহুদিন আত্মনাথ ও নীলিমার দেখা হয় নাই। আত্মনাথের পিতা অত্যন্ত তেজস্বী লোক। পুত্রের ব্যবহারে মর্মাহত হইয়া তিনি তাহার মুখদর্শন করিবেন না বলিয়াছেন। আত্মনাথ আর দেশেও যায় নাই। যাইবার তাহার বিশেষ ইচ্ছাও নাই। আত্মনাথ কলিকাতায় না থাকিলে বাঙলার সাহিত্য যে শূন্য হইয়া যায়!

নীলিমার পিতা জামাইকে দেশে আনিবার বিস্তর চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু আত্মনাথের মন গলে নাই। যে সব অসভ্য অশিক্ষিত মেয়েদের হাতে সে অমন অভদ্রভাবে লাঞ্ছিত হইয়াছে, তাহাদেরই অনুরূপ একটি নোলক-পরা গ্রাম্য মেয়ের প্রতি তাহার মনে কোনো করুণা নাই।

ইতিমধ্যে আত্মনাথ ও নীলিমার মধ্যে মাত্র দুইটি চিঠি লেখালেখি হইয়াছিল।

স্বামীর অবহেলায় অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া লজ্জার মাথা খাইয়া সখীদের অনুরোধে নীলিমা একবার একটি চিঠি লিখিয়াছিল।

আত্মনাথ তাহার উত্তরে যাহা লিখিয়াছিল তাহা আমরা প্রকাশ করিয়া দিলাম।

আত্তনাথ লিখিয়াছিল, 'তোমার চিঠি পাইলাম। তুমি আমার পত্রের উপর "শ্রীচরণেষু" কেন লিখিয়াছ বুঝিতে পারিলাম না। তুমি আমার ক্রীতদাসী নয় যে আমার চরণবন্দনা করাই তোমার কাজ। তা ছাড়া আমার শুধু চরণেই তুমি যদি শ্রী দেখিয়া থাক তাহা হইলে আমার পক্ষে সেটা গৌরবের কথা নয়। "শ্রীচরণেষু" বানান করিতেও তুমি ভুল করিয়াছ। তোমার পত্রে বানান ভুল ঐ একটি নয়, আরও যথেষ্ট আছে। ভালো করিয়া লেখাপড়া না শিখিয়া চিঠি লিখিতে যাওয়া বিড়ম্বনা। আমাকে প্রিয়তম বলিয়া সম্বোধন করিতে তোমার কোন্ সখী শিখাইয়াছে জানিনা, কিন্তু এইটুকু বুঝিতে পারি যে, কোনো সভ্য মেয়ের সহিত তোমাদের পরিচয় হয় নাই। ফুল-আঁকা লাল চিঠির কাগজ ব্যবহার করিতে তোমার লজ্জা হওয়া উচিত ছিল।'

ইহার পর আর তাহারা কেহ কাহাকেও চিঠি লেখে নাই। এমন করিয়া কতদিন যাইত বলা যায় না, কিন্তু ইহার ভিতর গৌহাটিতে বড় গোছের একটি সম্মিলনী বসিল এবং আত্তনাথকে তাহার কাগজের তরফ হইতে বিশেষ সংবাদদাতা-রূপে সেখানে যাইতে হইল।

সম্মিলনী শেষ হইয়াছে। আত্তনাথ কলিকাতায় ফিরিবার জন্য প্রস্তুত, এমন সময় হঠাৎ রাস্তায় আশ্চর্যভাবে তাহার শ্বশুরমহাশয়ের সঙ্গে দেখা। শ্বশুরমহাশয়—আকাশের চাঁদ হঠাৎ ধূলির ধরণীতে নামিয়া আসিয়াছে—এমনি ভাব দেখাইয়া বলিলেন, 'তুমি এখানে? ক'টার ট্রেনে এলে? আজ বড্ড জরুরী কাজে একটু সকালে বেরুতে হয়েছিল, নইলে দেখা হয়ে যেত—'

সে তাহাদের বাড়িতেই আসিয়াছে, এমন ভুল করার ধৃষ্টতার জন্য শ্বশুরের উপর চটিয়া আত্তনাথ গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, 'আমি আজ আসিনি, আমি যাচ্ছি; এখানকার সম্মিলনীতে এসেছিলাম গত রবিবার।'

পলকের মধ্যে শ্বশুরের মুখে গভীর পরিবর্তন দেখা গেল। অত্যন্ত ক্ষুণ্ণস্বরে তিনি বলিলেন, 'এখানে এতদিন এসেছ, আর আমাদের সঙ্গে দেখা করনি?'

আত্তনাথ এবার সত্য কথাই বলিল, 'আপনারা এখানে এসেছেন তা কেমন করে জানব?'

'বাঃ, আমি যে এখানে বদলি হয়েছি আজ তিনমাস তা জানতে না?'

না জানিবারই কথা। গত কয়েকমাস শ্বশুরবাড়ির চিঠির প্রতি বিশেষ মনোযোগ সে দেয় নাই। আত্তনাথ চুপ করিয়া রহিল।

শ্বশুরমহাশয় বলিলেন, 'বেশ, এখন ত জানলে, আজ আর না দেখা করে যেতে পারবে না।'

একা থাকিলে রূঢ়ভাবে হোক বা যে কোনো রকম ওজর-আপত্তি তুলিয়া হোক আশুনাথ এ নিমন্ত্রণ এড়াইয়া আসিতে পারিত। কিন্তু সঙ্গে কলিকাতার জন দুই বন্ধু ছিল। ইহাদের কাছে তাহার বিবাহের সংবাদ গোপন করিয়া রাখার জন্য অমনিই সে এখন বেশ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল। শ্বশুরমহাশয়ের ভাবগতিক দেখিয়া মনে হইল তিনি প্রয়োজন হইলে শেষ অস্ত্র হিসাবে ইহাদের কাছে জামাইয়ের নিদারুণ ঔদাসীন্য সম্বন্ধে অভিযোগ করিতেও পশ্চাৎপদ হইবেন না। আশুনাথ 'না' বলিতেও পারিল না, কিন্তু রাত্তার মাঝে হঠাৎ এমনভাবে আবির্ভূত হইয়া তাহার সমস্ত রহস্য প্রকাশ করিয়া বন্ধুদের কাছে অপ্রস্তুত করিবার জন্য শ্বশুর এবং তাঁহার সমস্ত পরিবারবর্গের উপর বিষম বিদ্বিষ্ট হইয়া উঠিল।

এতদিন বাদে জামাতার আগমনে তাহার আদর-আপ্যায়নের যেরূপ ঘটা হইল তাহাতে আর কিছু না হোক আশুনাথের অহঙ্কার তৃপ্ত হইবার কথা। সাহিত্য-জগতে তাহার মূল্য যে কত তাহার একটা হিসাব আশুনাথ মনে মনে করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু সে মূল্য এখনও পর্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে তাহাকে কেহ দেয় নাই। এই একটি বাড়িতে পৃথিবীর এত লোকের মাঝে তাহার জন্যই এতখানি সম্মান যে জমা হইয়া আছে তাহা জানিতে পারিয়া আশুনাথ হয়ত সম্পূর্ণভাবে খুশিই হইত, কিন্তু সে খুশির মাঝে একটি খুঁত রহিয়া গেল।

বাসরঘরে তাহাকে যাহারা অশেষপ্রকারে লাঞ্ছিত করিয়াছিল তাহাদেরই অধিনায়িকাকে এ বাড়িতে উপস্থিত দেখিয়া তাহার মন দমিয়া গেল। জানা গেল মলিনা সম্পর্কে তাহার স্ত্রীর মামাতো বোন, কয়েকদিনের জন্য এখানে বেড়াইতে আসিয়াছে।

মলিনা প্রথমটা নিরীহ ভালোমানুষটির মতো যেভাবে আসিয়া তাহার সহিত আলাপ করিল তাহাতে আশুনাথের আশঙ্কা অনেকটা দূর হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই নিজের ভুল সে বুঝিতে পারিল।

শ্বশুরের বিস্তর অনুরোধ অনুযোগ সত্ত্বেও জরুরী কাজের অজুহাত দেখাইয়া আশুনাথ, সন্ধ্যার পরই তাহাকে কলিকাতায় যাইবার জন্য ছাড়িয়া দিতে হইবে, এ প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়া লইয়াছিল। জামাতা যদি-বা অনেক কষ্টে একবার আসিয়াছে তাহাকে বেশী থাকিবার জন্য পেড়াপীড়ি করিয়া চটাইতে শ্বশুরমহাশয়ের

সাহস হয় নাই। আশুনাথ নিশ্চিত হইয়াছিল। এমন সময় শাশুড়ী ঠাকরুন প্রসন্নমুখে আসিয়া বলিলেন, 'তোমাকে একবার জিজ্ঞাসা করতে এলাম বাবা, তোমাদের বাড়িতে যে নিয়মের কড়াকড়ি, রাত্রে তুমি মাংস খাবে ত ?'

আশুনাথ অবাক হইয়া বলিল, 'মাংস! রাত্রে ত আমি খাব না, আমায় খানিক বাদে কলকাতা যেতে হবে যে!'

মলিনা সঙ্গেই আসিয়াছিল। শাশুড়ী একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, 'বাঃ, এই যে মলিনা বললে—তুমি থাকতে রাজী হয়েছ।'

আশুনাথকে কোনো কথা বলিবার অবসর না দিয়া মলিনা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, 'আহা, এখন আবার লজ্জা দেখানো হচ্ছে! অত ভণ্ডামি কেন বাপু, এইমাত্র আমায় কি বললে ?'

লজ্জায় রাগে আশুনাথের মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না। মলিনা আবার বলিল, 'তুমি যাও না, পিসিমা। দু'বছর গা-ঢাকা দিয়ে ছিলেন, তাই এখন লজ্জা হয়েছে বুঝতে পারছ না!'

শাশুড়ী ঠাকরুন চলিয়া গেলেন। আশুনাথ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

ফুলশয্যার রাত্রের পর স্বামী-স্ত্রীর এই প্রথম দেখা।

আশুনাথ ঘরে ঢুকিতেই নীলিমা ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। হাসিটি ভারী মিষ্ট। কিন্তু আশুনাথের মন তখন মলিনার শঠতায় তিক্ত হইয়া আছে। নহিলে সে শুধু হাসি নয়, অনেক কিছুই দেখিতে পাইত। দুই বৎসরে নীলিমার শ্রী অনেক ফিরিয়াছে। তাহার বেশভূষায় যে গ্রাম্যতা সম্বন্ধে আশুনাথের বিরূপতা, তাহারও আর কোনো চিহ্ন নাই। ফিকে নীল একটি ব্লাউজের উপর চওড়া কস্তাপাড় শাড়ীটিতে তাহাকে চমৎকার মানাইয়াছে। আশুনাথ কোনো দিকেই নজর না দিয়া গম্ভীর হইয়া খাটের একধারে গিয়া বসিল। কিন্তু স্বামীর ঔদাসীন্যে অভিমান করিবার অবসর আর নীলিমার নাই। এই দুই বৎসরে সে অনেক দুঃখ পাইয়াছে। নিজেই অগ্রসর হইয়া সকাতরে স্বামীর একটা হাত ধরিয়া সে মৃদুস্বরে বলিল, 'তুমি আমার উপর রাগ করেছ ?'

আশুনাথ হাতটা ছাড়াইয়া লইল, উত্তর দিল না। নীলিমার চোখে হঠাৎ জল আসিল, তবু সে নিরস্ত হইল না। আর একবার স্বামীর হাত ধরিয়া সে বলিল, 'আমার কি দোষ বলো ?'

আশুনাথ তিক্তকণ্ঠে বলিল, 'তোমরা সব সমান, ঐ মলিনার ত তুমি বোন।

আর, এরকম লুকোচুরি করে আমায় একদিন ধরে ফেলে খুব লাভ হবে মনে করছ!'

কথাটা বড় রূঢ়। তবু নীলিমা মৃদুকণ্ঠে বলিল, 'দিদির কি দোষ বলো, আমাদের জন্যেই ত করেছে। তোমার নিজের কি একদিন থাকার ইচ্ছে হয় না?'

আশুনাথ গম্ভীর হইয়া বলিল, 'না।'

নীলিমা এবার অত্যন্ত আহত হইল। আজ সে অনেক আশা-কল্পনা স্বামীর দেখা পাইবার জন্য বসিয়া ছিল। শোবার ঘরের কুলঙ্গিতে তাহার বই খাতা সাজানো। এই দুই বৎসর স্বামীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য সে কিভাবে পড়াশুনা করিয়াছে, কতখানি নির্ভুল ও নিখুঁতভাবে লিখিতে শিখিয়াছে, তাহার বড় আশা ছিল সমস্তই সে স্বামীকে দেখাইবে। এই রূঢ় আঘাতে সমস্ত আশা চুরমার হইয়া তাহার একটু রাগই হইল। বলিল, 'তাহ'লে তুমি না থাকলেই ত পারতে।'

স্বরে ঈষৎ কাঠিন্যের পরিচয় পাইয়া আশুনাথ একটু অবাক হইয়া বলিল, 'তাই নাকি!'

নীলিমা আরও কঠিন স্বরে বলিল, 'নিশ্চয়। তোমাকে ত কেউ জোর করে ধরে রাখেনি।'

আশুনাথ বিছানা হইতে উঠিয়া ব্যঙ্গের স্বরে বলিল, 'বটে! আমি ভেবেছিলাম তুমি বুঝি রাখতে চাও।'

নীলিমা বলিয়া ফেলিল, 'আমার দায় পড়েছে!'

'আচ্ছা, তাহ'লে চললাম'—বলিয়া হঠাৎ গট্ গট্ করিয়া দরজার কাছে গিয়া আশুনাথ খিল খুলিয়া ফেলিল। মুখ দিয়া রাগের মাথায় অমন একটা কথা বাহির হইয়া পড়িবে ও তাহার পরিণতি এমন হইবে নীলিমা ভাবে নাই। সে ভীত হইয়া একবার আশুনাথকে বারণ করিতে গেল। কিন্তু 'আর কখনো দেখা হবে না, মনে রেখো' বলিয়া চক্ষের নিমেষে আশুনাথ দরজা খুলিয়া তখনই বাহির হইয়া গেছে।

অন্ধকার রাত। দরজার বাহিরে তারের বেড়ায় ঘেরা একটি বাগান অস্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছিল। বাগানের কাঁকর-দেওয়া পথ খানিকটা পার হইয়া লোহার গেট্।

আশুনাথ অন্ধকারের ভিতর হাতড়াইয়া গেটের হাতল খুঁজিয়া পাইয়া আশ্বস্ত হইয়া দেখিল, গেট্ বন্ধ নয়। কিন্তু গেট্ খুলিতে গিয়া মুস্কিল হইল। অন্ধকারে

মনে হইল, একটা গরুই বোধ হয় গেটের গায়ে হেলান দিয়া শুইয়া আছে ; তাহাকে না উঠাইলে গেট খোলা যায় না।

আশুনাথ গরুটাকে উঠাইবার জন্ত বলিল, 'হেট্ হেট্।' গরুটা তবু উঠিল না। আশুনাথ অসহিষ্ণু হইয়া গেটটা নাড়িয়া তাহার গায়ে আঘাত করিয়া আবার বলিল, 'হেট্ হেট্, ওঠ্ বেটা।'

হঠাৎ গরুটা একটু গা নাড়া দিয়া অদ্ভুত এক আওয়াজ করিল। গরুর গলা হইতে এমন আওয়াজ আশুনাথ কখনও শোনে নাই। একটু বিস্মিত হইয়া আর একবার গেট নাড়া দিতেই গরুটা উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সঙ্গে সঙ্গে আশুনাথের মাথার চুল পর্যন্ত খাড়া হইয়া উঠিল। হাজার অন্ধকার হইলেও গরু কখনও এমন আকৃতি লাভ করিতে পারে না।

যেটুকু সন্দেহ আশুনাথের মনে ছিল, তথাকথিত গরুর আর একটি আওয়াজেই তাহা দূর হইয়া গেল। আর গেট খোলার সমস্ত বাসনা পরিত্যাগ করিয়া একছুটে সে একেবারে বাড়ির রকে গিয়া হাজির। কিন্তু এখন উপায়? যে জানোয়ারটিকে সে গেটের ধারে দেখিয়া আসিয়াছে তাহাকে কল্পনার ছায়ামূর্তি বলিয়া উপেক্ষা করিবার সাহস তাহার নাই। শহরের ভিতর গৃহস্থপল্লীর মাঝখানে বিশালকায় ব্যাঘ্রের আবির্ভাব সাধারণ যুক্তিতে যত অসম্ভবই মনে হোক, নিজের চোখকে সে অবিশ্বাস করে কেমন করিয়া? এ গেটের বাহিরে যাওয়া তাহার পক্ষে আর অসম্ভব। কিন্তু অমন করিয়া তেজ দেখাইয়া চলিয়া আসিবার পর স্ত্রীর ঘরে সে ফিরিবেই বা কেমন করিয়া? কথাগুলি লিখিতে যত বিলম্ব হইল আশুনাথের চিন্তা অবশ্য তাহা অপেক্ষা আগেই শেষ হইয়া গিয়াছে।

বাহিরের গেটের কাছে ভূতপূর্ব গোবৎসের নড়িবার শব্দ পাইয়া আশুনাথ একমুহূর্তে ঘরের ভিতর গিয়া দরজার খিল লাগাইয়া দিল ; তারপর ফিরিয়াই দেখিল, মলিনা তাহার রোরুদ্যমানা স্ত্রীর মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছে।

অবস্থাটা একটু অস্বস্তিকর কিন্তু আশুনাথের আর যাহাই হোক উপস্থিত-বুদ্ধির অভাব ছিল না।

মলিনা তাহার দিকে ফিরিয়া ব্যঙ্গের স্বরে বলিল, 'কিগো বীরপুরুষ, স্ত্রীকে ফেলে পালিয়েছিলে কোথায়?'

সদ্য সদ্য যে ঘটনাটি ঘটিয়া গেছে, বীরপুরুষ সম্বোধনটা সেই ব্যাপারকে লক্ষ্য করিয়া নিশ্চয়ই করা হয় নাই, তবু আশুনাথের বুকটা ছ্যাৎ করিয়া উঠিল।

স্বচক্ষে সে যাহাই দেখিয়া ফিরিয়া আসুক, মলিনার কাছে সে কাহিনী বলিলে তাহার লাঞ্ছনার যে অবধি থাকিবে না—এ কথা সে অনেক আগেই জানে। না, আত্মসম্মান বজায় থাকে এমন একটা ফিরিয়া আসিবার সঙ্গত কারণ তাহার খুঁজিয়া করিতেই হইবে।

মলিনার কথার উত্তরে প্রথমটা সে বোকার মতো একটু হাসিল। কিন্তু আবার বলিল, 'বীরপুরুষ, হাঁপাচ্ছ যে বড়!'

আশুনাথ বলিল, 'তোমরাও ত দেখি কাঁপাচ্ছ।'

'বাঃ, এই যে মুখে কথা ফুটেছে! কিন্তু ছেলেমানুষকে এইরকম করে ভয় দেখানোতে কি বাহাদুরি আছে বাপু? ও ত কেঁদেই সারা! আমি যত বলি,—"কক্ষনো চলে যায়নি, দেখো এক্ষুনি আসবে"—ওর কান্না কি থামে!'

বলা বাহুল্য অকূলে কূল পাইয়া তাহার 'চলিয়া যাওয়ার এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে আশুনাথ বিন্দুমাত্র বিলম্ব করিল না। মনে মনে অদূর ভবিষ্যতে মলিনা মেয়েটি সম্বন্ধে তাহার মতামত যথাসম্ভব সংশোধন করিবে এমন একটা সঙ্কল্পও সে করিয়া ফেলিল। দরজার খিলটা ভালো করিয়া দেওয়া হইয়াছে কিনা আর একবার দেখিয়া তাহার পর সে প্রসন্ন মনে বিছানার ধারে গিয়া বসিল।

সেই এক রাত্রে—স্বামী-স্ত্রীর কি আলাপ হইয়াছিল বলিতে পারি না, কিন্তু দেখা গেল তাহার পরের দিনও আশুনাথের কলিকাতায় যাইবার বিশেষ তাড়া নাই এবং পরের দিনও আশুনাথকে সৌহাটি ত্যাগ না করিতে দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইলাম। এবং নীলিমা, যাত্র 'বোধোদয়' পর্যন্ত পড়িয়া কি করিয়া আশুনাথের কল্পনালোকের রানীকে হার মানাইল তাহা আমাদের সহজবুদ্ধির অতীত।

সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এই যে, এই ক'দিনে তার নিজের খবরের কাগজটা খুলিয়া পড়িবার উৎসাহও আশুনাথের হয় নাই।

তাহাদের দাম্পত্য-জীবনের বিরোধ ঘুচাইবার জন্য যে মহাপ্রাণ ব্যাঘ্র জঙ্গল ছাড়িয়া লোকালয়ে আসিয়া প্রাণ বিসর্জন দিল, তাহাকে সে নিজের বিকৃত কল্পনাপ্রসূত কল্যাণকর বিভীষিকা বলিয়াই আজো জানে।

ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। গভীর রাত্রে স্টীমার কখন ছাড়িয়াছে টের পাই নাই। বিমল পায়ে ঠেলা দিয়া তুলিয়া দিতে ধড়মড় করিয়া জাগিয়া বসিলাম।

অন্ধকারে পায়ের তলায় গভীর জলের আলোড়নের শব্দ—হঠাৎ শুনিলে ভয় হইবার কথা।

স্টীমারের দুই পাশে মাল-বোঝাই গাধাবোট বাঁধা। তাহারা দৃষ্টি একেবারে আড়াল করিয়া আছে। কোনও দিকে চাহিয়া স্টীমার চলিতেছে কিনা বুঝিবার উপায় নাই। শুধু ইঞ্জিনের গতির সঙ্গে বিশাল দারুদেহের কম্পনে ও জলের প্রবল আলোড়ন-শব্দে স্টীমারের বেগ অনুমান করা যায়।

ডেকের উপর আমাদের আসন। আইনমতে ডেকের মাঝখানে একটি উজ্জ্বল হউক ম্লান হউক আলো জ্বলিবার কথা। কিন্তু এদিকের জলপথে শুধু মালপত্রই যাতায়াত করে, মানুষ যে করে না তাহা নয় কিন্তু তাহারা নগণ্য। তাহাদের জন্য সারারাত্রি বাতি খরচ করা কোম্পানি প্রয়োজন মনে করে না।

অন্ধকারে কিছুই দেখিতে না পাইয়া ভারী অস্বস্তি বোধ হইতেছিল। যখন উঠিয়াছিলাম তখন প্রথম রাত্রি। যাত্রীর ভিতর আমরা তখন দুইজনই মাত্র ছিলাম। তাহার পর কতজন উঠিয়াছে কে জানে! অন্ধকারে দূরে অস্পষ্ট গুঞ্জনধ্বনি শোনা যাইতেছিল—মনে হইল হয়ত নূতন যাত্রী আরও পরে উঠিয়া থাকিবে। তাহাদের দেখিতে পাইলেও সময়টা কোনরকমে চরিত্র-পর্যালোচনা করিয়া কাটিতে পারিত। কিন্তু ভিতরে বাহিরে যখন দেখিবার কিছুই নাই তখন অকারণে জাগিয়া বসিয়া কি করিব!

ঘুম হইতে জাগাইয়া তোলার জন্য বিমলকে ধমক দিলাম।

'মিছিমিছি জাগালি কেন বল ত?'

'বাঃ—স্টীমার ছাড়লে জাগিয়ে দিতে বলেছিলে না!'

বলিয়াছিলাম সত্যই। তখন আশা ছিল স্টীমার ছাড়াটা অন্তত একটা রহস্যময় ব্যাপারই হইবে। মনে হইয়াছিল দীপালোক-বিহীন দুই তীরের মধ্য দিয়া ভাসিয়া যাইতে যাইতে ভাগীরথীর অন্ধকার বক্ষ হইতে নিদ্রিত মহানগরীকে

একটা জমকালো রকমের বিদায়-সম্ভাষণ দিয়া যাইব : 'তোমার পাষাণ কারাগারে অনেক ঘুরিয়াছি—প্রস্তর-কঠিন পথে চরণ জর্জরিত হইয়াছে, যেখানে সেখানে মাথা ঠুকিয়াছে—তবু কিছু মিলে নাই। হে উদাসীন নগরী, তাই বিদায় লইলাম!' এমনি সব বড় বড় কথা বুঝি মনের মধ্যে রচনা করিয়াছিলাম। কিন্তু কিছুই হইল না। মহানগরী অত্যন্ত অশ্রদ্ধাভরে আমাদের বিদায় দিয়াছে। জানোয়ারের মতো পিঞ্জরাবদ্ধী হইয়া যাইতে যাইতে কাব্য করা শোভা পায় না।

বলিলাম, 'বলেছিলাম ত, কিন্তু অন্ধকারের ভেতর ভূতের মতো জেগে বসে থেকে কি হবে?'

বিমলের উৎসাহ কিছুতেই ম্লান হয় না। বলিল, 'চলোনা একটু ঘুরে আসি।'

আগেই বলিয়াছি সমস্ত স্টীমার মালপত্রে বোঝাই। তাহার ভিতরে অন্ধকারে পদে পদে হোঁচট খাইতে খাইতে ঘুরিবার বাসনা তখন হইল না। বিমলকে তাহার অন্যায় চঞ্চলতার জন্য একটু ভৎর্সনা করিতে যাইতেছি হঠাৎ চমকিয়া উঠিলাম।

উচ্ছ্বসিত হাসির শব্দ!—জলতরঙ্গের নীচের পর্দা হইতে সর্বোচ্চ পাত্র পর্যন্ত কে যেন দ্রুতবেগে ছড়ি টানিয়া দিয়াছে।

অবশ্য নারীকণ্ঠ, কিন্তু স্বর শুনিয়া মনে হয় বালিকার চাপল্য তাহাতে বেশী।

অন্ধকারে এই কণ্ঠস্বর একেবারে যেন অভিভূত করিয়া দিল। মুগ্ধ মন এই ধ্বনির সাহায্যে সেই মুহূর্তে যে মুখখানি রচনা করিয়া ফেলিল, বাস্তবের সহিত হয়ত তাহা কিছুতেই মিলিবে না, তবু তখনকার মতো তাহার স্নিগ্ধতায় একেবারে আবিষ্ট হইয়া গেলাম।

দ্বিতীয়বার হাস্যধ্বনি উঠিতে-না-উঠিতে মাঝখানে থামিয়া গেল। কে যেন সহসা জোর করিয়া তাহা চাপা দিয়াছে।

উৎসুকভাবে হাস্যধ্বনির পুনরাবৃত্তির জন্য অপেক্ষা করিলাম অনেকক্ষণ, কিন্তু বিশাল পাথর চাপা দিয়া কে বুঝি নির্ঝরিণীর মুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছে। আর কিছুই শোনা গেল না। ব্যাপারটা একটু যেন রহস্যময়, অন্তত স্টীমারের তলায় জলের কল্লোল-শব্দ, নদীবক্ষের অন্ধকার এবং হাস্যধ্বনির আকস্মিক পরিসমাপ্তি আমাদের কাছে তাহাকে রহস্যমণ্ডিত করিয়া দিয়াছিল।

শব্দটা কোন্ দিক হইতে আসিয়াছিল বুঝিতে পারিয়াছিলাম, কিন্তু কিছুই দেখিবার উপায় নাই।

ডেকে আলো না রাখিবার জন্য এইবার সত্যই স্টীমার-কোম্পানির উপর রাগ হইতেছিল।

বিমল আমার মতোই কৌতূহলী হইয়াছে বুঝিলাম। আশ্চর্যের বিষয় স্টীমারটা ঘুরিয়া আসিবার আর সে নাম করিল না। আমার পাশেই নীরবে কম্বলের উপর শুইয়া পড়িল।

খানিক বাদে শুধু সে জিজ্ঞাসা করিল, 'রাত এখন কত?'

মনে মনে হাসিয়া বলিলাম, 'জানি না।'

ভোর হইতেই জাগিয়া উঠিলাম। ফাল্গুন মাস, তবু নদীর প্রবল জোলো হাওয়ায় যেন শীত-শীত করিতেছিল। পাশে বিমলকে দেখিতে পাইলাম না। সে কতক্ষণ উঠিয়া গিয়াছে কে জানে।

ভোরের নীলাভ আলোয় ডেকের সমস্তই এবার দেখা যাইতেছিল। উঠিয়া এদিক ওদিক একবার পায়চারি করিয়া বেড়াইলাম। এ স্টীমারে অধিকাংশই ডেকের যাত্রী। ফার্স্ট ও সেকেণ্ড ক্লাস নামে একটা সুসজ্জিত অংশ আছে কিন্তু সেখানে একটি যাত্রীও হয় না। সে দিকের কাঠের দরজায় তালাবন্ধই থাকে।

বোঝা গেল আমাদের পরে বেশী যাত্রী ওঠে নাই। একটি কৃষক পরিবার একদিকে গোটাকতক কেরোসিন কাঠের বাক্সের পাশে তাহাদের জায়গা করিয়া লইয়াছে। দুইটি পুরুষ, একটি পাঁচ বছরের রুগ্ন শিশু ও একটি বৃদ্ধা। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম তাহারা কাকদ্বীপে নামিয়া যাইবে।

আর একদিকে দুই বৃদ্ধ সাধু সকালবেলাই গঞ্জিকা সেবনের উদ্যোগ করিতেছিল। আমার বেশভূষা দেখিয়াই বোধ হয় সাহস করিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া বসিল। নিমন্ত্রণটা প্রত্যাখ্যান করিতেই হইল।

কি যে খুঁজিতেছিলাম সে কথা গোপন করিবার চেষ্টা করা আর নিষ্ফল। ডেকের নানা জায়গায় স্তূপাকার করিয়া কোথাও বা জিনিস-বোঝাই কেরোসিন কাঠের বাক্স, কোথাও বা ক্যানাস্তারা, কোথাও বা বস্তা রাখা হইয়াছে। সেই মালপত্রের স্তূপের দরুন ডেকের উপর অনেকগুলি নিভৃত কোটর সৃষ্টি হইয়াছে। একদিক হইতে সবগুলি দেখা যায় না। হয়ত কোথাও আনাচে-কানাচে আর কোনো যাত্রী আছে মনে করিয়া আরো একটু বিশদভাবে অনুসন্ধান করিলাম।

কোনো ফল হইল না। অমন রহস্যময় হাস্যধ্বনি তুলিতে পারে এমন কোনো নারী দূরে থাক্ স্টীমারে আর যাত্রী-ই নাই। ব্যাপারটা সত্যই বড় বিস্ময়জনক ঠেকিতেছিল। তাহার উপর সকাল হইতে বিমলটাই বা গেল কোথায়! সমস্ত ডেকে এবং সারেঙের সহিত ভাবসাব করিয়া ইঞ্জিনের দিকটা ঘুরিয়াও তাহার দেখা পাইলাম না।

বিমলের এই ধরনের অন্তর্ধানে সত্যই একটু চিন্তিত হইলাম। এই কয়েক দিনের আলাপে তাহাকে যেটুকু চিনিয়াছি তাহাতে তাহার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। বন্ধু ও সঙ্গী বলিয়া তাহার স্নেহ ভালোবাসা শ্রদ্ধা যতই আমার উপর থাক্-না কেন, মনের খেয়ালের মুহূর্তে আমাকে চিরদিনের মতো ছাড়িয়া যাইতে সে যে এতটুকু দ্বিধা করিবে না, তাহা আমি ভালো রকমই জানি।

তাহার সহিত আলাপ হইয়াছে মাত্র এই কয় মাস। কেমন করিয়া আমার এই ছন্নছাড়া জীবনে সে যে আসিয়া জুটিল তাহা ভাবিলে এখনও বিস্ময় লাগে।

প্রয়াগে কুম্ভমেলা। সকালে স্নান করিবার জন্য মানুষের স্রোতে যখন হইতে মিশিয়াছি তখন হইতে পৃথক সত্তা আর নাই। নিজের ইচ্ছাশক্তি আর প্রয়োগ করিতে হয় না, ভিড়ের ভিতর কোনোপ্রকার চেষ্টা না করিয়াই শুধু চারিদিকের ঠেলায় আমারই মতো বহু স্নানার্থীর সহিত জমাট বাঁধিয়া আগাইয়া চলিয়াছি। স্নান শেষ করিয়া সেই ভাবেই ফিরিতেছিলাম। দু'চোখ যতদূর যায়, দেখা যায় শুধু নরমুণ্ড—যেন লক্ষ-শির একটা বিরাট প্রাণী নড়িতেছে। তাহার দেহ দেখা যায় না।

কপালের ঘাম চোখে আসিয়া পড়িয়া চোখ জ্বালা করিতেছে। হাত তুলিয়া যে ঘামটুকু মুছিব তাহারও উপায় নাই। চারিধারের চাপে দুইটা হাত অস্পৃশ্য হইয়া নিজের গায়ে আঁটিয়া গিয়াছে। যে স্রোতের সঙ্গে আসিয়াছি সেই স্রোতের ভিতরই থাকিতে হইবে। এখনও মাইল-খানেক পথ না পার হইলে মুক্তি নাই।

মানুষের ভিড় শাসনের অতীত হইয়া যাওয়ায় কিছুদূরে শৃঙ্খলা আনিবার জন্য কয়েকটা হাতি ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। সেই হাতির একটা আমাদের দিকে আসিলে কি যে হইবে তাহা ভাবিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেও করিবার কিছু নাই। শামুকের মতো গতিতে যেমন অগ্রসর হইতেছি, তেমনি হইতে হইবে।

সমুদ্র-কল্লোলের মতো অদ্ভুত মানুষের সেই পদধ্বনি ও কণ্ঠস্বরের সম্মিলনের ভিতর হঠাৎ নিকটে অদ্ভুত আওয়াজ শুনিলাম। আর্ত এক ছাগশিশুর চীৎকার।

করে ঘাড় বাঁকাইয়া দেখিলাম আহত এক ছাগশিশুকে দুই হাতে ভিড়ের ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরিয়া একটি যুবক আমারই কিছু পিছনে আসিতেছে। ছাগশিশুটি পথ ভুল করিয়া পুণ্যলোভী এই জনতার মধ্যে কেমন করিয়া আসিয়া পড়িয়াছিল কে জানে! স্নানার্থীদের পদনিষ্পেষণে তাহার অক্ষয় স্বর্গলাভের পথ তৈয়ারী হইয়া গিয়াছে।

সে এক বীভৎস দৃশ্য! পায়ের চাপে তাহার মাথার আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। সামনের দুইটি পা একেবারে ভাঙিয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে। একটা দিকের চোখ আর নাই; খুলির খানিকটা অংশের সহিত উপড়াইয়া গিয়াছে। যায় নাই শুধু প্রাণটুকু। যন্ত্রণায় তাই সে আর্তস্বরে চীৎকার করিতেছিল।

যে ছেলেটি ছাগশিশুকে বহন করিয়া আনিতেছিল তাহার চারিধারে ভিড়ের ভিতরই ভয়ানক গণ্ডগোল সুরু হইয়াছে। ছাগশিশুর মাথার উপর হইতে টপ টপ করিয়া রক্ত সদ্যস্নাত জনতার মাথার উপর পড়িতেছে। তাহারা প্রতিবাদ ত করিবেই। সাধ্য থাকিলে তাহারা ছেলেটিকে সেইখানেই বোধ হয় উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া দিত, কিন্তু জিহ্বা সঞ্চালনের সুযোগ থাকিলেও হাত-পা নাড়া একপ্রকার অসম্ভব।

ভিড়ের ঠেলায় কখনও কখনও ছেলেটি আমার কাছাকাছি আসিয়া আবার সরিয়া যাইতেছিল। একবার সুযোগ পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এটিকে কোথায় পেলে হে?'

ছেলেটি সেই অবস্থাতেই হাসিয়া বলিল, 'এটি পুণ্যফল। কুড়িয়ে পেয়েছি।'

খানিকক্ষণ পাশের একটা ধাক্কা সামলাইতে কথা কহিবার আর অবসর পাইলাম না। আবার একটু সুবিধা হইতেই জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ওর ত স্বর্গলাভের আর বিলম্ব নেই। কেন আর ব'য়ে নিয়ে নিজেকে আর আশেপাশের লোককে কষ্ট দেওয়া!'

ছেলেটি কি বলিল শুনিতে পাইলাম না। যাহাদের গায়ে রক্তের ফোঁটা পড়িয়াছে তাহাদের তীব্রকণ্ঠ ও ছাগশিশুর আর্তনাদে তাহা চাপা পড়িয়া গেল। কিছুক্ষণের জন্য আমি তাহার নিকট হইতে একটু আগাইয়া যাইতেও বাধ্য হইলাম।

আবার যখন দেখা হইল তখন ছাগশিশুর পরমায়ু প্রায় বোধ হয় শেষ হইয়া আসিতেছে। মাথাটা নেতাইয়া পড়িয়াছে, শব্দ করিবার আর তাহার সামর্থ্য নাই।

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম, 'রক্তে যে একেবারে নেয়ে গেছ হে!'

● প্রেমের দিনের ●

ছেলেটির মুখে এবার হাসি নেই। গম্ভীর মুখে বলিল, 'হুঁ, যোগের স্নানটা ভালো করেই হ'ল!' এবার আমরা ভিড়ের নূতন একটা আবর্তনের মাঝে পড়িয়া প্রায় পাশাপাশি আসিয়া পড়িয়াছিলাম। দেখিলাম তাহার মাথায়, মুখে, কাঁধে ছাগশিশুর টাটকা রক্ত পড়িয়া ইতিমধ্যেই জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। অনেকক্ষণ একভাবে উর্ধ্ববাহু হইয়া পশুটিকে বহন করিবার জন্য হাত তাহার কাঁপিতেছিল।

বলিলাম, 'কষ্টও ত খুব কম হচ্ছে না!'

ছেলেটি আমায় অবাক করিয়া দিয়া বলিল, 'এখন বোধ হয় অজ্ঞান হয়ে গেছে; যা যন্ত্রণা পেয়েছে আগে যদি দেখতেন! এতগুলো মানুষের চাপ, একটা হাতি পড়লে থেঁতলে গুঁড়ো হয়ে যায়, আর এ ত একটা বাচ্চা ছাগল। বেটাকে উদ্ধার করতে গিয়ে আর একটু হ'লে আমিই গেছলাম আর কি!'

ইহার পর কোনো কথাই বলিতে পারিলাম না। ছেলেটি খানিক বাদে বলিল, 'আমার চোখের ওপর রক্ত পড়ে চোখটা করকর করছে; ভালো দেখতে পাচ্ছিনে —দেখুন ত একেবারে শেষ হয়ে গেছে কিনা!'

বলিলাম, 'প্রায় হয়ে এসেছে, একটু মুখটা নড়ছে মাত্র।'

ছেলেটি শুধু বলিল, 'একটু যদি জল পেতাম!'

সব দুর্ভোগেরই একটা শেষ আছে। এক জায়গায় আসিয়া ক্রমশঃ ভিড় হালকা হইতে আরম্ভ করিল এবং পরে আরো কিছুদূরে গিয়া যখন দু'ধারে হাত-পা ছড়াইবার জায়গা পাইলাম তখন প্রথমটা মনে হইল, এতবড় সৌভাগ্য মানুষের জীবনে খুব কমই আসিয়াছে।

ছেলেটি ইতিমধ্যে আবার পিছনে পড়িয়া গিয়াছিল। তাহার কথা ভুলিয়াও বুঝি গিয়াছিলাম। হঠাৎ পিছন হইতে কে ডাকিল, 'ও দাদা, চলে যাচ্ছেন যে!'

ফিরিয়া দেখিলাম সেই ছেলেটি। ছাগশিশুটিকে এবার সে বুকের উপর নামাইয়া আমার কাছে আসিয়া হঠাৎ প্রশ্ন করিল, 'কতদূরে থাকেন?'

জানাইলাম যে নিকটেই একটি অস্থায়ী পান্থশালায় কয়েকদিনের মতো থাকিবার স্থান যোগাড় করিয়াছি।

ছেলেটি বলিল, 'তাহ'লে চলুন তাড়াতাড়ি। বেটাকে একটু জলটল দিয়ে দেখি।'

আমার পান্থশালায় আসিয়া ছাগশিশুর জন্য অনেক কিছুই সে করিল, কিন্তু মানার্থীদের চরণস্পর্শের পুণ্যের জোর অনেক বেশী। ছাগশিশুকে অক্ষয় স্বর্গ হইতে কোনোমতেই বঞ্চিত করা গেল না। ছেলেটির হাতের একটু জল পান

করিবার চেষ্টা করিয়া বার দুই পা-গুলি একটু নাড়িয়া চাড়িয়া একেবারে স্থির হইয়া গেল।

বলিলাম, 'যোগের স্নানের পর আর স্নান করতে নেই যে। কিন্তু গা-মা ও মুখ নিয়েই বা থাকবে কি করে?'

ছেলেটি বলিল, 'হুঁঃ, যোগে আর স্নান করা হ'ল কখন? অর্ধেক পথ থেকেই ফিরতে হ'ল যে।'

কথাটা বিশ্বাস করা সহজ নয়। দূর-দূরান্তর হইতে আসিয়া জনসমুদ্রের মাঝে এই নিদারুণ নিগ্রহ সহ্য করিয়া কেহ যে মাঝপথ হইতে শুধু একটা মুমূর্ষু ছাগশিশুর জন্য স্নান শেষ না করিয়া ফিরিতে পারে, ইহা আমার পক্ষে কল্পনা করাও শক্ত। আমার বিস্মিত দৃষ্টি দেখিয়া ছেলেটি একটু হাসিয়া বলিল, 'তা মস্ত বড় একটা কাজ করে ফেলেছি—কি বলেন দাদা? সেই কবে বুদ্ধদেব একবার ছাগলছানার জন্যে সমস্ত জপতপ পুণ্যের সঙ্গে প্রাণটা ফাউ দিতে চেয়েছিলেন, আর এতদিন বাদে আমি কুম্ভমেলার পুণ্যটা হেলায় ছেড়ে দিলাম। প্রাণটাও দিয়াছিলাম আর কি।'

তাহার কথায় হাসিয়া ফেলিয়া তাহার স্নানের বন্দোবস্ত করিবার চেষ্টায় গেলাম।

ছেলেটি সেদিন আমাদের পান্থশালাতেই থাকিয়া গেল। তাহার ভাবগতিক দেখিয়া মনে হইল অবস্থানটিকে দীর্ঘ করিতে তাহার বিশেষ আপত্তি নাই। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম এরকম আশ্রয়হীন হইয়াই সে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—শুধু কুম্ভমেলার এই কয়দিন নয়, আজ ছয় বৎসর ধরিয়া।

তাই বলিয়া তাহার রুচির খুঁত ধরিবার কিছু নাই। পান্থশালার আহারের ও শয়নের ব্যবস্থার অত্যন্ত কঠোর সমালোচনা করিতে ছাড়িল না। রান্নার দোষ ধরিয়া বেশ দু'কথা পাচক ব্রাহ্মণকুমারকে শুনাইয়া দিল এবং আমাকে এক সময় সহজভাবে জানাইল, 'দ্যাখো দাদা, মাংস নইলে আমার খাওয়ার জুৎ হয় না।'

বিমলের সহিত এমন করিয়া পরিচয়। কুম্ভমেলা শেষ হইয়া গেল কিন্তু বিমল আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিবার নাম করিল না। আকার-ইঙ্গিতে তাহাকে আমার অবস্থার কথা ইতিপূর্বে জানাইয়াছি—শীঘ্রই যে আমার এ স্থান পরিত্যাগ করিতে হইবে তাহাও বলিতে ভুলি নাই, কিন্তু বিমল তাহাতে বিচলিত হয় নাই। একদিন আমায় স্পষ্ট বলিয়া দিল, 'তোমার ওসব বৈরাগী কথা-টথা আমায় শুনিয়ো না, দাদা, তোমায় এখন আমি ছাড়ছিনে। আমার ভালো লেগে গেছে।'

ইহার পর আর কথা চলে না। বিমলকে লইয়াই কলিকাতায় ফিরিলাম। হাঙ্গামা অবশ্য কম নয়। নিজের আশ্রয় জোটানই ভার। বিমলকে লইয়া আরো ফাঁপরে পড়িলাম। সে কিন্তু নিশ্চিন্ত নির্বিকার। আশ্রয় ও আহার সংগ্রহের ভার আমার উপর অর্পণ করিয়া সে পরমানন্দে ঘুরিয়া বেড়ায়। ত্রুটি হইলে অনুযোগ করিতেও ছাড়ে না।

দূরসম্পর্কের এক জ্ঞাতির বাড়িতে অনেক কষ্টে আশ্রয় পাইয়াছিলাম। কিন্তু সে আশ্রয় হইতে বঞ্চিত হইতে হইল। তাঁহার গৃহটিকে নগরের যাবতীয় খঞ্জ, আতুর, পশুপক্ষী ও মানুষের পিঁজরাপোল বানাইবার বিমলের যে সাধু ইচ্ছা ছিল তাহা আমার জ্ঞাতি অনুমোদন করিতে পারিলেন না। বিমলের সহিত তাঁহার তুমুল বচসা হইয়া গেল। মহানগরে অন্নসংস্থানের জন্ত উপায়ও এতদিনে খুঁজিয়া পাই নাই। একদিন তাই বিমলকে লইয়া বিদায় হইলাম। তারপর তাহারই অনুরোধ ও আগ্রহাতিশয্যেই এই জলপথে চলিয়াছি।

বিমল সত্যই কোথাও যায় নাই। দুপুরের আগেই তাহার দেখা মিলিল। তাহার অনুপস্থিতিতে রন্ধনের আয়োজন আর করি নাই। দেখিলাম সে নিজেই আহার সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে। খালাসীদের সহিত ভাব করিয়া একছড়া কলা, একটা বড় তরমুজ ও কয়েকটা পেঁপে যোগাড় করিয়াছে। কোথায় ছিল জিজ্ঞাসা করিতে বলিল,—ভোরের বেলা উঠিয়া সে একদিকের একটা গাধাবোটের উপর গিয়া বসিয়াছিল। স্টীমারের তুলনায় সে স্থান যে অত্যন্ত মনোরম তাহাও সে সোৎসাহে জানাইল।

সকালবেলায় নদীর হাওয়ায় কেমন একটু ঠাণ্ডা বোধ হইয়াছিল, এখন তেমনি গরম। নীচে বয়লারের ও উপরে সূর্যদেবের তাপে সমস্ত স্টীমার তাতিয়া আগুন হইয়াছে। শান্ত ঢেউবিহীন বিস্তীর্ণ গঙ্গার জল সূর্যের প্রখর আলোয় জলন্ত ইস্পাতের অপ্রশস্ত পাতের মতো দেখাইতেছে। ডেকের যে কোণ হইতে গাধাবোটের ফাঁক দিয়া বাহিরের দৃশ্য একটু দেখা যায় সেই কোণেই দাঁড়াইয়া ছিলাম। দুই ধারে ঢালু, বন্ধ্যা পাড় দূরের নারিকেল-বনের রেখায় গিয়া মিশিয়াছে। তাহারই ভিতর কোথাও কোথাও ধানের ক্ষেতের ফালি জলের কিনারা ছুঁইয়াছে। ও যেন জীবন-রস ভিক্ষা করিয়া জাহ্নবীর কোলে শ্যামল ধরণীর সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত।

খালাসীদের প্রাদেশিক ভাষাই এতক্ষণ শুনিয়া আসিতেছি, তাহার ভিতর আমাদের দেশের কথা কাছে শুনিতে পাইয়া ফিরিয়া তাকাইলাম। আধাবয়সী স্থূলকায় এক ভদ্রলোক সেকেণ্ড মেট্‌-এর সহিত আলাপ করিতেছিলেন। আমাদের দেখিয়া স্মিতহাস্যে আগাইয়া আসিলেন।

পরিচয় করিয়া জানিলাম তিনিই মালবাবু—দুইটি গাধাবোট তাঁহারই জিম্মায় আছে। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া জলপথেই তাঁহার যাতায়াত চলিতেছে, নদীই তাঁহার ঘরবাড়ি। নাম রামপদ জানিলাম।

তিনি হাসিয়া বলিলেন, 'এ পথে চাষাভুষো ছাড়া বড় একটা কেউ যায় না। আপনাদের দেখে বড় আশ্চর্য হ'লাম।'

বিমল বলিল, 'আমরা যে চাষাভুষো নই, তাই বা কেমন করে জানলেন?'

রামপদবাবু হাসিয়া বলিলেন, 'সে কি আর জানতে বাকি থাকে, মশাই।'

ভদ্রলোক বড় অমায়িক। আমাদের সুবিধা-অসুবিধার খোঁজ লইয়া আপ্যায়িত করিয়া দিলেন। আসিবার সময় চা আনিতে ভুলিয়াছি শুনিয়া বিমলকে তাঁহার ভাণ্ডার হইতে চা আনাইয়া দিবেন বলিয়া আশ্বাসও দিয়া গেলেন।

সামান্য মালবাবু হইলেও দেখিলাম স্টীমারে তাঁহার প্রতিপত্তি খুব বেশী। সারেঙ হইতে নিম্নতম খালাসী পর্যন্ত তাঁহাকে সমীহ করিয়া চলে। তাহার প্রত্যক্ষ কারণ অনেকগুলি। খালাসীদের কাছে শুনিলাম ইংরেজি জানার দরুন সাহেবদের কাছে তাহাদের হইয়া তিনিই দু'-এক কথা বলিয়া থাকেন, সময়ে অসময়ে আবার দরখাস্ত ইত্যাদিও লিখিয়া দেন, দু'-চার টাকা দরকারমতো ধার দিতেও তাঁহার কৃপণতা নাই।

প্রথম দর্শনে লোকটিকে ভালোই লাগিল। রহস্যময় হাসির কথাটা তাঁহাকে প্রায় জিজ্ঞাসা করিয়াই ফেলিয়াছিলাম। কিন্তু কেমন শুনাইবে ভাবিয়া আর পারি নাই।

স্টীমারে আমাদের যথেচ্ছ গতিবিধি। সারেঙের সহিত বেশ ভাব হইয়াছে। সন্ধ্যার পর স্টীমারের উপরকার অবজারভেশন-ব্রিজে গিয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিলাম। দিনের অসহ্য গরমের পর সমস্ত আকাশ জুড়িয়া ঘন মেঘ জমিয়াছে। লোকালয় ফেলিয়া নদী এবার সুন্দরবনের ভিতর দিয়া চলিয়াছে। অন্ধকারে জলে ও সুদূর তীরে প্রায় একাকার মনে হয়। শুধু তৃতীয়ার ক্ষীণ চাঁদ মেঘের আড়ালে পশ্চিমে যেখানে ডুবিতেছে ঘন বনের মাথায়, সেখানে নিভু-নিভু আগুনের মতো

একটু রক্তাভ ছোপ। দিক্‌চক্রবাল-বেরা নিস্তব্ধ নদী ও বনের ভিতর আমরাই বোধ হয় কয়েকজন মাত্র মানুষ। চারিধারে থাকায় অরণ্যে প্রাণিজগতের কি অপরূপ বিচিত্র কাহিনী চলিয়াছে কে জানে! আমাদের ছোট্ট স্টীমারের এই কয়টি কাহিনীও কম বিচিত্র নয়। কিন্তু কোথাও কাহারও যোগ নাই।

বিমল একটু অস্থির হইয়া উঠিতেছিল। খানিক বাদে চাঁদ একেবারে ডুবিয়া যাইবার পর আমাকে আর কিছু দেখিবার নাই বলিয়া জোর করিয়া নামাইয়া লইয়া আসিল।

নীচে আর যাত্রী নাই। সাধুরা ডায়মণ্ড-হারবারের ও কৃষক-পরিবার কাকদ্বীপে নামিয়া গিয়াছে।

বিমল বলিল, 'চলো, মালবাবুর বোটে যাই—তিনি ত চা পাঠালেন না।'

গাধাবোট ও স্টীমারের মাঝে সাধারণ সময়ে পার হইবার কোনো ভেলা থাকে না। তবু বিমলের অনুরোধ এড়ানো গেল না।

গাধাবোটের উপরে গিয়া স্তূপীকৃত মালপত্রের মাঝে পথ খুঁজিয়া মালবাবুর কেবিনের কাছে যখন উপস্থিত হইলাম, তখন দরজা বন্ধ থাকিলেও ভিতর হইতে আলো দেখা যাইতেছিল।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় দরজায় ধাক্কা দিয়া কোনো সাড়া পাইলাম না। মালবাবুর নাম ধরিয়া আরো জোরে ধাক্কা দিতে অনেকক্ষণ পরে যখন দরজা খুলিল তখন রামপদবাবুর চেহারা দেখিয়া আমার ত অবাক। প্রথম আলাপের সময়কার সে প্রসন্নমূর্তি আর তাঁহার নাই। ক্রোধবিকৃত-মুখে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ কণ্ঠে তিনি বলিলেন, 'এসময়ে আপনারা এখানে এসেছেন কেন?'

অকস্মাৎ তাঁহার এত রাগের কারণ কি হইতে পারে বুঝিতে না পারিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। বিমল বলিল, 'আপনি রাগ করছেন কেন রামবাবু? সময়টা কি এমন খারাপ!'

গলা আরো চড়াইয়া রামপদবাবু বলিলেন, 'রাগ করছি কেন তার কৈফিয়ত আপনাকে দিতে হবে নাকি? যাত্রীদের এখানে আসার অধিকার নেই জানেন!'

বিমল চটিয়া গিয়া বলিল, 'আপনার অত মেজাজ দেখাবারই বা কি অধিকার আছে?'

'অধিকার আলবৎ আছে। না-ব'লে-ক'য়ে আমার বোটে কি জন্যে উঠেছেন? এটাও কি স্টীমার নাকি?'

'না, ওটা লাট-সাহেবের অন্দরমহল।'

বিজন আরো কিছু বলিত কিন্তু তাহাকে জোর করিয়া টানিয়া আনিলাম। মালবাবুর রাগটা যতই অস্বাভাবিক হউক না, আমরাও যে আমাদের অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করিয়াছি একথা অস্বীকারের উপায় নাই। এক্ষেত্রে ঝগড়া করিয়া লাভ নাই। বিজনকে সেই কথাই বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু তাহার রাগ সহজে যাইবার নয়। বলিল, 'মাথাটা ঐখানে গুঁড়ো করে দিয়ে আসাই উচিত ছিল—এমন অভদ্র জানোয়ার ত কখনো দেখিনি। আমরা যেন ওর বোটে চুরি করতে গেছি!'

সে রাত্রিটা তাহার পর সাধারণভাবেই কাটিল। হাস্যধ্বনির মতো কোনো কিছু শুনিবার ক্ষীণ আশা মনের ভিতর ছিল। কিন্তু তাহা পূর্ণ হইল না।

সমস্ত রহস্যের কতকটা মীমাংসা সকালবেলা হইল। মাতলার খাড়ির ভিতর দিয়া স্টীমার চলিতেছে। চারিধারে অর্ধজলময় নাতিউচ্চ উদ্ভিদে সমাচ্ছন্ন ছোট ছোট দ্বীপ। অবজারভেশন-ব্রিজ হইতে অদূরে সমুদ্রের বিশাল দিগন্তবিস্তৃত মরকতনীলকান্তি দেখা যায়। কয়েকটা শঙ্খচিল আমাদের স্টীমারের অনেকক্ষণ ধরিয়া সঙ্গ লইয়াছে। স্টীমারের পিছনে, প্যাডলে আলোড়িত হইয়া যেখানে বিক্ষুব্ধ জলের স্রোত বহিয়া যাইতেছে, সেখানেই তাহাদের দৃষ্টি। তাহার উপর বার বার ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া তাহারা মাছ ধরিবার চেষ্টা করিতেছিল। বেলা পড়িবার সঙ্গে অনাবৃত ব্রিজে রোদের তাত বেশী লাগায় নীচে আসিয়া একধারের রেলিঙ ধরিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিবার অবশ্য কিছু নাই। সামনে মালবাবুর বোট। অন্যমনে স্টীমার ও বোটের মাঝের জলের ব্যবধানটুকুর দিকে চাহিয়া ছিলাম। জল বেশ ঘোলা, কিন্তু কোনপ্রকার আবর্জনা নাই। সে জল এত স্থির মনে হয় যে, শুধু সে দিকে চাহিয়া স্টীমারের কোন্ দিকে গতি বুঝিবার উপায় নাই। জলের উপর নিজের মাথার ছায়া দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম স্টীমার সোজা পুবমুখে চলিতেছে।

হঠাৎ অবাক হইয়া গেলাম। আমার মাথার ছায়ার কাছে অপর দিক হইতে আর একটি মাথার ছায়া পড়িয়াছে।

সবিস্ময়ে মুখ তুলিয়া দেখিলাম বাসাবোটের ক্ষুদ্রাকার পোর্টহোলের একটি ফাঁক হইতে একটি মেয়ে মুখ বাড়াইয়া আমারই মতো জলের দিকে চাহিয়া আছে। আমার সহিত চোখাচোখি হইতেই মেয়েটি খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, কিন্তু সেখান হইতে নড়িল না।

● [illegible] ●

এ হাসি চিনিতে দেরি হইল না। দেখিলাম, হাতখানি হইতে তাহার মুখ সেদিন নিতান্ত ভুল অনুমান করি নাই। মেয়েটির বয়স বছর পনেরো-ষোলোর বেশী নয় অবশ্য, কিন্তু মুখ-চোখ দেখিয়া তাহাও বোঝা সহজ নয়। চোখের দৃষ্টিতে মুখের হাসিতে এমন একটি সারল্য আছে, শিশুর মুখেও যাহা বেশী দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। হাসিটি অপরূপ হইলেও মেয়েটির মুখখানিতে কেমন একটি করুণ ম্লানিমা আছে। রুক্ষ চুলের রাশ শীর্ণ মুখটিকে যেন অতিরিক্ত পাণ্ডুরতা দান করিয়াছে।

হাসির শব্দ শুনিয়া বিমলও কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মেয়েটি তখনও স্মিতমুখে, সরল কৌতূহলী দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চাহিয়া আছে। এই লজ্জাবোধের অভাব হইতে তাহার সারল্যের স্পষ্টতর প্রমাণ পাইলাম।

তাহার পর কি যে হইল বুঝিতে পারিলাম না। অস্ফুট ভয়ের শব্দ করিয়া হঠাৎ একেবারে পাংশুবর্ণ হইয়া মেয়েটি মুখ সরাইয়া লইল। আশেপাশে চাহিয়া এই আকস্মিক ভয়ের কোনো কারণই খুঁজিয়া পাইলাম না।

দুপুরবেলা হঠাৎ মালবাবু দেখা করিতে আসিলেন। তাঁহার আবার এক পরিবর্তন হইয়াছে। গত রাত্রের ঘটনার জন্য তাঁহার লজ্জা ও অনুশোচনার আর অন্ত নাই। কি বলিয়া আমাদের নিকট হইতে তিনি যে ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন তাহা ভাবিয়া পাইতেছেন না। জীবনভোর ঘা খাইয়া-খাইয়াই মেজাজ তাঁহার বিগড়াইয়া গিয়াছে—একটা মানুষের আর কত সহে। আর ভদ্রতার তিনি জানেনই বা কি! দিনরাত্রি কুলী-খালাসীর সঙ্গে মিশিয়া তাহাদেরই সামিল হইয়া গিয়াছেন। কাল ঘুমের ভিতর হঠাৎ জাগিয়া উঠিতে হওয়ার দরুনই মাথাটা ঠিক ছিল না। আমরা যেন তাঁহার এ অপরাধ মার্জনা করি এবং মার্জনা যে করিয়াছি তাহা প্রমাণ করিবার জন্য রাত্রের আহারটা তাঁহার কেবিনেই সমাধা করি। বিনয়ের এই আতিশয্যে অভিভূত হইয়া বিশেষ কিছু বলিতে পারিলাম না। রামপদবাবু আরো বারকয়েক অনুরোধ করিয়া বিদায় লইলেন।

বিমল সমস্তক্ষণ চুপ করিয়া ছিল। রামপদবাবুর বাক্য-স্রোতের মাঝে দু'-একটা উত্তর আমিই দিবার চেষ্টা করিয়াছি। এবার সে আমার দিকে চাহিয়া বলিল, 'ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারলে, দাদা?'

বুঝিতে কিছু পারি নাই। ওই মেয়েটির সহিত রামপদবাবুর গতরাত্রের ত্রাস ও এদিনের অনুশোচনার যদি কোনো সম্বন্ধ থাকে তাহা হইলে সে সম্বন্ধ আমার বুদ্ধির এখনও অগোচর। মেয়েটির আকস্মিক ভয়ও আমার কাছে দুর্বোধ্য।

স্টীমারের সেকেণ্ড মেট্ অত্যন্ত ভালো লোক। বয়সকালে সে বার-দরিয়ায় অনেক ঘুরিয়াছে, এখন আর পারে না। দেশ হইতে দূরে থাকিতে ভালোও লাগে না, তাই এই নদীর কাজ লইয়াছে। বুড়া প্রথম দিনই আমাদের কাছে একজোড়া ভালো শীতলপাটি অত্যন্ত সস্তায় বিক্রি করিবার প্রস্তাব করিয়াছিল। এমন খাঁটি জিনিস আজকাল নাকি পাওয়া যায় না। পাটি ক্রয় করিতে পারি নাই কিন্তু আলাপ জমিয়া গিয়াছিল।

আজ আবার তাহাকে ধরিয়া বসিলাম। কথায় কথায় মালবাবুর কেবিনের রহস্যের কথা উঠিল। আশ্চর্যের বিষয়, সেখানে যে একটি মেয়ে আছে এ-কথা বুড়া প্রথমতঃ স্বীকার করিতেই চাহিল না। আমরা নিজের চক্ষে দেখিয়াছি বলার পর খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'তা হবে বাবু, আমরা জানি না। নিজের কাজকর্ম নিয়েই থাকি, আমাদের ফুরসত কই।'

বাধ্য হইয়া শীতলপাটিটা ক্রয় করার প্রস্তাবটা আবার করিলাম। সেকেণ্ড মেট্ এবার একটু নরম হইল বোধ হয়। কিন্তু শীতলপাটি ক্রয় করিবার প্রস্তাবেও বেশী কিছু সে জানাইতে পারিল না। মালবাবুর স্ত্রী বহুদিন আগে আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছিল, না, গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছিল এমনি একটা কথা সে শুনিয়াছে। এই মেয়েটি মালবাবুরই কন্যা। গত বৎসর হইতে তিনি ইহাকে সঙ্গে লইয়া ফিরিতেছেন। মেয়েটিকে স্টীমারেও মালবাবু বাহির হইতে দেন না। ভদ্রলোক কোনো আরোহী থাকিলে তাহাকে ত দেখাই যায় না। মেয়েটি খুলনার জেটিতে যেবার স্টীমার হইতে লাফ দিয়া পলাইবার চেষ্টা করে, মাত্র সেইবার সে ভালো করিয়া মেয়েটিকে দেখিয়াছে। ইহার বেশী কিছু সে জানে না।

বিমল জিজ্ঞাসা করিল, 'মেয়েটি পালাতে চেয়েছিল কেন?'

'তা কি জানি, বাবু! মালবাবুর নসীব নেহাত মন্দ, নইলে একটা মেয়ে, সেও অমন হয়'—বলিয়া সেকেণ্ড মেট্ আবার তাহার পাটির গুণব্যাখ্যা আরম্ভ করিল। তাহার নিকট হইতে আর কিছুই বাহির করা গেল না।

সমুদ্রের দিকে আবার পিছু ফিরিয়া সুন্দরবনের গভীর অংশের ভিতর দিয়া আমরা চলিয়াছি। এখানে সঙ্কীর্ণ নদীপথ। একটু এদিক ওদিক হইলেই মনে হয় স্টীমার পাড়ে লাগিয়া যাইবে। সূচিভেদ্য অন্ধকারের ভিতর সার্চলাইটের আলো শানিত তরবারির মতো এক পাড় হইতে অন্য পাড়ে ঘুরাইতে ঘুরাইতে ধীর গতিতে স্টীমার চলিয়াছে। উপর হইতে সারেঙের আদেশের ঘণ্টা ক্ষণে ক্ষণে বাজিয়া

উঠিতেছে। দু'পাশে দুর্ভেদ্য গরান-সুঁদরির জঙ্গল। তাহার উপর সার্চলাইটের আলো পড়িবামাত্র মন আপনা হইতেই উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠে—মনে হয় এই ক্ষণিক আলোয় অরণ্যের কি যেন ভীষণ রহস্য আমাদের চোখের উপর এখনি উদ্‌ঘাটিত হইবে। আসলে কিছুই তেমন না হইলেও সমস্তক্ষণ গা কেমন ছমছম করিতে থাকে। অরণ্যের এই গোপন নির্জন প্রদেশে আমরা যেন অনধিকার প্রবেশ করিয়া ক্ষমাহীন অপরাধ করিয়াছি। মনে হয় স্টীমারের আওয়াজের ভিতরেও বিশাল অরণ্যভূমির কেমন একটা ক্ষুব্ধ আক্রোশের গুমরানি শোনা যায়। সমস্ত দেহমন তাহাতে অস্পষ্ট আশঙ্কায় আড়ষ্ট হইয়া পড়ে।

আজ রাত্রে আর লাফাইয়া মালবাবুর বোটে উঠিতে হইল না। একজন খালাসী আমাদের অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গেল। সামান্য গাধাবোটের ভিতরও মালবাবুর ঘরটি দেখিলাম নিতান্ত মন্দ নয়। গৃহের সমস্ত উপকরণই সেখানে আছে।

কাঠের মেঝের উপর সতরঞ্চি পাতা ছিল। সেখানেই রামবাবু বসিতে বলিলেন। ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেছিলাম। আমাদের সামনেই একটি দরজা চোখে পড়িল। পাশে আরো একটি ঘর তাহা হইলে আছে। কিন্তু সে ঘরের দরজার এদিক হইতে খিল-দেওয়া।

রামবাবুকে আজ কেমন যেন বিচলিত মনে হইতেছিল। আহারের যোগাড় নিজেই করিতে করিতে মাঝে মাঝে অসংলগ্ন দু'-একটি কথা বলিতেছিলেন। আমাদের মনও স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল না, আলাপ জমিতেছিল না বোধ হয় সেইজন্যই।

বন্ধ দরজার ওধারে কি একটা শব্দ হইল একবার। রামবাবু একটু যেন চমকাইয়া উঠিলেন। আমরাও উৎকর্ণ হইয়া উঠিয়াছিলাম।

রামবাবু হঠাৎ অন্য কথা পাড়িলেন। এখন আমরা যেখান দিয়া চলিয়াছি, এত গহন জঙ্গল সুন্দরবনে নাকি খুব কম স্থানেই আছে। দিনের বেলা কখনো কখনো স্টীমার হইতেই এখানে বাঘ দেখা গিয়াছে। একবার একটা বাঘ নদী পার হইবার সময় স্টীমারের সামনে পড়িয়া কিরকম নাকাল হইয়াছিল তাহার গল্পও তিনি করিলেন।

সহজ হইবার চেষ্টা করিলেও বুঝিতে পারিতেছিলাম রামবাবুর মন অস্থির হইয়া আছে।

আহার করিতে বসাইয়া রামবাবু প্রথম তাঁহার কন্যার কথা উল্লেখ করিলেন। বলিলেন, 'আপনাদের জন্য কিছুই করতে পারলাম না। মেয়েটার আজ অসুখ, উঠতে পারছে না, নইলে তার হাতের রান্না খেয়ে খুশি হতেন।'

বিমল আসনের উপর হাত গুটাইয়া বসিয়া ছিল। হঠাৎ তাহার কথায় চমকাইয়া উঠিলাম।—'আপনি মিথ্যেকথা বলছেন, রামবাবু!'

একটি কথায় ঘরের ভিতর কি যে পরিবর্তন হইয়া গেল তাহা বোঝান কঠিন। রামবাবুর মুখ একেবারে দেখিলাম ছাইএর মতো সাদা হইয়া গিয়াছে। অস্ফুট স্বরে বলিলেন, 'মিথ্যে কথা! কেন?'

বিমল দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, 'হ্যাঁ, মিথ্যে কথা। আপনার মেয়ের অসুখ করেনি।'

রামবাবু মাথা নীচু করিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন। বিমল বলিতে লাগিল, 'আপনার মেয়েকে আপনি ঘরে বন্ধ ক'রে পায়ে শেকল দিয়ে রেখেছেন। শুধু এখন নয়, এরকম ভাবে শেকল দিয়ে তাকে অনেক সময়েই আপনি রাখেন।'

এবার আমিই প্রতিবাদ করিলাম, 'কি বলছ বিমল?'

'ঠিকই বলছি, কাল থেকেই আমার কিরকম সন্দেহ ছিল। আজ সন্ধ্যায় আমি নিজে পাথাবোটের ধার দিয়ে ঘুরে গোপনে দেখে গেছি। ঘর অন্ধকার হ'লেও পায়ের শেকল দেখতে আমার ভুল হয়নি।'

রামবাবু এতক্ষণের মধ্যে একবারও মাথা তোলেন নাই। এইবার কাতরভাবে আমাদের দিকে চাহিয়া কি যেন বলিতে চাহিলেন। বিমল তাঁহাকে সুযোগ দিল না। তীব্রকণ্ঠে সে বলিল, 'আর মিথ্যে কৈফিয়ত তৈরি করবার চেষ্টা করবেন না। আমরা সবই বুঝতে পেরেছি। আপনার মতো পিশাচকে জালজুতো দিয়ে খাওয়ালেও উপযুক্ত শাস্তি হয় না। আপনার স্ত্রী আত্মহত্যা করে আপনার উৎপীড়ন থেকে বেঁচেছে। আপনার অসহায় মেয়ে পালাবার চেষ্টা করে বিফল হয়েছে, হয়ত শেষ পর্যন্ত তাকেও মার পথ নিতে হবে।'

স্তব্ধ হইয়া বিমলের কথা শুনিতেছিলাম। রামবাবুর ভদ্রগোছের কাতর মুখের দিকে চাহিয়া কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলাম না যে, সে মুখের পিছনে এতবড় পৈশাচিক মন আত্মগোপন করিয়া আছে। ভাবিতেছিলাম নিজের স্ত্রী ও নিজের কন্যাকে এভাবে যন্ত্রণা দিবার কি হেতু তাঁহার থাকিতে পারে। হয়ত যদি উহা অহেতুক বিলাস হয়, তাহা হইলে সত্যই তাঁহার পৈশাচিকতা আমাদের ধারণার অতীত।

বিমল বলিতেছিল, 'এই নির্জন নদীপথে মানুষের দৃষ্টি এড়িয়ে গোপন থাকার সুবিধে আপনি অনেকদিন পেয়েছেন। কিন্তু এবার আর নিষ্কৃতি নেই জানবেন।'

রামবাবু হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলাম তাঁহার মুখ হইতে পূর্বের সেই গাঢ় ছায়া অনেকটা সরিয়া গিয়াছে। নিজেকে তিনি যেন ইতিমধ্যে শান্ত করিয়াছেন। এবার তিনি কি করিবেন বুঝিতে না পারিয়া আমরাও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। কেবিনের দেওয়াল হইতে বাতিটা পাড়িয়া লইয়া বন্ধ দরজার দিকে অগ্রসর হইয়া রামবাবু বলিলেন, 'আসুন!'

তাঁহার এই আকস্মিক আচরণে বিমলও কেমন বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল। আমরা নীরবে তাঁহাকে অনুসরণ করিলাম।

দরজা খুলিয়া যে ঘরে রামবাবু প্রবেশ করিলেন আকারে সেটি অত্যন্ত ছোট। লণ্ঠনের আলোয় দেখা গেল আসবাব-পত্র সেখানে কিছুই নাই এবং সত্যই কাঠের মেঝের একটি শিকলের সহিত বদ্ধ হইয়া মেয়েটি সেখানে বসিয়া আছে।

আমাদের দেখিয়াই মেয়েটি উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। সেই অপরূপ হাসি! রামবাবু নত হইয়া তাহার শিকলটা বুঝি খুলিতে গেলেন।

সহসা আমাদের স্তম্ভিত করিয়া মেয়েটি তাঁহার হাত কামড়াইয়া ধরিল। আহত হাত অতি কষ্টে ছাড়াইয়া অহার শিকল খুলিয়া রামবাবু যখন সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন তখন তাঁহার ক্ষতস্থান হইতে রক্ত পড়িতেছে।

কিন্তু তাঁহার আহত হাতের চেয়ে বিস্ময়কর দৃশ্য তখন আমাদের বিহ্বল করিয়া দিয়াছে। শিকল খোলা হইতেই আবার খিলখিল করিয়া হাসিয়া মেয়েটি একদিকের দেওয়ালে ভর দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এ পর্যন্ত তাহার মুখটুকুই দেখিয়াছি। লণ্ঠনের আলোয় তাহার সম্পূর্ণ চেহারা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। সৃষ্টির পরমাশ্চর্য নারীদেহ লইয়া প্রকৃতির ইহার চেয়ে নিষ্ঠুর পরিহাস বুঝি আর হইতে পারে না। কোমল এবং প্রায় স্বাভাবিক মুখখানির জন্য বিকলাঙ্গ দেহের বীভৎস ছন্দহীনতা আরো যেন অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। বুঝিলাম, তাহার চোখে সরলতা বলিয়া যাহা ভুল করিয়াছিলাম তাহা মনের মহাশূন্যতার আভাস মাত্র। কণ্ঠের অপরূপ হাসি দিয়া নির্মম বিধাতা তাহার কদর্য-বিভীষিকার উপর ব্যঙ্গের চরম ছাপ রাখিয়াছেন।

বিমল সহসা অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার পর দ্রুতবেগে ঘরের

বন্দীকে দিয়ে তীব্র স্বরে যেন আর্তনাদ করিয়া বলিল, 'চলে এসো, শীগ্‌গির চলে এসো। এ আর দেখা যায় না!'

মেয়েটি শূন্যদৃষ্টিতে তখনো আমাদের দিকে তাকাইয়া আছে। আমাকে বাহিরে লইয়া গিয়া রামবাবু দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। নিঃশব্দে আমরা আবার আসনে গিয়া বসিলাম।

খানিকক্ষণ সব চুপচাপ ছিল। হঠাৎ ভিতর হইতে মেয়েটি দরজার উপর তাহার সমস্ত শক্তি দিয়া আঘাত করিতে লাগিল। হঠাৎ সে আস্ফালন শুনিলে মনে হয় হিংস্র কোনো পশুকে বুঝি পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। এ তাহারই ক্ষুব্ধ আক্রোশের পরিচয়।

রামবাবুর চোখ দেখিলাম অশ্রুসজল হইয়া আসিয়াছে। বলিলেন, 'ওই জন্যেই মাঝে মাঝে শেকল দিয়ে রাখতে হয়। ছাড়া থাকলে এ সময় জলে ঝাঁপ দিয়েও পড়তে পারে।'

মেয়েটি খানিক এইভাবে আস্ফালন করার পর শ্রান্ত হইয়াই বোধ হয় চুপ করিল। বিমল অনুতপ্ত কণ্ঠে বলিল, 'আমায় ক্ষমা করুন, রামবাবু!'

রামবাবু বিষণ্ণ মুখে বলিলেন, 'আপনার দোষ ত কিছু নেই, বিমলবাবু! আপনি একটু ভুল বুঝেছিলেন মাত্র। কিন্তু আমায় সাধারণ যে ভর্ৎসনা করেছেন তার চেয়ে অনেক বেশী আমার প্রাপ্য। বিধাতার কাছে সেই পাওনা মিলছেও আজ পনেরো বছর!'

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া রামবাবু আবার বলিলেন, 'নিজের সন্তানের এই রূপ দিনের পর দিন দেখার যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে উন্মাদ হয়ে আমার স্ত্রী আত্মহত্যা করে। সে রেহাই পেয়েছে কিন্তু আমার মুক্তি নেই। সংসারের মাঝে ওকে নিয়ে প্রতিদিন মানুষের কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে থাকা একেবারে অসহ্য। এই দ্বীপে তবু নিজের যন্ত্রণা নিয়ে নির্জনে থাকতে পাই। খালাসীদের কাছে আমার তেমন সঙ্কোচ নেই—তাদের কৌতূহল পরিতৃপ্ত। তারা অভ্যস্তও হয়ে গেছে। আপনাদের মতো আমার সমকক্ষ লোকদেরই আমার ভয়!'

রামবাবু থামিলেন। ভিতরে মেয়েটি আবার অশান্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহাকে দরজার বাহির হইতে বার দুই ধমক দিয়া একটু শান্ত করিয়া আসিয়া রামবাবু আবার তাঁহার কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সমশ্রেণীর কোনো যাত্রী দ্বীপে উঠিলে তাঁহার উদ্বেগের আর সীমা থাকে না। তাহাদের কৌতূহলী দৃষ্টি

হইতে প্রাণপণে তিনি মেয়েটিকে আড়াল রাখিবার চেষ্টা করেন। তাহার দিকে কেহ ঘৃণাভরে তাকাইতেছে এ-কথা ভাবিলে তাঁহার যন্ত্রণা দ্বিগুণ হইয়া উঠে। কাহারো সহানুভূতিও তাঁহার অসহ্য।

‘ও যে আমারই অপরাধের প্রত্যক্ষ শাস্তি তা জানি। কিন্তু নিজের প্রায়শ্চিত্তকে সাধারণের চোখের সামনে প্রকাশ করে রাখবার শক্তি আমার নেই।’—রুদ্ধ-গলায় শেষ কথাগুলি বলিয়া রামবাবু দুই হাঁটুর ভিতর মাথা গুঁজিয়া চুপ করিলেন।

স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম—করুণায় নয়, হতাশায়।

জনহীন শ্বাপদ-সঙ্কুল গহন অরণ্যের ভিতর দিয়া তখন স্টীমার চলিয়েছে। সে অরণ্য ভয়ঙ্কর—কিন্তু মনে হইল মানুষের মনের অরণ্য রহস্য-বিভীষিকায় তাহাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে।

পাপ করিতে পারে এতবড় অহঙ্কার ত পশুর নাই!

অর্থহীন এ দুর্বল দম্ভ শুধু মানুষের। মনের গহন অন্ধকারে এ দম্ভের নিরর্থক নিদারুণ শাস্তিও তাই তাহার একার।

পোস্তাঘাট পেরিয়ে

এ'পথে লম্বা শালতিগুলি আসে—খড়, ধান, চালের বোঝাই নিয়ে নড়ালের পোলের তলা দিয়ে, দক্ষিণ থেকে। নোনা দেশের মিশকালো চাষী, বাঁশের লম্বা লগি বায়—দরমার ছাউনির তলায় উনুনে ভাত ফোটে।

উত্তর থেকে আসে হাঁড়ি, টালি, বালি, ইট, গুড়ের বোঝাই নিয়ে মহাজনী নৌকা।

নদী মরে এসেছে। এককালে গাধাবোটেও আপত্তি ছিল না, আজকাল জোয়ারের সময় বড়জোর বিশমাল্লা পর্যন্ত চলে। ভাঁটায় শুধু শালতি।

• • •

এখানে নদীটির অত্যন্ত দৈন্যদশা। শীতকালে ভাঁটার সময় হাঁটু পর্যন্ত জল ওঠে কিনা সন্দেহ।

হালদার-কোম্পানির চালান-সরকার বিদেশী লোক, নতুন কাজে বাহাল হয়েছে; সেদিন সে কাকে বলেছিল, 'খালের জল যা ঘোলা, নাইতি পারবা না।'

'খাল! খাল! তোমার নানা কাটিয়েছিল'—বুড়ো সরকার-মশাই দাঁত খিঁচিয়ে উঠলেন—'এই খালের একফোঁটা জল পেলে তোমার চোদ্দপুরুষ উদ্ধার হয়ে যায়! খাল! ডোবা!'

'আমার খুশি, আমি একশো বার খাল বলব। আপনার কি!'

'আমার কচু! তুমি নর্দমা বলো না, মা-গঙ্গার মুখে থুথু দাও না!'

—এমন তাদের ঝগড়াই হয় ছোট-খাটো জিনিস নিয়ে। তার কারণও আছে। বুড়ো সরকারের বকাটে ঘর-জামাইটা গোলায় গোলায় পাশা চেলে গাঁজা-তাড়ি টেনে দিন কাটায়।

সরকার-মশাই বলেন, 'তার ত একটা হিল্লে হয়ে গেছল ওই ব্যাটা না উড়ে এসে জুড়ে বসলে—'

কথাটা ষোলআনা সত্য নয়। জামাইকে ব'লে ক'য়ে তিনি কাজে লাগিয়ে একরকম দিয়েছিলেন। কিন্তু একদিন মুখার্জী-কোম্পানির সরকার এসে হট্টগোল বাধিয়ে দিলে—'সকাল থেকে মাল নেই; তিনশো বিস্তী কোথায় গেল আজ

দু'কেলা সুরকি মুটের মাথায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। বলিহারি আপনাদের আক্কেল! কে এখন গুনোগার দেবে শুনি?'

সত্যিই গুরুতর ব্যাপার।

'গাড়োয়ানরা ত অনেকক্ষণ মাল নিয়ে বেরিয়ে গেছে, এতক্ষণ ফিরে আসবার কথা!' খোদ কর্তা গদি থেকে বিপুল দেহভার তুলে উদ্বেগে হাঁসফাঁস করতে লাগলেন।

মুখার্জী-কোম্পানি বড় খদ্দের।

শেতল ঘোড়ুই হাঁফাতে হাঁফাতে এসে বললে, 'আজ্ঞে, আমি ত শুধু দু'কেলা সুরকি চেয়েছিলাম!'

'তারপর?'

'পঁচিশ গাড়ি সুরকি নিয়ে আমি কি আমার গোরে চাপা দেব?'

বুড়ো সরকারের বকাটে জামাই তখন নির্বিকার মুখে চালান লিখে চলেছে।

খোদ কর্তা হাঁকলেন, 'কে, চালান সই করেছে কে?'

'আজ্ঞে আমি!'—

ব্যাপার বিশেষ কিছুই নয়—একই রাস্তার নম্বরগুলো একটু ওলট-পালট হয়ে গেছে। অমন ভুল ত হতেই পারে।

বুড়ো সরকার-মশাইএর চোখ ফেটে জল বেরোয় আর কি!

তাঁর জামাই কিন্তু অত্যন্ত বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করলে, 'কাল থেকে তাহ'লে আর আসতে হবে না?'

'না।'

'আর পরশু?'

'না, না।'

'আজ্ঞে, কোনদিন যদি দরকার বোধ করেন ডাক দিলেই আমি আসব, জানেন ত ওই গুলিখোরের ঘাট—'

ছ'জোড়া ঘোররক্ত চোখের সামনে দিয়ে আর কেউ অমন অবিচলিত ভাবে বেরিয়ে আসতে পারত না বোধ হয়। কিন্তু বলাইএর কাঠামোই আলাদা।

আর চাকরির বালাই নেই। নির্ভাবনায় বলাই ঘুরে বেড়ায়। সরকার-মশাই বলেছেন—'মুখ দেখতে চাই না'। মুখ দেখবার চেষ্টা করলেও তিনি সফল হতেন বলে মনে হয় না—সে সুযোগ মেলা ভার।

শাশুড়ি ঝনাৎ করে ভাতের থালাটা নামিয়ে দিয়ে মুখ হাঁড়ি করে ঘরে গিয়ে ঢোকেন। বলাই নির্বিকার মুখে থালাটি নিঃশেষ করে উঠে যেতে যেতে বলে, 'তালটা যা হয়েছে, অদ্ভুত!'

বুড়ো সরকারের বোড়শী কন্যা ভ্রূকুটি করে মনে মনে বলে, 'মরণ আর কি!'

শাশুড়ি গলা ছেড়েই বলে, 'চোদ্দ পো অধর্ম না করলে এমন জামাই হয়! ওর ভীমরতি ধরেছিল, নইলে রাজ্যে আর পাত্তর ছিল না!'

বলাই একটু মুচকে হাসে; তাচ্ছিল্যভরে দেওয়া পানটা বৌএর হাত থেকে নিয়ে বলে, 'একটু চুন।' তারপর একটু থেমে বলে, 'সঙ্গে না হয় একটু কালিও দিয়ো।'

চপলা ভুরু কুঁচকে মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়।

* * *

এ বছর বাজার বড় মন্দা, নদীতে দাঁড়ের ঘা পড়ে না। দক্ষিণ থেকে দুটি একটি শালতি কখনো-বা আসে, লগি বেয়ে,—উত্তরের কুয়াশায় কেরানী নাক ডাকিয়ে ঘুমোয়—

'হ্যাঁ বাবা, পেটো, বেশ করে বেড়োন্ দাও, নইলে অত আয়েশ সইবে কেন? ফুলে মরে যাবে যে! গতরে ঘুণ ধরে যাবে। কাজ যেমন নেই, রোজ সময় করে একটু একটু বেড়োন্ দিচ্ছ ত?'

মেহুরাক বলদটাকে রেহাই দিয়ে বললে, 'নেহি বোলাই বাবু, এ বলদটো ভারী বদমাস আছে, ইহার লিয়ে হামার বিলকুল লোকসান হয়ে গেলো। আর সব বলদ হামার নাল বাঁধতে লাগে দু'-আনা, আর ই-শালার খালি গিরাই লাগে একটাকা! তারপর নয়া রশ্‌শি—উভি দশ আনার কমতি নেই!'

অনেকগুলো গরুর-গাড়ি ল্যাজ তুলে অতিকায় ফড়িঙের মতো পড়ে ছিল। তারি একটায় বেশ আয়েস করে বসে বলাই বললে, 'তেমনি একটি-বছরের মতো যে খালাস বাবা। দুটু গরুর সুখ ত ওই। ক্ষুর কখনো পাতলা হবে না ও আট দিন অন্তর নাল বাঁধাবার হাঙ্গামা নেই।'

ওসমান কাছে বসে জীয়ন্তের উইয়ের নাল বাঁধছিল। লোহার নালে একটা গজাল ঠুকে বললে, 'ঠিক বলেছেন বাবু! আমি এই বিশ বছর নাল বাঁধছি, একটা দুশমন গরুর পাতলা ক্ষুর দেখলাম না।'

'কিন্তু এত নাল-বাঁধা-বাঁধিটে বা কিসের রে বাপু! বসে বসে গাড়ি হাঁকাতে ত বোধ হয় ভুলেই গেলি। বলদগুলো কি আজকাল দাঁড়িয়ে নাল খোয়াচ্ছে, না সুরকি-পটির নসীব ফিরল?'

জীবুৎ দুটি বিড়ি বার করে একটা বলাইএর দিকে এগিয়ে ধরল, 'কাহা নসীব, বাবু, কোনো গোলামে বিক্রি-উক্রি সুছু নাহি বা, আজ ছ' রোজ হবার এক্‌গো খেপ মিলল ন।'

নাল বাঁধা শেষ হয়ে গেছল। ওসমান বোয়েব পা থেকে দড়িটা খুলে নিতে নিতে বললে, 'সত্যি এবছর রাস্তায় এত ঢিলে কেন বলুন ত বলাইবাবু—?'

মুখ থেকে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বলাই বললে, শহরে কি আর টাকা আছে রে বাপু, যে, লোকে বাড়ি করবে?'

খানিক থেমে সকলের মুখের দিকে একবার চেয়ে নিয়ে বলাই আবার বললে, 'একটাকার নোট বেরিয়েছে দেখেছিস?'

'হাঁ, দেখেছে।'—মেহুরাজ আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল, বলাই তাকে বাধা দিলে, 'খালি কাগজ! ঐ কাগজ দিয়ে ভুলিয়ে সব টাকা বিলেতে চালান করে দিচ্ছে, তা জানিস?'

এ খবরটা তারা কেউ জানত না বটে স্বীকার করলে।

'টাকা এদেশে থাকলে ত লোকে বাড়ি করবে। সব টাকাই যে বিলেতে!'

তিনজনেই মাথা নেড়ে জানালে—ঠিক কথা বটে—বলাইবাবু ধরেছেন ঠিক,—'আচ্ছা, বিলেতে টাকা পাঠাচ্ছে কেন?'

'কেন? আবার যে যুদ্ধ বাধবে রে!'

'ফিন্ লড়াই!'

বলাই গরুর গাড়িটায় চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে বললে, 'তবে আর বলছি কি? সুরকি-পটিতে লোক চলতে পারত না, দু'মাস অন্তর রোলার-ইঞ্জিন আসত রাস্তা মেরামত করতে। আর এখন?'

'আমি আর খাদেম এ রাস্তায় নাল বেঁধে কুলিয়ে উঠতে পারতাম না, বাবু—' ওসমান কথাটা শেষ করতে পারল না।

মেহুরাজ নদীর দিকে মুখ করে বসে ছিল, উল্লসিত হয়ে হাঁকলে, 'ঐ নাও আছে, না, কি আছে বোলাই বাবু? দেখেন ফিরে!'

বিস্ময়ের কথাই ত! পোনাঘাটের বাঁকের মাথায় ইটের ভরা দেখা দিয়েছে!

একটি নয়, ছুটি নয়, পাঁচ-পাঁচটি ইটের ভরা পোনাঘাটের বাঁকের মাথায় পর পর দেখা দিল। বলাই হাঁকলে, 'কোন্ ঘাটে বাঁধবে মাঝির পো?'

হালীর মাচা থেকে উত্তর এল, 'হালদারদের গো, হালদারদের—'

তা হালদারদের ছাড়া আর কাদেরই বা হওয়া সম্ভব।

রাস্তায় যেতে যেতে একটি লোক থেমে পড়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'কি বললে? হালদারদের না?'

সকলে মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করে একটু হাসল মাত্র। উত্তর দিলে না। লোকটা বিরক্ত হয়ে বলাইএর দিকে বিষদৃষ্টি হেনে চলে গেল—একটু যেন খুঁড়িয়ে!

'খোঁড়া বাবুর চোখ টাটাচ্ছে!'—ওসমান হাসতে লাগল।

খোঁড়া-বাবুর সঙ্গে হালদার-কোম্পানির সতাসতীন সম্পর্ক। কার সঙ্গেই বা নয়?

স্থরকি-পটিতে সাড়া পড়ে গেছে।

গরুর গাড়িটার উপর বলাই চিৎ হয়ে শুয়ে ছিল। একে একে দুজন সরে পড়েছে। প্রথমে গেল জীয়ুৎ—তার দামাদ আসবে, তাকে সওদা করতে যেতে হবে।

জীয়ুৎ যেতে-না-যেতে মুখ বেঁকিয়ে মেহুরাক জানালে, 'জামাই এসেছে না আরো কিছু—ও শুধু খেপ মাগুতে যাওয়া তা আর কে না বুঝতে পারে। অত ছোট মেহুরাক হতে পারে না। আপন খুশিতে খেপ কেউ দেয়, বহৎ আচ্ছা! নইলে খেপ পাবার জন্যে উমেদারি করতে হবে? আবার, ভরা ঘাটে না লাগতে লাগতে,—ছোঃ—!'

মেহুরাককে কিন্তু তাড়াতাড়ি উঠতে হয়। নড়ালের পোল পেরিয়ে একবার নতুন চাকাটার কি হ'ল খোঁজ করতে যেতে হবে।

আজ সবারই দরকার নড়ালের পোলের দিকে।

খানিক চুপ করে থেকে চোখ বুজেই বলাই বললে, 'ওসমান আছিস?'

'হাঁ বাবু।'

'চুপি চুপি দু'পুঁটলি নিয়ে আয় দেখি।'

ওসমান আপত্তি করে বললে, 'না না বাবু, আজ বড় বেলা হয়ে গেছে, আর যান, সরকার-মশাই আবার রাগ করবেন।'

মুদিত চোখেই হাত নেড়ে বলাই বললে, 'বাজে কথা! কেনে তুই যা দেখি, দুটি পুটলি আর আধসের রাবড়ি, বুঝেছিস? আমি ওই গুলিখোরের ঘাটে আছি।'

খানিক ওসমানকে নীরব দেখে বলাই বললে, 'ঘাটে পাঁচ-পাঁচটা জবা লেগেছে, আবার ভাবনা? যা যা, গপ করে আয়।'

'আজ্ঞে না বাবু, ভৌজি আপনার জন্নে বসে থাকবে—'

বলাই একটু হেসে বললে, 'রাবড়িটা একটু লুকিয়ে আনিস।'

অগত্যা ওসমান গেল।

বেলা বেশ বেড়ে গেছে। জীয়ন্তের ঘোমটা নিজে নিজেই গিয়ে নদীতে নামল। কিন্তু বলাইএর ভ্রূক্ষেপ নেই। গরুর গাড়িটার ওপর তেমনি ভাবেই এই প্রচণ্ড রোদে এলো গায়ে সে পড়ে রইল।

কিন্তু বেশীক্ষণ পড়ে থাকা গেল না।

পায়ে সুড়সুড়ি লাগতেই চমকে ঘুম ভেঙে গেল।—'ফের এসেছিস ছুটকি! আজ তোর বাবাকে বলে দেবই। দেখ্ তাহ'লে—'

কিন্তু ছুটকি সে কথা শুনতে পায় কেমন করে! সে ত তখন তার নতুন রঙীন ডোরদার শাড়ী বাঁচিয়ে গোবর কুড়োতে অত্যন্ত ব্যস্ত।

খোঁড়া-বাবু আবার ফিরছিল! দাঁড়িয়ে পড়ল। দাঁতে দাঁত চেপে কি একটা উদ্যত কথাকে সে দমন করলে তাও বোঝা গেল। বলাই কিন্তু তার ভ্রূকুটি-কুটিল অগ্নিদৃষ্টির প্রত্যুত্তরে হেসে বললে, 'বড়ি পিয়াস্ লাগল্ এ ছুটকি, তনি মেহেরবানি করি কি ন—'

খোঁড়া-বাবু এতখানিই বা সহ্য কেমন ক'রে করে!

ছুটকি আবার ঘাড় বেঁকিয়ে মুখ ফিরিয়ে—মুখে কাপড় দিয়ে দুষ্টহাসিটুকু লুকোবার ভান করে।

রাত অনেক হয়ে গেছে।

বলাই পা টিপে-টিপে ঘরে গিয়ে ঢোকে। চপলা বই পড়ায় ব্যস্ত, ফিরেও তাকায় না। বলাই চুপ করে দাঁড়িয়ে খানিক আড়চোখে দেখে, তারপর থপ করে পাশে বসে পড়ে, বইটা হাত থেকে কেড়ে নেয়। ঝটকা দিয়ে বইটা আবার ছিনিয়ে নিয়ে চপলা রুক্ষস্বরে বলে, 'ও আবার কি ন্যাকাপনা! সরে বোসো। ওসব গাঁজা-গুলির গন্ধ আমার সহ্য না!'

বনাই ভুরু দুটো তুলে একটু মুচকে হাসে। বলে, 'মাইরি আজ মুখ শুঁকে দেখো, ধেনো কচি আমের গন্ধ না পাও ত আমায় দূর করে দিয়ো। তোমার জন্যেই শেষটা গাঁজা ছেড়ে চরস ধরতে হ'ল।'

চপলা উত্তর দেয় না। বাতিটা নিবিয়ে দিয়ে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে। তারপর আপন মনেই বলে, 'মুখ নাড়তে লজ্জা করে না? মানের ত একে সীমে নেই—গাড়োয়ান ইয়ার, ঠিকাদার ইয়ার, গরুর নাল বাঁধে যে মোছলমান সেও ইয়ার। তাও না হয় হ'ল। শেষটা বামুনের ছেলে হয়ে কৈবর্ত্তর ঘাড়ধাক্কা খাওয়া! কোন্ মুখে সে আবার লোকসমাজে বেরোয়—দাঁত বের করে কথা কয়! দু'কানকাটা বেহায়া! দড়ি-কলসি জোটে না!'

কথাটা মিথ্যে নয়।

ক'দিন ধরেই খোঁড়া-বাবু প্রতিশোধ নেবার তক্কে ছিল। সুযোগও মিলতে দেরি হ'ল না। কবে থেকে খোঁড়া-বাবু গুলিখোরের ঘাট আবার জমা নিয়েছে তা কে জানে। দুপুরে বনাই রোজকার মতোই শিষ্য-সাকরেদ সমেত মৌতাতের আড্ডাটি জমিয়েছে, এমন সময় দরওয়ান সমেত খোঁড়া-বাবু এসে হাজির। তারপর বেপরোয়া ঘাড়ধাক্কা। মৌতাত তখন বেশ জমে উঠেছে। শান্ত সুবোধ ছেলের মতো সবাই বেরিয়ে এল।

ওসমান ছিল না। এসে শুনে বললে, 'এইবার হাতে হাঁটতে হবে, ঠেঙোর বায়না দিতে বলে আসি খোঁড়া-বাবুকে।'

বনাই হেসে বললে, 'তা'হলে এতদিন ধরে ছাই নেশা করেছিস। রক্ত যদি গরমই হ'ল তবে আর মানুষের বার হ'লি কোথায়?'

ব্যাপারটা ওইখানেই থেমে আছে।

চপলা কথাগুলো বলে পাশ ফিরে শোয়। তারপর খানিক সব চুপচাপ। পুবের জানলা দিয়ে যে সামান্য গ্যাসের আলোটুকু আসে তাতে কেউ কাউকে দেখতে পায় না।

পেলে বোধ হয় ভালো হ'ত।

বনাই বিছানার ধারে এসে বলে, 'মাইরি, রাত্রে সব দোকান বন্ধ হয়ে গেছে, এখন দড়িও পাব না কলসিও না। রাতটুকুর মতো একটু সরে শুতে দাও।'

চপলা বিছানা থেকে নেমে মেঝেতে আঁচল পেতে শোয়। বনাই বিনা বাক্যব্যয়ে

বিছানায় উঠে শোয়, খানিক এপাশ-ওপাশ করে, তারপর বলে, 'উঃ বেজায় গরম, ঘাটে যেতে হ'ল।'

বলাই বেরিয়ে যায়। চপলা বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। তার কাছ থেকে কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না।

ক'দিন ধরে খোঁড়া-বাবুর খিলে-ডিঙিটা পাওয়া যাচ্ছে না। তাজ্জব ব্যাপার!

কেউ বলে, 'কুদ্‌ঘাটার গজের মধ্যে আটকে আছে দেখে এলাম।'

কেউ বলে, 'উঁহু, সে ত দেখলাম—'

সরকার-মশাইএর জামাইএর নাকি ক'দিন ধরে পাত্তা নেই···

* * *

ঘটির কানায় লেগে শাঁখাগাছটা গেল ভেঙে।

মা বললে, 'যাবে না? অত খর-খরে হ'লে যাবে না! ভাঙল ত এই বেস্পতিবারটায়?'

চপলা আর-একটা শাঁখা সজোরে আছড়ে ভেঙে বললে, 'ভাঙুক—ভাঙুক, সব ভাঙুক! সব যাক—'

মা গালে হাত দিয়ে চোখ কপালে তুলে বললে, 'ওমা, কি হবে গো! কি অলুক্ষনে পোড়াকপালী মেয়ে গো! এইস্ত্রী-মানুষ শাঁখা দুটো ঠুকে ঠুকে ভাঙলে গা এই বেস্পতিবারে!'

চপলা দুম্ দুম্ করে ঘরে গিয়ে ঢুকে খিল দিয়ে বললে, 'ভেঙেছেই ত, কপাল ত পুড়েইছে! আমার হাড়ও জুড়িয়েছে, তোমরাও নিশ্চিন্তি হয়েছ। এক মাস ধরে একটা মানুষের কি আর অমনি খবর মেলে না! আছে কোন্ আঘাটায় আটকে এতক্ষণ দেখগে যাও। আর দেখবারই বা কার দায় পড়েছে! তোমাদের কাছে শাপ্-কুকুর বইত নয়!'

* * *

খবর মিল্‌ল।

কোমরে দড়ি দিয়ে পাহারাওয়ালা ধরে নিয়ে এল। খিলে-ডিঙি-সমেত বলাই নক্সালের পোলের তলাতেই এসে হাজির! বলিহারি সাহস!—

বুড়ো সরকার-মশাই গিয়ে বললেন, 'আমি বামুন হয়ে তোমার হাতে পৈতে জড়িয়ে মিনতি করছি বাবা, একবারটা মাপ করো!'

খোঁড়া-বাবু অত নরম মাটি নয়! অত সহজে সেখানে দাগ বসে না। বললে, 'বিস্তর সয়েছি মশাই! আপনার জামাই, আর ভদ্রলোকের ছেলে বলে বিস্তর সয়েছি। এ ঝুবকি-পটির কলঙ্ক!'

'তা ত স্বীকার যাচ্ছি বাবা, তবে তোমরা যদি মাপ না করো তাহ'লে করবে কে? তোমরা হ'লে এ পটির মাথা।'

খোঁড়া-বাবু বলাইএর দিকে ভ্রূকুটি করে চেয়ে বললে, 'কিন্তু মাথাও মাঝে মাঝে গরম হয়। যাচ্ছাধন পীরের সঙ্গে মারামারি করতে গেছলেন যে!'

বলাই তখন পাহারাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করছে, 'সাহেব, তোমাদের মুলুকে লুকিয়ে-চুরিয়ে নেশাটা-আশ্‌টা চলবে ত? নইলে বাবা, বেহ্মহত্যার পাতক হবে!'

কথাটা জোরেই বলা হয়েছিল। সবাই শুনলে পেল।

খোঁড়া-বাবু সরকার-মশাইএর হাতটায় একটা টান দিয়ে বললে, 'শুনলেন ত —গাঁজলা এখনও মরেনি। না মশাই, আমি কিছু পারব না।'

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে খোঁড়া-বাবু পারল। খোঁড়া-বাবুর দয়ালু বলে দুর্নাম পটিতে নেই। কিছু বোঝা গেল না।

বলাই বলে, 'তোমার বাবাই ত সব মাটি করলে, ছেলেবেলায় পড়াশুনায় ভালো ছিলাম, সবাই বলত জলপানি পাব, তা অতদূর আর দেখবার ফুরসুৎ হয়নি; এবার ভাবলাম এতদিনে বুঝি ভবিষ্যদ্‌বাণীটা ফলে গেল, সরকারের টাকাটা সৎপাত্রে পড়ল। তা তোমার বাবা হতে দিলে কি?'—রসিকতাটা ভালো জমে না। বলাই নিজেই হো হো করে হাসে। হাসিটাও যেন কেমন মনমরা। বলাইএর হ'ল কি?

চপলা কথা কয় না। বলাই আবার বলে, 'বিদেশে একটা চাকরি পাচ্ছি, যেতে বলো ত যাই—'

'যমের বাড়ি একটা চাকরি জোটে না?'—চপলা তেমনি মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়।

'মিলতে পারে, দরখাস্ত করে দেখিনি।'

বলাই বেরিয়ে যায়।

• • •

—জমাদার বলে, 'সে কি আর এখানে আছে বাবু, যে তাকে দেখতে পাবেন! ছুটকিকে এখন পায় কে?'

বলাই জিজ্ঞাসা করে, 'তার মানে ?'

'খোঁড়া-বাবু তাকে মাসোহারা দেয় ত্রিশ টাকা—তার বাপকে দেয় দশ। তা ছাড়া নগদ কত দিয়েছে কে জানে !'

'আক্‌লু রাজী হ'ল ?'

ওসমান হাতের টাকাটা দু'বার বাজিয়ে বলে, 'দুনিয়া গোলাম—'

বলাই খানিকক্ষণ কি ভাবে, তারপর বলে, 'হাঁ, খোঁড়া-বাবু নতুন বন্ডের গোলা খুল্‌ল ?'

'খুলবে না ? পাটির সবাইকে কানা করে দিলে রাবিশে আর ঘুষে। মুখার্জী-কোম্পানির মাল এখন কোথা থেকে যাচ্ছে ? চারটে নদীর জেলোর রাস্তা থর-থর করছে রাতদিন !'

বলাই বলে, 'বহুৎ আচ্ছা, চল্‌—'

চোখের চেহারা দেখে ভয় পেয়ে ওসমান বলে, 'কোথায় বাবু ?'

'খোঁড়া-বাবুকে সেলাম দিতে।'

ওসমান ধরে রাখতে পারছিল না, কাতর হয়ে বললে, 'বাবু, বড্ড বেসামাল হয়ে পড়েছেন, রাতও অনেক হ'ল—ইদিকে নয়, বাড়ি চলুন।'

বলাই তার হাতটা ধরে টানতে টানতে বলে, 'চুপ, মশালের পোল আর কতদূর বল্‌ না—'

'ওই ত দেখা যাচ্ছে, বাবু। ঘরে চলুন বাবু, রাত দুটো হ'ল।'

'তবে তুই যা।'—বলাই তার হাতটা ছেড়ে দিলে, কিন্তু নিজে টাল না সামলাতে পেরে হোঁচট খেয়ে পড়ল। ওসমান নিজেও বেশ টলছিল, তবু কোনরকমে ধরে তুলে আবার মিনতি করে বললে, 'কোথায় চলেছেন বাবু ?'

'এইটে খোঁড়া-বাবুর নতুন গোলা, না ?'—বলাই থমকে দাঁড়াল।

সমস্ত ঘাট নিস্তব্ধ। মশালের পোলের আলোগুলো নদীর স্থির জলে পড়ে ঝিকঝিক করছিল।

'কটকের তালা ভাঙতে পারবি ?'

ওসমান বলাইএর চোখের দিকে চাইল। অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। বললে, 'বাবু, বাড়ি চলুন।'

'পারবি কিনা বল্‌ ?'

অনেকক্ষণ পরে উত্তর এল, 'পারব।'

তারা তাই হ'ল। পকেটের বোতলটা খালি করে নিঃশেষ করে তেলটা ঢেলে বলাই বললে, 'দে দেশলাইটা—'

• • •

লোকে লোকারণ্য। তিনটে দমকলে আগুন সামলাতে পারছিল না। আকাশ যেন ভেঙে রাঙা হয়ে উঠছে। পোনাঘাট ছাড়িয়ে কেঠোপটি পর্যন্ত বাতাসে পোড়া খড়ের গন্ধ আর উড়ো ছাই।

ওসমানের কাঁধে ভর দিয়ে যেতে যেতে বলাই বললে, 'দেখলি সেলাম? নেশাখোর মানুষ—আমাদের রাগ করতে নেই, তবে আমাদের সেলাম এমনি!'

কারা বলতে বলতে যাচ্ছিল, 'আহা, গরীব বেচারা গো। সর্বস্ব দিয়ে গোলাটি করেছিল।'

'গরীব বললে হবে কি বাপু! ব্রহ্মশাপ। মহাপাতক না হ'লে অগ্নিদেব দেখা দেন না।'

'তোমার মাথা! পাশেই খোঁড়ার গোলাটা তাহ'লে রয়েছে কি করতে। কত মহাপাতক করেছিল ঐ নিরীহ গরীব বেচারী!'

বলাইএর কানে কোনো কথাই যায় না।

পলাতকা

প্রথমে ট্রেন, তারপর মোটর-বাস, তার পর গরুর গাড়ি।

গরুর গাড়ি নয় ; স্বদেশী ট্যাঙ্ক-বললেই হয়। রাস্তাঘাট কিছু দরকার হয় না। খানাখন্দ মাঠ জলা সব অনায়াসে পার হয়ে যায়।

অবস্থা কাহিল শুধু যে চড়ে তার। শরীরের হাড়গোড়গুলো যে আস্ত আছে নামবার পর প্রথমটা বিশ্বাস হতে চায় না !

গাড়োয়ান গাড়ি থামিয়ে বললে, 'গাড়ি আর যাবেনা বাবু, এই আলটুকু হেঁটে পার হয়ে যেতে হবে।'

বাসব গাড়ি থামতেই নেমে পড়েছিল কাঁচামাটির রাস্তায়। সামনের দিকে চেয়ে বললে, 'এ ছাড়া আর রাস্তা ছিল না, গাড়োয়ান ? বাড়ির একটু কাছাকাছি যাতে নামা যায়।'

'থাকবেনা কেন বাবু ! আপনি তাড়াতাড়ি আসতে চাইলেন, তাই এ দিক দিয়ে এলায়। গাঁয়ের ভেতর দিয়ে যেতে গেলে আরো একটি ঘণ্টা লাগত।'

আর বাক্যব্যয় বৃথা। বাসব ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে হোল্ডঅল আর স্যুটকেসটা নামিয়ে নিলে।

গাড়োয়ানের একটু তবু মায়া-মমতা আছে। গাড়ি থেকে নেমে নিজেই ভারী হোল্ডঅলটা কাঁধে তুলে নিয়ে বললে, 'চলেন বাবু, আমি পৌছে দিয়ে আসি। শহরের মানুষ আপনারা, মোট-ঘাট নিয়ে আলের ওপর দিয়ে হাঁটা কি আপনাদের কাজ !'

গাড়োয়ান কথা বলে একটু বেশী। মোটর-বাস থেকে নেমে জামকুনিতে গরুর গাড়িতে চড়ার পর থেকেই বাসব তার পরিচয় পেয়েছে। বাছুরডোবাতে যেতে হবে শুনেই প্রথমে অন্য গাড়োয়ানদের হটিয়ে দিয়ে সে বলেছে, 'আরে, বাবু আমার আপন গাঁয়ের লোক দেখতে পাচ্ছিস নে ! আসেন বাবু, আসেন। চৌধুরীদের বাড়ি যাবেন ত ?' অন্যদের দিকে ফিরে আবার সগর্বে বলেছে, 'আমাদের জমিদার বাড়ির কুটুম, বুঝেছিস—ঝুলন দেখতে এসেছেন, না বাবু ?'

বাধ্য হয়ে বাসবকে প্রতিবাদ করতে হয়েছে। না, ঝুলন দেখতে সে আসেনি, চৌধুরীবাড়িও সে যাবে না। সে যাবে বাছুরডোবার কমল সরকারের বাড়ি।

কমল সরকারের বাড়ি! গাড়োয়ানের জ-দুটো একটু বুঝি কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে, কিন্তু অপ্রস্তুত হবার পাত্র সে নয়।—'ও, দক্ষিণপাড়ার সরকারদের বাড়ি! ঠিক আছে বাবু, ঠিক আছে। বাছুরতোবার কারুর ঘর চিনতে কি আমার বাকি আছে?'

গাড়িতে ওঠবার পর খানিকক্ষণ বাদে কিন্তু সে জিজ্ঞাসা করেছে, 'কার বাড়ি বললেন বাবু তখন, কমল সরকারের না?' বাসব একটু বিরক্ত স্বরে বলেছে, 'হ্যাঁ। তুমি ত তখন খুব বাহাদুরি দেখালে, গাঁয়ের সবাইকেই নাকি চেনো!'

বিরক্তিটা গ্রাহ্য না করে গাড়োয়ান হেসে বলেছে, 'তা আর চিনিনে বাবু! বলে, গাঁয়ে তিনপুরুষ কেটে গেল! আর গাঁয়ে মানুষই বা ক'টা, যে চিনব না? কোলকাতায় বোমার ভয়ে যা কিছু নতুন আমদানি হয়েছিল তাও আবার সব বেঁটিয়ে বিদেয় হয়ে যাচ্ছে। খাঁচার ময়নায় কি বেশীদিন এমন বনবাদাড়ে চরে বেড়ান পোষায়!'

একটু থেমে একটা খানায় ওপর দিয়ে বেপরোয়া ভাবে গাড়িটাকে পার করিয়ে আবার সে বলতে শুরু করেছে, 'আপনি কমল সরকার বললেন কিনা, তাই একটু ধোঁকা লেগেছিল। কিছু মনে করবেন না বাবু, গাঁয়ে দেশে সবাই ওনারে বলে কমু সরকার। তা ওনার বুকের পাটা আছে বাবু, গাঁ ছাড়িয়ে এই শ্মশানের কাছে পাকাদের পোড়ো ভিটেটায় নইলে কেউ বসত করে! কায়েত বামুনের ঘরের ছেলে হয়ে ঘানি-ঘোরানও বড় কম কথা নয়।'

গাড়োয়ানের এ সমস্ত বিবরণ শুনতে বাসবের যে আপত্তি আছে তা নয়। তবু কর্তব্যবোধে সে বাধা দিয়ে একবার বলেছে, 'বলি, কথা ত অনেক বলছ—একটু তাড়াতাড়ি সন্ধ্যার আগে পৌঁছে দিতে পারবে?'

'সে আর বলতে হবেনা বাবু। দেখতে দেখতে পৌঁছে যাবেন। দেখছেন না—বলদ ত নয়, পক্ষিরাজ ঘোড়া!' নিজের বাহাদুরিটা প্রমাণ করবার জন্যেই সে সজোরে গরু-দুটোর ল্যাজ ম'লে সামনের ধাবা মাঠটার ওপর দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে তাদের ছুটিয়েছে এবার।

পৌঁছোতে পৌঁছোতে তবু সন্ধ্যে হয়ে গেছে। এতক্ষণ ধরে গাড়োয়ান গাড়ি ও মুখ সমানভাবে চালিয়ে এসেছে। কমল সরকার থেকে গাঁয়ের আরো পাঁচ-দশ জনের খবরই এখন বাসবের জানা। কমল সরকারের যে গাঁয়ের কারুর সঙ্গে বনিবনা নেই, যে চাষাভূষোর সঙ্গে সে একেবারে চাষা হয়ে মিশে কাটায়

তারাও যে তাকে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলে, দক্ষিণপাড়ার সরকাররা যে তার চাল-চলনের দোষে তাকে জ্ঞাতি বলে স্বীকার না করে জাতে ঠেলে দিয়েছে—এসব কোনো কথাই তার শুনতে বাকি নেই।

সন্ধ্যার আবছা আলোয় সরু আলের ওপর দিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে যেতেও গাড়োয়ানের মুখ বন্ধ হয় না।

'তিন বছরের মধ্যে এই প্রথম কমল সরকারের বাড়ি ভাড়া নিয়ে এলেন, বাবু। বৃন্দ লাগা ইস্তক গাঁয়ের সব ঘরে অতিথি কুটুম এসেছে, শুধু ওদের বাড়ি বাদে।'

আলের পথ পার হয়ে এবার একটা ঝাঁকড়া আমবাগানের ভেতর দিয়ে তারা চলেছে। সন্ধ্যার অন্ধকার আগে থাকতেই যেন এখানে জমাট বেঁধে আছে। গাড়োয়ান এখনো বকতে-বকতে আগে আগে চলেছে। তার কথায় বাসবের কিন্তু আর কান নেই। তিন বছর আগেকার কথাই সে ভাবছে। তিন বছর! হ্যাঁ, তিন বছরই প্রায় হ'ল কমল সরকার একদিন হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে গেছল। হয়ত বোমার ভয়েই হবে। শহর থেকে তখন অনেকেই বোমার ভয়ে পালিয়েছিল। কিন্তু কমল সরকারের মতো এমন নিরুদ্দেশ হয়ে নয়।

আমবাগানটা পার হতেই অন্ধকার আবার ফিকে হয়ে এল। ডাইনে বাঁধ-দেওয়া একটা বড় পুকুর। সঙ্কীর্ণ রাস্তাটার বাঁ ধারে একটা বিশাল পোড়ো বাড়ির ধ্বংসাবশেষের একপাশে একটা নতুন মাটকোঠা অত্যন্ত বেমানান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাটকোঠাটি জোড়াতালি দিয়ে তৈরী। পুরোনো ভিটের দেয়াল সুবিধেমতো কাজে লাগিয়ে তার ওপর মাটির গাঁথুনি দেওয়া হয়েছে।

কাছে আসতেই ভেতরের দিক থেকে একটানা একটা গোঙানী শব্দ শোনা গেল। গাড়োয়ান তখন তার মোট বাইরের দরজার পাশে নামিয়ে ফেলেছে; হেসে বললে, 'যাঁদিপাড় বুড়ো শুনতে পাচ্ছেন, বাবু?' বাসব উত্তর না দিয়ে তাকে কিছু আরো বকশিশ দিয়ে বিদায় করে দিল।

সমস্ত সুদীর্ঘ রাস্তায় আসতে যে অনুভূতিটাকে জোর করে চাপা দিয়ে এসেছে, বাসবের মনে এতক্ষণে সেটা যেন সুযোগ পেয়ে প্রবল ভাবে মাথা-চাড়া দিয়ে উঠল। একটা গভীর সঙ্কোচ, প্রচণ্ড একটা দ্বিধা। এমন করে আসায় যেন নিজের ওপর একটা ধিক্কার। কিন্তু এখন আর ফেরা যায় না।

বন্ধ দরজায় বাসব ঘা দিলে। নিজের সঙ্কোচটা কম করবার জন্য একটু জোরেই ঘা দিলে। দরজাটা বন্ধ নয়, ভেজান ছিল মাত্র। একটু ঘা লাগতেই

ঘুরে গেল। সামনে একটা উঠোন, উঠোনের ডান দিকেই ঘানি-ঘর। বলদের গলার ঘণ্টার ঠুং-ঠুং শব্দের সঙ্গে ঘানির আওয়াজ এখন আরো স্পষ্ট। বাঁ দিকে মাটকোঠার দুটি ঘর ও বারান্দা দেখা যাচ্ছে। কোথাও মানুষ-জনের সাড়াশব্দ নেই।

হোল্ডঅল আর স্যুটকেসটা দু'হাতে নিয়ে কোনরকম দ্বিধা না করে বাসব এবার ভেতরে ঢুকে গেল। মাটির দাওয়ার ওপর সেগুলো নামাবার সঙ্গে সঙ্গে মাটকোঠার দোতলা থেকে কার ভারী পায়ের নামার শব্দ শোনা গেল। হাতে একটা লণ্ঠন নিয়ে কমল সরকার নিজেই নেমে আসছে।

হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে বাসবকে এমনভাবে বাড়ির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তার চমকে ওঠবারই কথা। কিন্তু কমল সরকার চমকাল না। খানিক নিস্তব্ধ হয়ে বাসবের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থেকে গম্ভীর স্বরে বললে, 'তোমার এতখানি সাহস হবে ভাবিনি।'

বাসব কোনো উত্তর না দিয়ে একটু হাসল মাত্র। লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোয় সে হাসি দেখা না-যাবারই কথা।

কমল সরকার তেমনি গম্ভীর মুখে আবার বললে, 'কাল দুপুরের আগে আর ফিরে যাবার গাড়ি নেই। ততক্ষণ পর্যন্ত এখানে থাকতে পার। এসো—' হোল্ডঅলটা একহাতে তুলে নিয়ে সে আগে আগে আলো দেখিয়ে মাটকোঠার ওপরের একটি ঘরে বাসবকে নিয়ে গেল। তারপর হোল্ডঅল ও লণ্ঠনটা নামিয়ে রেখে বললে, 'অসুবিধে এ ঘরে তোমার যথেষ্টই হবে। তবে তার জন্যে আমার দায়িত্ব বা দুঃখ কোনোটাই নেই। ততক্ষণ মোটঘাট খোলো, আমি তোমার জন্য সব ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি।'

এতক্ষণের মধ্যে বাসব একটি কথাও বলেনি। এইবার হাত তুলে কমলকে থামিয়ে ঈষৎ হেসে বললে, 'দাঁড়াও, ব্যবস্থা যা করবার একটু পরে করলেও চলবে। আপাততঃ একটা কথা তোমার জানা দরকার। কাল দুপুরেই ফিরে যাব বলে আমি আসিনি। আর যদি ফিরে যেতেই হয়—'

বাসব কথাটা শেষ করতে পারলে না। কমল সরকার বজ্রকঠিন স্বরে ধীরে ধীরে বললে, 'ফিরে তোমায় যেতেই হবে।'

বাসব একটু হাসল। 'তোমার এ বাড়ি ছাড়াও গাঁয়ে থাকবার জায়গার বোধ হয় অভাব হবে না! তুমি পছন্দ করনা জানলে কেউ আমায় জায়গা দেবে না, গাঁয়ের লোকের সঙ্গে এখন সদ্ভাবও বোধ হয় তোমার নেই।'

কমল সরকার প্রশ্নটা কোনো উত্তর দিলে না। খানিক অকৃতভাবে বাসবের দিকে চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে বললে, 'তুমি অত্যন্ত ভুল করছ বাসব, একটুখানি শুধু বললাম। তিন বছর আগে যেখানে ছেদ পড়েছিল সেখানকার জের আর টানা যায় না, এইটুকুই তোমায় বোঝাতে চাইছি।'

'ছেদ ত আমি ফেলিনি যে জের টানতে আমার বাধা থাকবে। তুমিই বরং ভেবেছিলে সত্যকে অস্বীকার করে লুকিয়ে পালিয়ে গেলে সমস্তায় ছেদ ফেলা যায়। তা যে যায় না, তিন বছর বাদে তাই প্রমাণ করতে আমি এসেছি।'

এতক্ষণ বাদে কমল সরকারের মুখে যেন একটু হাসির আভাস দেখা গেল—অত্যন্ত দুর্বোধ হাসি। বললে, 'তিন বছর বাদে তাই প্রমাণ করতে এসেছ! তিন বছর ধরে কি করছিলে?'

'তোমাদেরই খোঁজ করছিলাম। তোমার বুদ্ধির সত্যি তারিফ করি। এরকম জায়গায় এমনভাবে যে তুমি আত্মগোপন করতে পার তা ভাবতে পারিনি।'

'এটা আমার আত্মগোপন নয় বুঝলেই ভাবতে পারতে।'

'আত্মগোপন নয়?' বাসবের স্বর এবার উত্তেজিত।—'সাধ করে এই নামহীন গাঁয়ে তুমি চাষীদের সঙ্গে চাষী হয়ে আছ? নিজের খুশিতে কলুর ঘানি ঘুরিয়ে মাটির মানুষ হবার ব্রত নিয়েছ, এই তুমি আমায় বিশ্বাস করতে বলো!'

'বিশ্বাস করতে তোমায় কিছুই বলি না। শুধু একটা কথা ভেবে দেখতে বলি যে, নিজের স্বার্থে একা আমি আত্মগোপন করে থাকলে এই তিন বছর তুমি কি আমাদের খোঁজ পেতে না? তোমায় খোঁজ দেবার লোক কি কেউ ছিল না? তার হাত-পা বেঁধে আমি নিশ্চয় রাখিনি!'

'তাও তোমার পক্ষে এখন অসম্ভব নয় মনে হচ্ছে। তবে জেনে রাখো, শেষ পর্যন্ত খোঁজ তার কাছেই পেয়েছি। রমার চিঠি পেয়েই আমি আসছি।'

খানিকক্ষণ ঘর একেবারে নিস্তব্ধ। কমল সরকার যেন হঠাৎ একেবারে অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। বাসব উৎসুক ভাবে তার দিকে তাকিয়ে।

অনেকক্ষণ বাদে কমল ধীরে ধীরে অত্যন্ত শান্তস্বরে জিজ্ঞাসা করলে, 'রমা তোমায় চিঠি দিয়েছে? কবে?'

'দিয়েছে প্রায় তিনমাস আগে। ঠিকানা বদলের দরুন সে চিঠি অনেক হাত ঘুরে মাত্র কয়েকদিন হল আমার হাতে পড়েছে।'

'রমা তোমায় আসতে লিখেছিল?'

বাসব উত্তর দিল না। কমল শান্ত স্বরে আবার জিজ্ঞাসা করলে, 'বলো, রমা তোমায় অনুরোধ করেছিল আসতে?'

'না, স্পষ্ট করে লেখার মেয়ে সে নয় তুমিও জান। কিন্তু চিঠির প্রত্যেক ছত্রে সেই প্রার্থনাই আমি শুনেছি। আকুল হয়ে সে মুক্তি চেয়েছে।'

'হ্যাঁ, মুক্তিই সে চেয়েছে।' হঠাৎ বাসবকে অবাক করে দিয়ে কমল নীচে নেমে চলে গেল।

বাসব অনেকক্ষণ চুপ করে রইল দাঁড়িয়ে। কমল সরকারকে ঠিক যেন এরকম চেহারায় দেখবার আশা সে করেনি। পরিবর্তন তার বাইরে কিছু হয়ত হয়নি—কিন্তু তবু মনে হয় তিন বছর আগে যে লোকটির সঙ্গে জীবনের চরম সংঘর্ষের জন্যে সে প্রস্তুত হয়েছিল, এ যেন সে মানুষ নয়। বাইরে তেমনি কঠিন তেমনি অনমনীয়, কিন্তু আসলে যেন ছায়া দিয়ে তৈরী। আঘাত করলে তা যেন শূন্যে হারিয়ে যায়, ফিরে আসেনা প্রতিহত হয়ে।

মোটঘাটগুলো খোলার উৎসাহ বাসবের হয় না। ঘানির গোঙানি থেমে গেছে। রাত্রির গাঢ় স্তব্ধতায় শুধু একটু ক্ষীণ শব্দের ঢেউ উঠছে কোনো দূরের মন্দির থেকে—আরতির ঘণ্টাধ্বনি।

ক্লান্তভাবে পাশের তক্তপোষের ধারে সে বসে পড়ে। কেমন যেন তার সন্দেহ হয়, যে নিদারুণ সংগ্রামের জন্য সে তৈরি হয়ে এসেছিল তার উপযুক্ত শক্তি তার মধ্যে আর নেই।

রমার সঙ্গে দেখা হওয়াটা এখন বুঝি একান্ত দরকার। কিন্তু সে কোথায়! আশ্চর্য, এখনো পর্যন্ত রমার কোনো সাড়া সে পায়নি। সে যে এসেছে রমা কি এখনো তা জানে না! মনে হয় এই অবস্থাতেই নীচে নেমে গিয়ে একবার খোঁজ করলে হয়। কিন্তু কেমন একটু সঙ্কোচ হয়। না, রমা নিশ্চয়ই আসবে। সাধারণ সৌজন্যের খাতিরেও তার এতক্ষণে একবার আসা উচিত ছিল। কিন্তু রমার ব্যবহার চিরকালই অদ্ভুত। তা না হ'লে তাদের তিনজনের এই দুশ্ছেদ্য জটই ত পাকিয়ে উঠত না।

সে ও প্রথমে সমস্ত মেনেই নিয়েছিল। ভেতরে যত বড় বেদনা ও আকুলতাই থাক, বাইরে তার কিছুই প্রকাশ হতে দেয়নি। ছায়ার মতো জড়িয়ে থেকেছে ওদের জীবনের সঙ্গে,—ছায়ার মতোই কোনো দাবি না রেখে, কোনো দাগ না ফেলে। নিজের মনের আগুন তার শাসনেই ছিল, কিন্তু আর কোথায় সে আগুন যে বিস্ফোরণের সীমায় এসে পৌঁছেছে সে খবর সে পায়নি।

তারপর সেই আশ্চর্য দিন! প্রায় ঘণ্টা দুই বিস্মিত ও অধীর হয়ে অপেক্ষা করার পর হঠাৎ ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকে রমা উগ্রস্বরে বলেছিল, 'কেন তুমি এখনো বসে আছ! তাচ্ছিল্য, অপমান এসব বোঝবার ক্ষমতাও কি তোমার লোপ পেয়েছে!'

সত্যিই কিছু বুঝতে না পেরে বাসব সবিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়েছে। এ আঘাত এমন কল্পনাতীত, এমন অপ্রত্যাশিত যে আহত বোধ করবার অবকাশই যেন তার হয়নি।

এরপরই রমা ভেঙে পড়েছে।—

'তোমায় অনুরোধ করছি, আর তুমি এখানে এসো না!'—রমার স্বর চাপা কান্নায় ভারী। চোখদুটির রক্তিমা দেখে বোঝা যায় অনেক অশ্রু সে ইতিমধ্যে মার্জনা করেছে।

বাসব এবার ব্যথিতস্বরে বলেছে, 'তোমার অনুরোধ আমি রাখব, কিন্তু কারণটা জানবার অধিকারও কি আমার নেই?'

'কারণ, তুমি প্রতিদিন সামনে না থাকলে নিজের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত হয়ত আমার এত অসহ্য হয়ে উঠবে না। কিছু হয়ত যন্ত্রণা তার কমবে।'

স্তব্ধ হয়ে অনেকক্ষণ বসে থেকে বাসব ধীরে ধীরে বলেছে, 'নিজের ভুল যদি সত্যিই বুঝতে পেরে থাকো, রমা—'

রমা উত্তেজিত ভাবে বাধা দিয়ে বলেছে, 'তাহ'লে কি করা উচিত বলে তুমি মনে করো? আত্মঘাতী হওয়া?'

'না, যা সত্য তাকে সাহসের সঙ্গে স্বীকার করা।'

'সত্যকে স্বীকার করার সাহস!' রমার মুখে একটু যেন বিদ্রূপের হাসি, 'সে সাহস তোমার আছে? সে সাহস থাকলে এ ভুল তুমি আমায় কেন করতে দিয়েছিলে? কেন বাধা দাওনি?'

'অন্যায় অবিচার কোরো না, রমা! বাধা দেবার কোনো অবকাশ সেদিন তুমি আমার জন্যে রাখনি। প্রচণ্ড আঘাত আমি পেয়েছিলাম, বিমূঢ়ও হয়েছিলাম তোমার এই আকস্মিক সঙ্কল্পে, কিন্তু নিজের মনের নির্দেশই তুমি অনুসরণ করছ এই কথা মেনে নেওয়া ছাড়া আমার কোনো উপায় সেদিন ছিল না। আজ যখন তোমার নিজের মুখ থেকে একথা শুনেছি—'

'এখন কি করতে চাও?'

'যা সত্য তাই নিভয়ে স্বীকার করতে ও করাতে চাই।'

বাসব সেই চেষ্টাই তারপর করেছে।

কমল সরকার কঠিন মুখে সমস্ত শুনে বলেছে, 'তাহ'লে আজ থেকে এখানে আসতে তোমায় মানা-ই করছি, বাসব।'

বাসব সত্যিই বিস্মিত হয়ে বলেছে, 'এই কি তোমার এ সমস্যার মীমাংসা?'

'হ্যাঁ, আমার এই মীমাংসা। জীবনটা আমার কাছে খড়ি দিয়ে শ্লেটের লেখা নয় যে, যা খুশি লিখে যখন খুশি মুছে ফেলা যায়। আমার কাছে তা বাটালি দিয়ে পাথরে খোদাই। সামান্য সাময়িক আবেগের ঝড়বৃষ্টিতে তা ধুয়ে মুছে দেওয়া চলে না।'

'কিন্তু বাটালির দাগ যেখানে বসেনি সেখানে কি অধিকার তোমার আছে?'

'সহজ সরল, সনাতন স্বামিত্বের অধিকার—যে অধিকারে পুরুষ একদিন নারীকে অসূর্যম্পশ্যা করে রাখত!'

'হৃদয়ের সত্যের কোনো দাম তোমার কাছে নেই?'

'না। কারণ, ও জিনিসটি আসলে সন্ধ্যার মেঘ। ক্ষণে ক্ষণে খেয়ালমতো ওর রং ও চেহারা বদলায়। যেদিন তোমায় অবহেলা করে রমা আমায় বেছে নিয়েছিল সেদিন হৃদয়ের সত্য বলে ও যা বুঝেছিল, আজ যদি তার রং পালটে গিয়ে থাকে তা নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন আমি বুঝি না। রমার বাস্তব সত্তাটুকুই আমার পক্ষে যথেষ্ট।'

বাসব উত্তেজিত হয়ে উঠেছে,—'তার মানে দরকার হ'লে গায়ের জোরেও তুমি তাকে ধরে রাখতে চাও?'

'শুধু গায়ের জোর নয়, সমাজ আইন সব-কিছুর জোরে।'

'এ অন্যায় আমরা নীরবে মেনে নেব তুমি মনে কর!'

'না মানবার স্বাধীনতা তোমাদের আছে। তবে এ-বাড়ির দরজা আজ থেকে তোমার জন্যে বন্ধ জানবে।'

বাড়ির দরজা তার পরদিন সত্যি বন্ধ দেখা গেছে। শুধু বন্ধ নয়, তালা-দেওয়া বাইরে থেকে। কমল সরকার আগের রাত্রে সস্ত্রীক কোথায় যে গেছে কেউ জানে না।

খেতে যাবার ডাক এল অনেক রাত্রে। অত্যন্ত অপ্রসন্ন ও উদ্বিগ্ন মন নিয়ে বাসব এতক্ষণ কোনরকমে স্নান ও বেশ পরিবর্তনের কাজ সেরেছে। এখনো পর্যন্ত রমার দেখা না পাওয়াটা সত্যই বিস্ময়কর।

খেতে বসেও রমার দেখা না পেয়ে সে সত্যি অস্থির হয়ে উঠল। কমল সরকার তার সঙ্গে খেতে বসেছে। পরিবেশন করছে একজন পরিচারক।

কিছুক্ষণ নীরবে খেয়ে যাবার পর আর সে নিজেকে সম্বরণ করতে পারলে না। যথাসম্ভব নিজের কণ্ঠ সংযত রাখবার চেষ্টা করে জিজ্ঞাসা করলে, 'রমা কোথায় ?'

কমল সরকার তার দিকে ফিরে তাকাল। তার চোখে সেই কঠিন অদ্ভুত দৃষ্টি।—'সে এখানে নেই।'

'রমা নেই! তাহ'লে কোথায় সে ?'

'আগেই ত বলেছি, তার সঙ্গে তোমার দেখা হবেনা। সে আশা ছেড়ে দাও।'

বাসব খাওয়া ছেড়ে উঠে পড়ল। তীক্ষ্ণ উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, 'তুমি ভুল করছ, কমল। তিন বছর বাদে এতদূর যদি আসতে পেরে থাকি, তার সঙ্গে দেখা না করে অন্ততঃ যাবনা এটুকু তোমার বোঝা উচিত।'

কমল সরকারও খাওয়া ছেড়ে তখন উঠে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এ কথার কোনো জবাব সে দিলে না।

বাসব আবার তীব্র কণ্ঠে বললে, 'আমার আগেই ভাবা উচিত ছিল যে, আমাদের দেখা না হতে দেওয়ার জন্যে কোনো শয়তানিতে তুমি পেছপাও হবে না। কিন্তু তবু জেনে রাখ, তাকে খুঁজে আমি বার করবই।'

কমলের মুখে এবার একটু বিষণ্ণ হাসি যেন দেখা গেল। ক্লান্ত স্বরে বললে, 'এখনও বলছি বাসব, কাল দুপুরের গাড়িতে ফিরে যাওয়াই তোমার ভালো।'

'না। রমা কোথায় আছে, অন্ততঃ সেটুকু না জেনে নয়। তুমি না বললেও এ গাঁয়ে সে খবরটুকু দেবার লোকের অভাব হবে না, তুমি বোধ হয় ভালো করেই জান।'

কমল সরকার খানিকক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে বললে, 'বেশ, রমার কাছেই তোমায় নিয়ে যাচ্ছি চলো।'

অন্ধকারে বেশী দূরে কোথাও যেতে হয় না। বাঁধ-দেওয়া যে দীঘিটি বাসব আসবার পথে পেরিয়ে এসেছে তারই একপ্রান্তে বাঁকড়া একটা গাছের তলায় গিয়ে কমল দাঁড়িয়ে পড়ে।

যাদবের হৃৎস্পন্দন একমুহূর্তের জন্যে থেমে গিয়ে একটা তীব্র বেদনায় ঢেউ সমস্ত চেতনা যেন আচ্ছন্ন করে দেয়। আর তার বুঝতে কিছু বাকি নেই।

স্তব্ধ হয়ে বহুক্ষণ সে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে থাকে। অনেকক্ষণ পরে কমলের কথা তার কানে আসে। কমল এতক্ষণ ধরে কি বলেছে সে জানে না।

কমলের প্রায় অস্ফুট স্বর শোনা যায়: নিজের ইচ্ছেয় আত্মগোপন আমি করিনি এইটুকু আজ তোমায় বিশ্বাস করতে বলি। সে রাত্রে সে-ই আমায় বলেছিল, 'আমায় দূরে কোথাও নিয়ে চলো। এত দূরে, যেখানে নিজের কাছ থেকেও লুকিয়ে থাকা যায়। সেখানে মানুষ শূন্য আকাশের দিকে চেয়ে নয়—কঠিন মাটির সঙ্গে এক হয়ে জীবন কাটায়। সে মাটির এত দায়, এত দাবি যে তাই মেটাতেই সমস্ত মন ক্লান্ত হয়ে যাবে, কোনো ব্যর্থ স্বপ্নের অবসর আর থাকবে না।'

কমল চুপ করে। তারা-ভরা আকাশের কোন্ প্রান্ত থেকে একটা দমকা হাওয়া দীর্ঘশ্বাসের মতো ঝাঁকড়া গাছটাকে আন্দোলিত করে চলে যায়।

আবার কমলের কণ্ঠ শোনা যায়, 'আমরা কেউ তাকে চিনিনি; সে নিজেও নিজেকে চেনেনি—এই হ'ল আমাদের সকলের সমস্ত দুঃখের মূল। নিজেও সে তাই সুখী হয়নি, কাউকে সুখী করতেও পারেনি।'

একটু থেমে কমল আবার বলে: সব শেষে সে বলেছে, 'আমার জন্যে দুঃখ কোরো না। কারুর ভালোবাসার আমি যোগ্য নই। মনের আয়নায় শুধু নিজেকেই নানাভাবে আমি দেখেছি, জানলা খুলে বাইরে তাকাতে কোনদিন শিখিনি।'…

হয়ত সমস্ত কথাই কমলের বানানো। হয়ত রমার মৃত্যুর জন্যেও সে-ই দায়ী। তবু তারার আলোয় অস্পষ্ট উদাস এই প্রান্তরের মাঝে দাঁড়িয়ে কথাগুলো কেমন বিশ্বাস করতেই ইচ্ছা হয়।

জ্বর

সন্ধ্যে সাতটায় কম্প দিয়ে জ্বর এল।

লেপ কাঁথা যেখানে যা ছিল, চাপা দিয়েও সে কাঁপুনি থামান যায় না। একটা প্রচণ্ড উন্মত্ত আলোড়ন শুধু যেন শরীর নয়, সমগ্র সত্তার অন্তস্তল থেকে উদ্দাম হিমশীতল তরঙ্গের পর তরঙ্গে সমস্ত চেতনা ক্ষণে ক্ষণে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত প্লাবিত করে দিয়ে যাচ্ছে।

একমুহূর্তে সব-কিছু গেল বদলে। কোনো ধারাবাহিকতা আর নেই চেতনার।

জীবনের একটি নিটোল চমৎকার দিন যেন টুকরো টুকরো হয়ে, ভেঙে ছড়িয়ে, এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে মিশে।

শেড-দেওয়া আলোয় প্রায়ান্ধকার একটি ঘর ক্রমশঃ যেন সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছে। নমিতার একটা ঠাণ্ডা হাত মাথার ওপর থেকে বহুদূর যাচ্ছে স'রে। দেওয়ালে অদ্ভুত সব ছায়ার নক্সা যেন জীবন্ত হয়ে চলাফেরা করছে। উড়ে যাওয়া মেঘের মতো একটা মশারির চাল হঠাৎ মুখের উপর এল নেমে। পাশের বাড়ির কর্কশ রেডিও-নিনাদ, ওধারে বারান্দায় কাদের আলাপ হয়ে উঠল।

তার-ই মধ্যে বয়ে যাচ্ছে আশ্চর্য ঠাণ্ডা এক নদী, স্টীমারের একটু মৃদু কম্পন, নেপথ্যে প্রপেলারের একটা একঘেয়ে আওয়াজ, রেলিংএর ওপর দিয়ে ঝুঁকে-পড়া একটি মুখ—স্নিগ্ধ পরিচ্ছন্ন, তবু কেমন যেন একটু কঠিন।

বারান্দায় ওরা আমারই কথা আলাপ করছে মনে হয়।

'আর দু'দিন সবুর করলে কি এমন রাজ্যনাশ হত! এই শরীরে আজকালকার পথের এত ধকল সহ্য হয়!'

পথের ধকল? হ্যাঁ, ধকল কম নয় বটে। স্টীমার-ঘাটে সেই জনসমুদ্রের দিকে চেয়ে সত্যি আতঙ্ক হয়েছিল। মনে হয়েছিল স্টীমারে সাতদিন অপেক্ষা করেও পৌঁছাতে পারবে না। এত মানুষ কখনো একটা স্টীমারে ধরতে পারে! গ্যাং-ওয়েটা যেন মানুষের ভারে ভেঙে পড়বে। হরেক রকম মানুষের একটা জমাট জটলা। কুলী, ভদ্রলোক, মেয়ে, ভারি সঙ্গে বিচিত্র বিপুল মালপত্রের লট-বহর।

…মাথার ভেতর একটা ঠাণ্ডা স্রোত যেন ধীরে ধীরে নামছে। মমতাই বুঝি আইস-ব্যাগটা ধরে আছে। কোথায় কারা বাজার-দর নিয়ে আলাপ করছে।—

'আগুন! আগুন! যা কিছু ছুঁতে যাও সব আগুন।'

'আর মারে গেছে চাষী-মজুর, এবার আমাদের পালা।'

'দুধ লোকের খাবার নেই ত, রোগীর ওষুধ!'

'তবু কলকাতায় কিরকম ভিড় দেখেছ—বেড়েই চলেছে।'

…ওপরের ডেকে ওঠবার সিঁড়িটার কাছে কেমন করে পৌঁচেছিলাম, নিজেই জানি না। নিজের ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় নয়, সমবেত জনতার একটা নিরবচ্ছিন্ন চাপে শুধু এগিয়ে চলেছি।

সিঁড়ির ওপরের ডেকের ফোকরটা যেন একটা হাঁ-করা বিভীষিকা। কুলীদের মাথায় মালগুলো বিপজ্জনক ভাবে কাৎ হয়ে আছে। ওপরে মানুষের নিরেট দেওয়াল ভেদ করে কোনদিন উঠতে পারব মনে হয় না। দুঃসহ দমবন্ধ-করা গরম, তারি মধ্যে হঠাৎ চিৎকারের কোলাহলটা যেন আরো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।

অর্ধসচেতন ভাবে বুঝতে পারলাম সমূহ বিপদ ঘনিয়ে এসেছে। সিঁড়ির ওপরের ধাপের একটা কুলীর মাথার ওপরকার মালের পাহাড় টলে গিয়ে খসে পড়ার উপক্রম।

সরে যাবার জায়গা নেই, দুর্বল হাতে সেই বিশাল স্যুটকেস-ট্রাঙ্কের পাহাড়ের পতন নিবারণ করা অসম্ভব। অভিভূতের মতো নিশ্চেষ্টভাবে শুধু মোট ঘাড়ের ওপর পড়বার প্রতীক্ষায় আছি, অসহায়ভাবে পেছনে অনেকের কলরবের মধ্যে নারী-কণ্ঠের একটা চীৎকার শুনলাম। আপনা হতে একবার চকিতে মুখটা পিছন দিকে ঘুরে গেল। একটি অদ্ভুত কম্পিত মুহূর্ত—আতঙ্ক…বিস্ময়…কেমন একটু আকৃতি।

পরমুহূর্তে কোলাহলের তীব্রতা আবার স্বাভাবিক খাদে নেমে এল, মালের পাহাড় কেমন করে যেন আপনা থেকেই দৈববলে সামলে গেছে, মাথার ঠিক ওপরে একটু ফাঁক দেখা দিয়েছে।

স্যুটকেসটা কোনো রকমে টেনে নিয়ে ওপরে গিয়ে উঠলাম।

ওপরেও সেই জনসমুদ্র। তিলধারণের জায়গা নেই। স্যুটকেসটা কোনোরকমে পেতে বসবার একটা ফাঁক খোঁজবার জন্যে দুর্বল ভাবে চারিদিকে তাকাচ্ছি—পেছন থেকে আবার শুনলাম, 'আসুন উঠিয়ে দেব, [illegible] এদিকে।'

যিনি এ সম্ভাষণ করলেন তাঁর মুখের দিকে ফিরে তাকালাম। মুখ থেকে পোশাক, পোশাক থেকে তাঁর সঙ্গের মালপত্র, মালপত্র থেকে দাসীর কোলে ঘুমন্ত শিশু, ঘুমন্ত শিশু থেকে উর্দি-পরা চাপরাসীর চেহারা পর্যন্ত সব-কিছুর ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে হঠাৎ হেসে বললাম, 'চলো।'

…হিম-শীতল তরঙ্গের সে প্রচণ্ড আলোড়ন থেমে গিয়ে একটা গাঢ় আচ্ছন্নতা নেমে এসেছে নিশ্ছিদ্র মেঘপুঞ্জে ঢাকা আকাশের মতো।

নমিতা কোথাও ছেলেদের গোলমাল করবার জন্যে শাসন করছে শুনতে পাচ্ছি। সঙ্কীর্ণ এই দু'খানি মাত্র ঘর, ছেলেরা কোথায় বা যায়! ছেলেদের গোলমালের চেয়ে পাশের বাড়ির রেডিওটা যদি কেউ থামিয়ে দিতে পারত! আর বারান্দায় ওই অবিশ্রান্ত আলাপ!—

'রাস্তায় ঘাটে সত্যিই ত পয়সা ছড়ান, কিন্তু কুড়িয়ে নেবারও তাকৎ চাই।'

'নেহাত হতভাগা না হ'লে আজকের দিনে কেউ আর বেকার নেই।'

'মানুষ হ'লে কেউ স্কুল-মাস্টারি করে আজকের দিনে? তার চেয়ে রিক্সা টানলেও অনেক বেশী লাভ।'

কাকে উদ্দেশ করে যে আলাপ চলেছে তা বোঝা কঠিন নয়।

কোথা থেকে বিরামহীন একটা জল পড়ার আওয়াজ আসছে।

পাশের বাড়ির ট্যাঙ্ক ছাপিয়ে জল পড়ছে বোধ হয়। শুধু এই জলের নিরবচ্ছিন্ন স্নিগ্ধ শব্দটি যদি শুনতে পেতাম… !

…স্টীমারে কেবিন একটিও খালি নেই। রিজার্ভ করার প্রমাণস্বরূপ কাগজখানা মূল্যহীন। সে কাগজ দেখিয়ে ঝগড়া করবার মতোও কাউকে পাওয়া যায় না। সময় বুঝে কেবিন-ক্লার্ক গা-ঢাকা দিয়েছে। স্টীমারের জনসমুদ্রে কোথায় তাকে খুঁজে বার করা যাবে!

কেবিনগুলোর সামনে রেলিং-এর ধারে একটু জায়গা করে মালপত্রগুলো জমা করে রাখা হয়েছে। সৌভাগ্যক্রমে একটা বেঞ্চি পাওয়া গেছে বসবার মতো।

—'কিন্তু এ কি চেহারা হয়েছে তোমার বলো ত!'

'খুব খারাপ হয়েছে নাকি!'

'চেনাই যায় না।'

হেসে বললাম, 'চেনা নিশ্চয় যায়। নইলে চিনলে কি করে!'

'তুমি ত চিনেও এড়িয়ে যাবার মতলবে ছিলে।'

এ-টুকুই একধারে শায়িত ঘুমন্ত শিশুটির ওপর থেকে চাপরাসী পর্যন্ত সব কিছুর ওপর আর একবার চোখ বুলিয়ে বললাম, 'সেটা কি খুব অন্যায় ?'

বেশ কিছুক্ষণের নিস্তব্ধতার পর উত্তর এল, 'হ্যাঁ, সত্যি-ই অন্যায়।'

একটু বিস্মিত হয়েই তার মুখের দিকে তাকালাম। দুজনের পরিচয়ের ইতিহাসে যেখানে ছেদ পড়েছিল, তার পরের কোনো কথাই কেউ এপর্যন্ত তুলিনি। শুধু এইটুকু জেনেছি যে, শর্মিষ্ঠার স্বামী বেশ বড়দরের একজন সরকারী কর্মচারী; সম্প্রতি বদলি হয়ে যেখানে গিয়েছেন, শর্মিষ্ঠা পিত্রালয় থেকে শিশুকন্যাকে নিয়ে সেখানেই রওনা হয়েছে। এতক্ষণ যে ধরনের অবান্তর আলাপ চলেছে তার মাঝখানে শুধু এই মন্তব্যটুকু নয়, তা বলবার ভঙ্গিটি পর্যন্ত কেমন যেন বিসদৃশ লাগল তাই।

আমার বিস্মিত দৃষ্টিটুকু লক্ষ্য করেই বোধ হয় শর্মিষ্ঠা খানিকটা মাথা নীচু করে রইল একটু যেন অপ্রস্তুত ভাবে। তার পর মৃদুস্বরে বললে, 'আমার কথা তুমি বুঝতে পারলে না ?'

সরল ভাবে বললাম, 'না।'

আরো বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে শর্মিষ্ঠা ধীরে ধীরে বললে, 'জীবনটা ঠিক নিপুণ লেখকের সাজানো গল্প ত নয়—একটি মাত্র জুৎসই সমাপ্তি যার লক্ষ্য, সুখ বা দুঃখের একটি বিশেষ রসসৃষ্টি করেই যার ধারা যায় ফুরিয়ে।'

একটু হেসে বললাম, 'নিপুণ লেখকের মতোই বড্ড বড় কথা বলার চেষ্টা করছ নাকি !'

'সত্যিই বড় কথা ভাগ্য যখন ভাবিয়েছে তখন বললে দোষ কি ?'

মনে পড়ল শর্মিষ্ঠা চিরদিনই একটু বেশী বড় কথা ভাবত। নিজের মাপের চেয়েও বড়। ভাগ্য তাকে বড় যদি ভাবিয়ে থাকে, তার মাপের চেয়ে বড় জায়গায় টেনেও তুলেছে। এবার নিজের অনিচ্ছাতেই একটু খোঁচা না দিয়ে পারলাম না।

বললাম, 'প্রচুর অবসর আর স্বাচ্ছন্দ্য থাকলে এসব বিলাস সাজে।'

শর্মিষ্ঠা কিন্তু অবিচলিত ভাবেই নিজের কথার জের টেনে বললে, 'যা হারাই তা মনে করে রাখার অনির্বাণ বেদনা হ'ল বই-এর গল্পের, জীবনে তার পরেও কিছু থাকে।'

'কি থাকে ?'

'যা পেয়েছিলাম তাই মনে রাখার প্রশান্তি।'

শর্মিষ্ঠার দিকে আর একবার সবিস্ময়ে তাকালাম। তার পোশাক থেকে প্রসাধনের পরিচ্ছন্ন বিশেষত্বে, তার সহজ আত্মস্থ ভঙ্গিতে বোধ হয় প্রশান্তিরই পরিচয়।

……বারান্দার আলাপের সুর এখন চড়া। নমিতার সঙ্কুচিত স্বর এই আচ্ছন্নতার ভেতর ভালো করে কানে পৌঁচোচ্ছে না, কিন্তু তার বক্তব্য অস্পষ্ট নয়।

'বরফ! আর বরফ পাওয়া যাবে কোথায়! আড়াই টাকা সের বরফ, দশ বিশ সের কিনতে কত টাকা লাগে হিসাব আছে? আর টাকা থাকলেই কি বরফ পাওয়া যায়?

কণ্ঠস্বরটা আমার শ্বশুরমশাই-এর। অকর্মণ্য অক্ষম এক জামাই-এর হাতে কন্যাদান করার ভুলের জন্য নিজেকে তিনি এখনো ক্ষমা করতে পারেননি। তাঁর অনুশোচনা নানা ভাবে নানা ভঙ্গিতে তাই প্রকাশ পায়।

নমিতার মৃদু কণ্ঠের মিনতির ভাষাটা পাশের বাড়ির রেডিও-নিনাদে হারিয়ে গেল। শ্বশুরমশাই-এর কণ্ঠ আবার রেডিও ছাপিয়ে উঠল, 'কাজ ত হ'ল অরৈম্ভা!' লাভের মধ্যে খাস জওলী ম্যালেরিয়াটি বাগিয়ে নিয়ে এলেন। এমন কাজের খোঁজে সাত-তাড়াতাড়ি যাবার দরকার কি ছিল! বরাতে ত সেই স্কুল-মাস্টারি।'

পাশের বাড়ির রেডিওটা সত্যিই বুঝি পাল্লা দিতে না পেরে হঠাৎ থেমে গেছে। শুধু ছাপিয়ে-ওঠা ট্যাঙ্ক থেকে ঝির-ঝির করে জল পড়ার একটা আওয়াজ। সে জলের ঠাণ্ডা স্পর্শ যেন কানের ভিতর দিয়ে শরীরের সমস্ত শিরায় শিরায় পেতে চাই।

নমিতা কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, টের পাচ্ছি। আইস-ব্যাগটা একবার মাথার ওপর ধরে নামিয়ে নিলে। আইস-ব্যাগে বরফ আর নেই, সব জল হয়ে গেছে।

চোখ না খুলেই নমিতার মুখ যেন আমি দেখতে পাচ্ছি। লেপের ভেতর থেকে হাতটা বার করে তার হাতটা ধরে ফেললাম। ভিজে ঠাণ্ডা স্পঞ্জের মতো নিষ্প্রাণ হাত—অনেকক্ষণ আইস-ব্যাগ ধরে থাকার দরুন বোধ হয়।

আস্তে আস্তে বললাম, 'আমার কোটটার ভেতরের পকেটটা খুঁজে দেখো নমিতা, টাকা আছে।'

'টাকা আছে!'—নমিতার কণ্ঠস্বরে গভীর বিস্ময়। জ্বরের ঘোরে প্রলাপ, না সত্যি বলছি—সে বুঝতে পারছে না।

...অনেক কষ্টে শেষ পর্যন্ত কেবিন-ক্লার্কের সন্ধান পাওয়া গেল। একটা কেবিনের ব্যবস্থা হতে পারে, তবে কিঞ্চিৎ উপরি লাগবে।

আমাকে ইতস্ততঃ করবার অবসর পর্যন্ত না দিয়ে শর্মিষ্ঠা মনিব্যাগটা বার করে আমার হাতে তুলে দিলে।

স্বাভাবিক সঙ্কোচে বললাম, 'তুমি গুনে দাও না?'

'না না, তোমার কাছেই থাক্ না এখন; যাও, যাও হাঙ্গাম চুকিয়ে দিয়ে এসো।'

হাঙ্গামা চুকিয়ে দিয়ে এসে দেখলাম, শর্মিষ্ঠা কেবিনটি দখল করে ইতিমধ্যেই চাপরাশীর সাহায্যে মালপত্র তুলে সব গোছগাছ করে নিয়েছে।

গোছগাছ একটু বেশী রকম। হেসে বললুম, 'তুমি ত একেবারে সংসার পেতে বসেছ, অথচ একঘন্টা বাদেই ত নেমে যাবে।'

টিফিন-কেরিয়ার থেকে দুটি প্লেটে খাবার সাজাতে সাজাতে শর্মিষ্ঠা বললে, 'একঘন্টার সংসারই কি তুচ্ছ—ঘণ্টা ধরে ত সব কিছুর দাম কষা যায় না।'

খাবারের প্লেটটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে আমায় বললে, 'নাও, এবার একটু নিশ্চিন্ত হয়ে তোমার সব কথা শুনব।'

ভাবলাম বলি—আমার কথা শোনার ধৈর্য কি তোমার আছে, শর্মিষ্ঠা! যেখানে আমাদের পরিচয় হয়েছিল সেখান থেকে আমি অনেক ধাপ নেমে এসেছি, তুমি গেছ উঠে। আমি দরিদ্র স্কুল-মাস্টার; ব্রত বড়, নিষ্ঠা নেই। যুদ্ধের বাজারে আগুন যেখানেই লাগুক, ছাই হ'ল আমাদের সংসার সবার আগে। তাই আজকের দিনে আলাদীনের প্রদীপ যাদের হাতে, তাদের একজনের দরজায় লোভে দুরাশায় ধন্না দিতে গেছলাম। কিন্তু তাও ভাগ্যে সইল না। জ্বরে পড়ে রুগ্নদেহ নিয়ে পুনর্মূষিক হয়ে ঘরে ফিরছি। তুমি আমার জীবনে কবে কি ছিলে তা মনে রাখবার উৎসাহটুকুও আমার নেই!

কিছুই কিন্তু বললাম না,—বলবার দরকার হ'ল না। শর্মিষ্ঠার নিজেরই দেখা গেল এত কথা বলবার আছে যে সময়ে কুলোয় না,—তার জীবনের গভীর, গূঢ় সব দুঃখ, আঘাত, দ্বন্দ্ব, সমস্যার কথা। সেই সঙ্গে তাদের পারিবারিক প্রসঙ্গও বুঝি না এসে পারে না,—তার স্বামীর পদমর্যাদা, দায়িত্ব, তাদের সাংসারিক সামাজিক প্রতিষ্ঠার পটভূমিকায় শর্মিষ্ঠা নিজের হৃদয়কে যেন সবিস্তারে বিশ্লেষণ করে চলল।

অবহিত হয়ে তার কথাই শুনছিলাম। প্লেট খালি দেখে শর্মিষ্ঠা আবার অনেকগুলো খাবার চাপিয়ে দিলে। বললাম, 'করছ কি! কত আর দেবে?'

শর্মিষ্ঠা গাঢ় গভীর স্বরে বললে, 'আমার কাছে কতবড় পাওনা তোমার ছিল—তার কি-ই বা দিতে পারলাম !'

…বারান্দায় শ্বশুরমশায়ের গলার স্বরটা হঠাৎ কেবল নতুন শোনাচ্ছে।—

'এ-তো একশো টাকার নোট, এখন ভাঙাব কোথায় ?'

নমিতার কণ্ঠস্বর এবার আর তত মৃদু নয়, 'সব ক'টাই ত ওই !'

'সব ক'টাই ! ওঃ—এতক্ষণে বুঝেছি, কিছু আজ সেখানে নির্ঘাত বাগিয়েছে !'

…মাঝখানের একটা স্টেশনে শর্মিষ্ঠা নেমে গেল। যথাসম্ভব সাহায্য করলাম—কুলী ডেকে মালপত্র নামাবার ব্যবস্থা করে দিয়ে।

স্টীমার ছাড়বার আগে পর্যন্ত শর্মিষ্ঠা পণ্টুনে রইল দাঁড়িয়ে। শেষ মুহূর্তে গভীর গাঢ় স্বরে বললে, 'আমি কি ভাবছি জান ?'

'কি ?'

'আর যেন দেখা না হয়।'

একটু চুপ করে থেকে পকেট থেকে তাড়াতাড়ি তার মনিব্যাগটা বার করে ছুঁড়ে দিলাম।—'দেখ দিকি আর একটু হ'লে ভুলে যাচ্ছিলাম।'

'শেষকালে শুধু কি ওইটুকুই মনে পড়ল !'

একটু হাসলাম।

ওপরে ঘণ্টা বাজছে স্টীমার চালাবার। প্যাডলের আলোড়নে স্টীমার কাঁপছে।

শর্মিষ্ঠা কখন ব্যাগ খুলবে জানি না, খুললে আমার চিঠির টুকরোটুকু পাবে নিশ্চয়। লিখেছি : 'তোমার কাছে অনেক বড় পাওনা আমার ছিল, তার সামান্য কিছু শোধ নিলাম।'

লাল তারিখ

ক্যালেণ্ডারে ছুটির দিনগুলো কেন যে লাল হরফে ছাপা, এতদিনে যেন যুগলকিশোর বুঝতে পারে। কালো কাজের তারিখগুলো, তার ভেতর হঠাৎ যেন কয়েকটা দিন পুষ্পিত হয়ে উঠেছে আনন্দে।

যুগল থেকে থেকে সেই ক্যালেণ্ডারের দিকে চায়, চোখ সেখান থেকে ফেরাতে পারে না। আর ক'টা দিনই বা? আর একটা লাইন পার হ'লেই ছুটির রঙীন দিনের সারি।

ক'দিন ধরে যুগলের কি খেয়াল হয়েছে। রাত্রে কাজ থেকে ফিরে তারিখগুলো কালো কালি দিয়ে কেটে রাখে। এ ছেলেমানুষির কোনো মানে হয় না। কলম দিয়ে কেটে দিনগুলোকে কিছু সে উড়িয়ে দিতে পারবে না। তবু এতে যেন তার সান্ত্বনা আছে এক রকমের। কুশ্রী দিনগুলোকে এমনি করে যেন সে বাদ দিয়ে যায় জীবন থেকে। রঙীন তারিখগুলোর দিকে এমনি করে এগিয়ে যায়।

দেয়াল-ক্যালেণ্ডারটা যেন ঘন কালো জঙ্গল, তারই ভিতর দিয়ে অতি কষ্টে সে পথ কেটে চলেছে। কিন্তু বেশী দূর আর নয়, আর খানিক দূর গেলেই দেখা যাবে পুষ্পিত বাগান! তারিখগুলোর ওপর যেন আনন্দের রক্তিম সূর্যোদয়ের আলো।

ছুটির জন্যে তার ব্যাকুলতা হওয়া ত অস্বাভাবিক নয়। ছুটি সে অনেকদিন পায়নি। কতদিন সে যে দেশে যায়নি—ভাবতেও তার কষ্ট হয়। প্রায় এক বছরের বেশীই হবে। যূথিকা এর মধ্যে অবশ্য ছোট ছোট অনেকগুলি চিঠি লিখেছে। ধরে ধরে, কেটে কেটে বানান করে লেখা চিঠি। এদিকে যূথিকা বিশেষ মুখ-চোরা নয়, কিন্তু চিঠি লেখা তাকে জব্দ করেছে। যা বলতে চায়, তা ভাষায় কুলোয় না। ভাষায় যা কুলোয় তাও কুলোয় না ব্যাকরণে আর বানানে। কিন্তু ছোট এই চিঠিগুলির ভেতর কি অপরূপ একটি কুণ্ঠিত সুষমাই না আছে! যুগল সেগুলো কোথায় কেমন করে রেখেছে যদি জানতে!

আর রাখবে না-ই বা কেন? যুগল নিজেও এমন কিছু মস্ত লিখিয়ে নয়। সে অফিসে বসে টরে-টক্কা করতেই ওস্তাদ। চিঠি লিখতে বসলে তারও যেন গায়ে ঘাম দেয়।

● প্রেমেন্দ্র মিত্র ●

প্রথম চিঠি লেখবার সময় তার কি মুশকিলটা না হয়েছিল। চিঠি ত লিখবে কিন্তু সম্বোধন করবে কি বলে? কি বলে সম্বোধন করতে হয় কে জানে। সে শুধু এইটুকু জানে, আগেকার সে বিদঘুটে সম্বোধনগুলো এখন আর কেউ লেখে না। কিন্তু এখনকার ছেলেরা কি বলে চিঠি আরম্ভ করে তাহ'লে? তার নিজের পড়া নভেলগুলোর সে শরণ নিয়েছে কিন্তু সেখানেও সাহায্য মেলেনি। আজ-কালকার নভেলগুলোয় ওসব চিঠি-টিঠি বড় থাকে না। শুধু যে সব প্রেমের কথায় কাব্যকাব্য থাকে, তাতেও তার কিছু সুবিধা হবার নয়।

হতাশ হয়ে সে বিনা-সম্বোধনেই চিঠি আরম্ভ করেছিল। চিঠি লিখতে বাধ্য হওয়ার জন্য তার অসন্তোষের সীমা ছিল না। বেশ ত তারা ছিল দু'বছর। চিঠি লেখবার কোনো দায় ছিল না। বৌএর বাপের বাড়ি আর শ্বশুরবাড়ি এপাড়ায়-ওপাড়ায়। বৌ বাপের বাড়ি গেলে, বলবার কথা কিছু থাকলে সটান গিয়ে হাজির হ'লেই হ'ল। একটু হয়ত তাতে লজ্জা করত। কিন্তু সেটুকু কাটিয়ে ওঠা যেত বই কি!

এখন কিন্তু চিঠি লেখা ছাড়া উপায় নেই। এপাড়া-ওপাড়া নয়, একেবারে দু'শো মাইল বুঝি তফাত। ইচ্ছা করলেও হুট করে যাওয়া যাবে না। চিঠি লিখেই এখন কোনো রকমে আলাপের সাধ মেটাতে হবে। বৌ আসবার আগে সেই কথাই বলে দিয়েছিল বার বার করে, 'কিগো, চিঠি দেবে ত? কতদূরে যাচ্ছ বলো দেখি! রোজ চিঠি না পেলে কিন্তু থাকতে পারব না।'

যুগল ঠাট্টা করে বলেছিল, 'চিঠি কেন, রোজ টেলিগ্রাম করব'খন।'

কিন্তু ঠাট্টা করবার সে সময় নয়, বৌএর চোখ তখন জলে ভরে এসেছে। দু'বছরের মধ্যে এই তাদের প্রথম সত্যিকার ছাড়াছাড়ি। আর ছাড়াছাড়ি এক আধ দিনের নয়। কতদিন বাদে যে যুগল ফিরবে তা কে জানে। এপাড়ায়-ওপাড়ায় বাপের বাড়ি, শ্বশুরবাড়ি—তাইতেই প্রত্যেকবার ছাড়াছাড়ির সময় তারা কি কাণ্ডটা করেছে! আর এ হ'ল সত্যিকারের বিচ্ছেদ।

যুগল তাড়াতাড়ি বলেছে, 'চিঠি দেব গো দেব। কিন্তু তোমারও দেওয়া চাই।'

বৌ মাথা নেড়ে সায় দিয়েছে। তারপর কথা আর তাদের বেশী হয়নি। কথা কইবার কি এখন আছে! কথা দিয়ে বেদনাকে চাপা দিতে তারা শেখেনি, সে বয়স তাদের নয়।

যুগল চাকরির জায়গায় এসে প্রথম তাকেই চিঠি লিখেছিল। কিন্তু সম্বোধন বাদ দিয়েই লিখেছিল। চিঠি লেখায় এত মুশকিল কে জানত!

তারপর দেখতে দেখতে অনেকদিন কেটেছে। চিঠি লেখা এখন অনেকটা বেশবহর তার রপ্ত হয়ে গেছে। হ্যাঁ, সম্বোধনও এখন সে করে। কিন্তু যূথিকা এখনো হাতের আড়ষ্টতা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। এখনো ভাঙা ভাঙা কথায়, বাঁকা অক্ষরে অনেক কষ্টে সে মনোভাব প্রকাশ করে পাঠায়। মনোভাব কয়েকটি মাত্র কথা: 'তুমি তাড়াতাড়ি এসো। এসে আমায় নিয়ে যাও। তোমার মন কেমন করে না! খোকাকে দেখতে ইচ্ছে করে না!'—সব চিঠির এই প্রধান সুর।

এ মধুর চিঠি, যুগল যদি আলাদা বাক্স কিনে তার ভেতর সযত্নে জমা করে রাখে, তা হ'লে তাকে দোষ দেওয়া যায় না।

কিন্তু কয়েকদিন আগে যূথিকার একটু কড়া চিঠি এসেছিল। নিজের মনোভাব বিশদভাবে প্রকাশ করবার চেষ্টায় অক্ষরগুলো একটু বেশী বেঁকেছে, ব্যাকরণ ও বানানের উপর হয়েছে বেশী অত্যাচার। যূথিকা এবার যা লিখতে চেয়েছে তার মর্মার্থ এই যে, এবারে যুগল যদি না আসে তাহ'লে পরে এসে আর যূথিকাকে দেখবার আশা যেন না করে। সে অবশ্য জানে যে, যুগলের জন্যে আজকাল কিছুই আসে যায় না। নইলে একবছরে সে কি সত্যি আর ছুটি নিতে পারত না। ছুটি নেই—ছুটি নেই, ওসব বাজে কথা। কোন্ অফিসে আবার ছুটি থাকে না! অফিসের সাহেবদের কি নিজেদের বাড়ি-ঘর বৌ-ছেলে নেই যে, বাড়ি যাব বললে তারা ছুটি দেয় না! আসল কথা, যুগল আর আসতে চায় না।

যুগল সে চিঠি পড়ে একটু হেসেছিল। তারপর সারারাত ঘুমোতে পারেনি। যূথিকাকে পরে গিয়ে সে দেখতে পাবে না সত্যি, এই ভাবনায় তার ঘুম হয়নি এমন নয়। কিন্তু মন তার খারাপ হয়ে গেছল। যূথিকা সেখানে কেমন কষ্টে আছে তা তো সে নিজেই পারে বুঝতে। এতদিনে তার একবারও ছুটি না-পাওয়া যে সত্যি আশ্চর্য ব্যাপার! অদৃষ্টের যেন অহেতুক আক্রোশ আছে তার ওপর।

পুজোর সময় তার ছুটি ত একরকম ঠিকই হয়ে গেছল। বাঁধাছাঁদা করে সে তখন এক পা একরকম বাড়িয়েই দিয়েছে। এমন সময়ে খবর এল নতুন স্টেশনের সিগন্যালারের বড় অসুখ, এখুনি তাকে রিলিভ্ করতে যেতে হবে।

হেড-সিগন্যালার মশাই তাকে একটু বুঝি স্নেহ করেন। তিনি বলেছিলেন,

'কি করবে বলো! প্রথমটা ও-যন্ত্রণা সকলকেই ভোগ করতে হয়। এবার ফিরে এলে তোমার ছুটি নিশ্চিত মিলবে।'

যুগল বাধ্য হয়েই গেছল রিলিভ্ করতে। পূজোর সময় বাড়িতে থাকার যত আনন্দ সে কল্পনা করেছিল, ওপরওয়ালার এক কলমের আঁচড়ে তা গেছল বাতিল হয়ে।

তারপর ফিরে এসেও ছুটি যুগল পায়নি। আজ এটা কাল ওটা, এদিকের লাইনে হাজাম লেগেই আছে। সময় খারাপ বলে লোকজনও কম। যুগলের ছুটির পথে নানান বাধা এসে দেখা দিয়েছে।

হতাশ হয়ে যুগলের মনে হয়েছে এখন, সেবার যূথিকাকে সঙ্গে সে নিয়ে এলেই পারত। রিলিভিংএর কাজ। আজ এখানে কাল সেখানে ছুটে বেড়াতে হয়। এর ভেতর যূথিকার কষ্ট হবে ভেবেই সে আনেনি। কিন্তু এ কষ্টের তুলনায় সে কষ্ট ত কিছুই নয়। যূথিকা ছেলেমানুষ। এখনও একলা সংসার করতে হয়ত পারবে না, এ কথাও তার মনে হয়েছিল।

কিন্তু এখন অন্য কথা মনে হয়। সংসার না হয় ভালো করে না-ই করতে পারত তারা। ভুলচুক না হয় একটু আধটু হতই। তাতেই বা ক্ষতি ছিল কি? এমন করে আধমরা হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে সে ত ভালো। শুধু ভালো কেন, সেও ত সত্যি মধুর।

এমনি মধুর সংসারযাত্রা সে যে পাশেই দেখতে পাচ্ছে। বুকিং-ক্লার্ক অবিনাশবাবুর স্ত্রীর বয়সও যূথিকার চেয়ে বেশী হবে না। রেলওয়ে কোয়ার্টারের একটি অংশ নিয়ে কিন্তু তারা ত দিব্যি আছে। তাদের আনন্দ ছোট বাড়িটি ছাপিয়েও মাঝে মাঝে উপচে পড়ে। যুগল বাইরে থেকেই তার স্বাদ পায়।

...অবিনাশবাবুর হাতের আঙুলে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।

'কি হ'ল মশাই!'

'আরে মশাই, কুটনো কুটতে গিয়ে এই কাণ্ড।'

'কুটনো কুটতে গিয়ে!'

তারপর জিজ্ঞেস করে জানা যায়, বৌএর রান্নার অপ্রিয় সমালোচনা করে অবিনাশবাবু বিপদে পড়েছিলেন। তারপর আত্মসম্মান বজায় রাখবার জন্যে গিয়েছিলেন নিজের কিছুর প্রমাণ দিতে। সে চেষ্টার সূত্রপাতেই এই মর্মান্তিক।

অবিনাশবাবু আঙুল কাটার দুর্ঘটনার জন্ত বৌএর ওপর চটে বলেন, 'এ সব আনাড়ী মেয়েছেলে নিয়ে সংসার করা ঝকমারি, মশাই। আপনি বেশ আছেন।'

কিন্তু তাঁর মুখ দেখে মনে হয় না, তিনি কারুর সঙ্গে স্থান পরিবর্তন করতে প্রস্তুত।

যুগলও এবার তাই ঠিক করেছে, যূথিকাকে সে নিয়েই আসবে। তাদের আর কি হাঙ্গাম! একটা ছেলে মাত্র, তার জন্তে এদেশের একটা দাই রাখলে চলবে, আর চেষ্টা করলে পিসিমাকেও হয়ত আসতে রাজী করান যেতে পারে।

কিন্তু এই আনতে যাবার ফুরসতটুকুও তার এতদিন হয়নি। ছুটির দরখাস্ত তার কেবলই চাপা পড়ে গেছে, আর যুগলের কাছে প্রবাসের এই শহর বিষ হয়ে উঠেছে।

মনের দুঃখে সে যূথিকাকে চিঠি পর্যন্ত লেখেনি। কি হবে চিঠি লিখে যূথিকাকে মিথ্যা আশা দিয়ে। এমন চিঠি লেখাও একটা যন্ত্রণা।

মনের এই অবস্থার ভেতর যূথিকার এই চিঠি এসে হাজির।

যুগল তার পরদিন মনে মনে অনেক কিছুই ভেবে নিয়ে গেছল কাজে।

এবার সে একটা দুঃসাহসিক কিছু করে বসবে। না, চাকরি ছাড়া নয়। সে কথা যুগল অবশ্য কল্পনা করতেই পারে না। কিন্তু হঠাৎ সিক্-লিভ্ নিয়ে একবার সরে পড়লে কি হয়। ধরা সে নাও পড়তে পারে। যুগল সেই ভয়ানক দুঃসাহসের জন্তই শক্তি সঞ্চয় করবার চেষ্টা করছিল।

এমন সময় বড়বাবু তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। বড়বাবুর ঘর থেকে যুগল বেরিয়েছিল অভিভূতের মতো। তার অভিভূত হওয়ার আর অপরাধ কি? সত্যি সত্যি তার ছুটি মঞ্জুর হয়ে গেছে, এ কথা একমুহূর্তে কি বিশ্বাস করা যায়!

সেই থেকে যুগল ক্যালেণ্ডারের তারিখ গুনছে। বেশী দিন আর নয়। তার কালির ঢেরা ক্রমশঃই চলেছে এগিয়ে, ক্যালেণ্ডারের ওপর দিয়ে। আর একটা সারি পার হ'লেই হয়।

যুগলের ছেলেমানুষির আর অন্ত নেই। আর দু'দিন তার আর সবুর সয়নি। সকাল না হতেই লোভ না সামলাতে পেরে সে ঢেরা কেটে দিয়েছে। সন্ধ্যাবেলা যখন কাটতেই হবে, তখন সকালেই সে কাজটা সেরে রাখলে দোষ কি! সকাল যখন হয়েছে তখন দিন ত কাটবেই।

যুগল প্রথম আনন্দের উচ্ছ্বাসে যূথিকাকে লম্বা চিঠি লিখতে বসেছিল। কিন্তু

সে চিঠি তারপর সে ছিঁড়ে ফেলেছে, চিঠি দিয়ে কি হবে? দু'দিন বাদে সে ত নিজেই সশরীরে হাজির হবে। হাজির হয়ে চমকে দেবে একেবারে যূথিকাকে। ভাবনার অমন পুরস্কার যখন মিলবেই তখন ভাবুক না সে দিনকতক।

যূথিকা কিরকম যে অবাক হবে, শুয়ে শুয়ে যুগল তাই ভেবেছে অনেক রাত পর্যন্ত। কথাবার্তা নেই, হঠাৎ বাড়ির দরজায় সন্ধ্যায় গাড়ির আওয়াজ। গাড়ির আওয়াজ তাদের রাস্তায় অবশ্য একটু আশ্চর্য ব্যাপার। তাদের বাড়ি গ্রামের এক টেরে, একেবারে পিয়ালী নদীর ওপরে। রাতদিন লঞ্চি বেয়ে শালতি যায় সে নদীর ওপর দিয়ে, বজরা যায় কখনো-সখনো—বর্ষার ভরা জোয়ারে। কিন্তু তাদের রাস্তায় ঘোড়ার গাড়ি আসে খুবই কম। ঘোড়ার গাড়ি তাদের গ্রামে ক'টাই-বা আছে!

কিন্তু যূথিকা হয়ত সে শব্দ লক্ষ্য না-ও করতে পারে। সে হয়ত তখন খোকাকে ঘুম পাড়াতে ব্যস্ত। খোকা যেরকম দুষ্টু হয়েছে শোনা গেছে, তাতে তাকে ঘুম পাড়ানও ত সোজা ব্যাপার নয়। হয়ত যূথিকা তার বিছানার পাশেই পড়েছে একটু ঘুমিয়ে। সে যা ঘুমকাতুরে! এই ঘুমের জন্য একটু আধটু গঞ্জনা গোড়া থেকেই ত তাকে সইতে হয়েছে। যুগলই তাকে ঠাট্টা করে বলেছে কতবার, 'দেখো, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যেন ঘুমিয়ো না।' তারপর দুজনে মিলে হেসেছে। না, যূথিকা হয়ত সত্যি ঘুমিয়ে পড়েছে। কোনো গাড়ির শব্দ সে শোনেনি।

আস্তে আস্তে যুগল গিয়ে ঢুকবে বাড়িতে। পিসিমা অবাক হবেন!—'ওমা, তুই! ক'দিন খবর না পেয়ে আমি ভেবে মরছি। আসবার আগে একটা খবরও দিতে নেই?'

কিন্তু পিসিমা ত আর হৈ-চৈ করবেন না এ নিয়ে, যূথিকা হয়ত তখনও ঘুমুচ্ছে। তারপর পিসিমা বলবেন, 'তাখ্ ত টুনী, বৌমা কি করছে?'

টুনী যুগলের ছোট বোন। বৌদিকে নইলে তার চলেও না, আবার বেশীক্ষণ বলেও না। সে এ সুযোগ ছাড়বে না।

'বৌদি ত খোকার সঙ্গে শুয়ে ঘুমোচ্ছে।'

পিসিমা অবাক হয়ে বলবেন, 'দেখেছ তাও। সমস্ত দুপুর ত দরজায় খিল দিয়ে ঘুমিয়েছে, আবার এই সন্ধ্যেবেলায় ঘুম! যা ডেকে দিগে যা, কিশোরকে মুখ হাত ধোবার জল দিক্।'

কিন্তু টুনীর কথা বিন্দুরই. যূথিকা বিশ্বাস করতে পারে না। 'টুনী তার সঙ্গে

ঠাট্টা করতে আসে—আস্পর্ধা দিন দিন বাড়ছে তার। দাঁড়াও এবার সে পিসিমাকে গিয়ে বলে।

যূথিকার আসবাব নাম নেই। ঘরের ভেতর শোনা যাচ্ছে মৃদুকণ্ঠে ঝগড়া।

টুনী বলছে, 'যাঃ। আমি মিছে কথা বলছি নাকি? ভাখো না, দাদা এসেছে কিনা!'

'আসুক-গে যাক, আমি যাব না।'—না, যূথিকা কিছুতেই বিশ্বাস করবে না!

তারপর পিসিমা ব্যাপার বুঝে হাঁক দেবেন, 'কি করছ বৌমা! বেরিয়ে এসো না! কিশোরের হাত মুখ ধোবার জল দাও, চায়ের যোগাড় করো। সারাদিন ট্রেনের ধকল সয়ে এসেছে…'

এবার যূথিকা ধড়মড় করে উঠে বসবে নিশ্চয়। পিসিমা ত আর ঠাট্টা করতে পারেন না? যূথিকা কি অবাকই হবে…!

যুগলের ভাবনা ধীরে ধীরে অজান্তে মিশে গেছে তার স্বপ্নের সঙ্গে। সকালে সে নিজেই চমকে জেগে উঠেছে বিছানা থেকে, তারপর তাকিয়েছে ক্যালেণ্ডারের দিকে। আর একটা কালো তারিখ সে পার হয়ে এল।

আর ক'টাই বা বাকী! ক'টা মাত্র কালো দিনের ব্যবধান। সেই ব্যবধানের ভেতর দিয়েই যুগল যেন ছুটির দিনের রাঙা সূর্যোদয় দেখতে পায়। সূর্য উঠছে তাদের পিয়ালী নদীর ওপারে, কলাবাগানের মাথার ওপর দিয়ে। খিড়কির দরজা দিয়ে সে-ধারে বেরিয়ে এসে তারা একদিন ভোরে সে সূর্যোদয় সত্যি দেখেছিল।

তাদের বাড়ির ভেতর থেকে পিয়ালী দেখা যায়না ব'লে সেদিন যূথিকার কি দুঃখ! বলেছিল, 'আমাদের দোতলায় একটা ঘর থাকলে বেশ হয়। জানলা দিয়ে কেমন তাহ'লে রোজ নদী দেখি!'

যুগল সেদিন হেসে বলেছিল, 'আহা, কি তোমার নদী। হেঁটেই পার হওয়া যায়।'

যূথিকা বলেছিল, 'তা হোক। আমার এই বেশ ভালো লাগে, দোতলায় একটা ঘর করো না বাবু!'

তখনও যুগল চাকরি পায়নি। তাই শেষ পর্যন্ত সে উৎসাহভরে সায় দিয়েছিল এ প্রস্তাবে। দোতলায় একটা ঘর তারা নিশ্চয়ই তুলবে। দোতলায় ঘর হ'লে আরো কত সুবিধা। তারা তাহ'লে একেবারে নিরিবিলি হয়। লজ্জায় এত রাতদিন আড়ষ্ট হবার তাহ'লে দরকার থাকে না।

সে দোতলার ঘর আর উঠবেনা ভেবে মৃণালের এখন যেন একটু দুঃখ হয়। দোতলার ঘরে আর তার সত্যি দরকার নেই। বিদেশেই তাকে হয়ত চাকরি করতে হবে সারাজীবন। পিসিমাকে সঙ্গে নিয়ে এলে দেশের বাড়ির দেখবারই ত লোক থাকবে না। চাকরিতে কায়েমি হয়ে বিদেশেই কোথাও তাকে সংসার পাততে হবে দীর্ঘদিনের জন্যে। তখন আর দেশের বাড়ির সঙ্গে কোনো যোগই হয়ত সে রাখতে পারবে না। আর এইজন্যেই তার দুঃখ। মৃণাল ভেতরে ভেতরে একটু ঘর-মুনো।

বাধ্য হয়ে তাকে চাকরির জন্যে বিদেশে আসতে হয়েছে। কিন্তু বিদেশ তার ভালো লাগে না। যে ছোট শহরটিতে সে আছে, তার চারিধারে নীল পাহাড়। তার পাশ দিয়ে পরিচ্ছন্ন একটি বালুনদী বয়ে যায়। কিন্তু এসব সৌন্দর্য মৃণালের ভালো লাগে না। কেমন যেন শুকনো মনে হয়, কেমন রুক্ষ। শুধু যে যূথিকার অভাবেই ভালো লাগেনা তা নয়, তার কারণ আলাদাও আছে। তার মন সব দিক দিয়েই একনিষ্ঠ। তার মন আগেই বাঁধা পড়ে গেছে। বাঁধা পড়ে গেছে সেই ছোট একটুখানি গ্রামের প্রেমে। সেই গ্রামটিতে থাকতে পেলেই সে সবচেয়ে খুশি হ'ত। কেন যে খুশি হ'ত, তা সে অবশ্য বুঝিয়ে বলতে পারবে না জিজ্ঞাসা করলে। বুঝিয়ে বলবার ক্ষমতা তার নেই। শুধু সে জানে, সে গ্রামের কথা ভাবতেই তার ভালো লাগে। পিয়ালী নদীর ওপর দিয়ে হয়ত হাঁটায় হেঁটেই পার হওয়া যায়। তা যাক, সে নদী দেখবার জন্য যূথিকার কথায় সে দোতলার ঘর তুলতেও প্রস্তুত।

কিন্তু তা আর হবে না। হবে না যখন, তখন এ নিয়ে বৃথা আফসোস করেও লাভ নেই। মৃণালের আকাঙ্ক্ষা পরিমিত। পৃথিবীতে সব আশা পূর্ণ হয় না, এ কথা সে জানে। আপাততঃ যূথিকাকে ত সে নিয়ে আসতে পারবে। ক'দিন ত গাঁয়ে গিয়ে থাকবে। তা হ'লেই সে খুশি।

রাত্রে গিয়ে যূথিকাকে অবশ্য সব কথা বলতে হবে। বলতে হবে একটু ভয় দেখিয়ে, ঘোরালো করে—'পরশুই আবার যেতে হচ্ছে, ধকলটা খুব বেশীই হবে।'

যূথিকা নিশ্চয়ই অবাক হয়ে ভীত স্বরে জিজ্ঞাসা করবে, 'পরশু যাবে! তার মানে?'

'তার মানে, আর ছুটি নেই।'

এবার যূথিকা চুপ করে যাবে, হয়ত খানিক বাদে ধরা গলায় বলবে, 'তাহ'লে আসবার কি দরকার ছিল! না-ই অনুগ্রহ করতে এটুকু।'

'বাঃ—একি আমার হাত। আমার ওপর রাগ করছ কেন! রেল-কোম্পানির বড়কর্তার সঙ্গে ঝগড়া করে এসো-না তার চেয়ে।'

'আমার দায় পড়েছে'—বলে যূথিকা হয়ত মুখ ভার করে পেছন ফিরবে।

তারপর কিন্তু আর নয়। আর একটু বাদেই নইলে হয়ত শোনা যাবে যূথিকার কান্নার ফোঁপানি।

তার আগেই বলতে হবে, 'কেন, পরশু হলে তোমার অসুবিধা কি?'

'আমার! আমার আবার কি অসুবিধে! আমি চিরদিন এখানে যেমন পড়ে আছি, তেমনি পড়ে থাকব। আমার জন্য কার কি মাথাব্যথা!'

'বাঃ, পড়ে থাকবে মানে! তুমি যাবেনা তাহ'লে?

যূথিকা এবার নিশ্চয়ই অবাক হয়ে মুখ ফিরিয়ে বলবে, 'কোথায় যাব?' তারপর মুখের হাসিটুকু দেখতে পেয়ে হয়ত বলবে—'যাও, আমার সঙ্গে ঠাট্টা হচ্ছে!'

'না গো, সত্যি ঠাট্টা নয়। আমি তোমাদের নিয়ে যেতে এসেছি, তা শোননি!'

'কার কাছে আবার শুনব? না, তুমি ঠাট্টা করছ।' যূথিকার মুখ কিন্তু এরই মধ্যে উজ্জল হয়ে উঠেছে।—'সত্যি বলোনা গো, কেন আমার সঙ্গে এমন করছ! সত্যি আমাদের নিয়ে যাবে?'

'হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। নইলে আবার একবছর ধরে এমনি করে থাকব নাকি!'

যূথিকার মুখের সে আনন্দ কল্পনায় যেন যুগল স্পষ্ট দেখতে পায়। ক্যালেণ্ডারের লাল তারিখগুলোয় যেন সেই আনন্দের আভা লেগেছে।

দিন আর বেশী বাকি নেই। যুগল ক্রমশঃই অস্থির হয়ে উঠছে। তার ভয় হয়, আরবারের মতো শেষ মুহূর্তে সব ভেস্তে না যায়! কিন্তু না, তা যাবে না বোধ হয়। ক'দিন ধরে তার নাইট-ডিউটির পালা পড়েছে।

বড়বাবু পর্যন্ত একদিন ঠাট্টা করে বলেছেন, 'কিহে, রাত-জাগা অভ্যেস করছ নাকি?'

তারপর সত্যি একদিন রঙীন সূর্যোদয় হ'ল, পূর্বদিগন্তে না হোক, ক্যালেণ্ডারের পাতায়। দিনটা সকাল থেকে একটু মেঘলা করে আছে। তা হোক, এ মেঘ কিছুদূর গেলেই কেটে যাবে।

সকালেই একটা ট্রেন আছে। নাইট-ডিউটি থেকে ফিরে যুগল আর অপেক্ষা না করে তাইতেই রওনা হয়ে পড়ল। শরীরটা বুঝি কেমন একটু ম্যাজম্যাজ করছে—মাথাটা কেমন একটু ভার। ক'দিনের রাত্রি-জাগরণটা এবার বুঝি তেমন সয় নি। কিন্তু যাই হোক, এ আর কতক্ষণ। ট্রেনে যেতে যেতেই তার এ ভাব কেটে যাবে, যুগল জানে।

সবাই বলেছিল, নাইট-ডিউটির পরে দিনটা বিশ্রাম করে একেবারে সন্ধ্যায় গাড়িতে যেতে, কিন্তু তাহ'লে একটা বেলা একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। না, যুগলের এখন কৃপণতার আর শেষ নেই। একটা মুহূর্ত সে হারাতে রাজী নয়। যূথিকা আর তার সেই ছোট্ট বাড়িটির জন্য যতখানি সম্ভব সময় সে সঞ্চয় করে নিয়ে যেতে চায়। তা ছাড়া রাত্রে গেলে গ্রামে পৌঁছবে সকালবেলা। যূথিকাকে অবাক করে দেওয়া তাহ'লে বুঝি আর হবে না।

রাত্রি-জাগরণের পরদিনে ট্রেনের ধকল। শরীরটা বোধ হয় একটু খারাপ হবে। ট্রেনে ওঠার পর থেকে অন্ততঃ সে ভালো বোধ করছে না। শীত-শীত করছে একটু বেশী, মাথাটার একটু যন্ত্রণা হচ্ছে। বেলা হ'লে অবশ্য এসব থাকবে না। কোনরকমে হয়ত একটু ঠাণ্ডা লেগে গেছে। যা শীত এবার! তার ওপর আবার মেঘলা। নিজের দিকের শার্সি-টার্সি তুলে দিয়ে যুগল বেশ মুড়িসুড়ি দিয়ে বসে। একটা স্টেশনে ভালো করে চা খেয়ে নেয়।

এইবার বোধ হয় একটু আরাম বোধ হচ্ছে। এইরকম করে এই ক'টি ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারলেই হ'ল। তারপরের কথা মনে করতেই তার বুকের ভেতরটা কেমন করে ওঠে। হ্যাঁ—যুগলকিশোর এখনও অত্যন্ত ছেলেমানুষ। সে অত্যন্ত সাধারণ।

এত সামান্য জিনিস এমন অপূর্ব আনন্দের ঢেউ তোলে তার মনে! স্টেশন থেকে বেরিয়ে তাদের গ্রামের রাস্তায় সে নেমেছে ভাবতেই তার মন স্নিগ্ধ হয়ে যায়। দু'ধারে শূন্য ধানের ক্ষেত। এতদিনে চাষীদের সব ধান কাটা হয়ে গেছে। তার মাঝখান দিয়ে উঁচু কাঁচা রাস্তা চলে গেছে। ঘোড়ার গাড়ির দরজার ফাঁক দিয়ে দেখা যাবে রেলের লাইন অর্ধ-বৃত্তাকার রেখায় পূর্বের বিশাল প্রান্তরকে বিখণ্ডিত করে দূরের নারিকেল-কুঞ্জের ভেতর দিয়ে দিগন্তে মিশে গেছে। ঘোড়ার গাড়িতে বেশী দূর যেতে-না-যেতেই ট্রেন সে নারিকেল-কুঞ্জের ভেতর দিয়ে পিয়ালী নদীর পোল পার হয়ে যাবে। পিয়ালী নদীর পোল সেখান থেকে

দেখা যায় না, কিন্তু ট্রেনের ভারী আওয়াজ থেকেই তার অবস্থানটা বুঝতে পারা যাবে।

ছেলেবেলা রাত্রে তারা কতদিন বাড়ি থেকে এই ট্রেনের আওয়াজের জন্যে কান পেতে থাকত। এই তাদের একটা খেলা ছিল—ট্রেন কখন পোলের ওপর দিয়ে যায়, আওয়াজ দিয়ে তাই বোঝা। অন্ধকারের ভেতর সে আওয়াজ কি রহস্যময়ই না মনে হত! রেলগাড়িই তখন একটা বিস্ময়কর ব্যাপার। সেই রেলগাড়ির সমস্ত ভয়ঙ্কর রহস্য যেন এ শব্দে মুখর হয়ে উঠত।

যুগলের সত্যি এই সামান্য সব কথা ভেবেই আনন্দে বুকের ভেতর কেমন করতে থাকে! সে যেন স্পষ্ট দেখতে পায়, ঘোড়ার গাড়ি চলছে কাঁচা রাস্তায় মন্থর গতিতে হেলতে দুলতে, অদ্ভুত আওয়াজ করে। রাস্তার ধারে ছোট ছোট খেজুর আর বাবলা গাছ, সন্ধ্যার আসন্ন অন্ধকারে ক্রমশঃ সব আবছা হয়ে আসছে। স্টেশনের পথে লোক নেই এমন সময়। একটি-দুটি চাষী হয়ত চলেছে রেলের ওপারে খেজুরতোবা গাঁয়ে।…

কিন্তু বাদলাটা যে সত্যি কাটল না! তার আশা ছিল ট্রেন কিছুদূর গেলেই পরিষ্কার আকাশ দেখা যাবে, কিন্তু তার বদলে ক্রমশঃই যেন মেঘ ঘন হয়ে আসছে বলে মনে হচ্ছে। কেমন একটা বিশ্রী কুয়াশায় সব ঢেকে আছে। শীতের দিনের এ বাদলা বড় কষ্টকর।

সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরটাও যেন বড় বেশী খারাপ মনে হচ্ছে। গায়ের উত্তাপ যেন বেড়েছে। পিঠের শিরদাঁড়াটা কনকন করছে, মাথাটারও রীতিমতো যন্ত্রণা আরম্ভ হয়েছে, শেষকালে সত্যি জ্বর হবে না ত?

না, জ্বর তার শুধু শুধু হবে কেন! তার জ্বর-টর বড় একটা হয় না, এটা কি রকম!

একটু ঠাণ্ডা লেগে গেছে। সমস্ত দিন ট্রেনে উপোসে কাটলেই সেরে যাবে।

কিন্তু তা সারে না; খানিক বাদে যুগলকে একটু শোবার চেষ্টা করতেই হয় ট্রেনের বেঞ্চিতে আলগা করে। মাথাটা তার যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে। আর এত শীতই বা করে কেন! না, এ শুধু এই অকাল-বাদলের জন্যে। শীতকালে এমন বাদলা কেন যে বাপু! এ ত রীতিমতো বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে!

বৃষ্টি তেমনিই পড়তে থাকে। সমস্ত চরাচরব্যাপী আকাশ জুড়ে বুঝি বৃষ্টি নেমেছে, ট্রেন তাকে কোথায় ছাড়িয়ে যাবে।

যুগলের শরীর আরো খারাপ হতে থাকে। জ্বর যে সত্যি এবার হয়েছে, এ কথা আর স্বীকার না করে পারা যায় না। গা'টা ত যেন পুড়ে যাচ্ছে।

যুগলদের স্টেশনে ট্রেন যখন এসে পৌঁছল তখন সন্ধ্যা না হতেই চারিদিক অন্ধকার হয়ে এসেছে বৃষ্টিবাদলে। স্টেশনে কুলি-টুলি নেই। কোনরকমে গায়ের কাপড়টা মুড়ি দিয়ে যুগলকে সেই বৃষ্টির ভেতরে নিজেকেই ট্রাঙ্ক আর সুটকেসটা টেনে নামাতে হয়। কি ভাগ্যি এবারে যূথিকাকে নিয়ে যাবে বলে বেশী জিনিস তাকে আনতে হয়নি।

ট্রেন থেকে ত নামা গেল, কিন্তু তার পর গাড়ির কি হবে। খোঁজ করে জানা যায় এখানে বৃষ্টি হচ্ছে দু'দিন ধরে। কাঁচা রাস্তা ভয়ানক খারাপ হয়ে গেছে, তার ওপর দিয়ে গাড়ি চলে না। সেই জন্যে কোনো গাড়ি স্টেশনে আসেনি।

কোনরকমে একটা লোক সংগ্রহ করে তার মাথায় মোট চাপিয়ে হেঁটেই যুগলকে রওনা হতে হয়। একটা ছাতা পর্যন্ত তার সঙ্গে নেই। শীতের দিনে ট্রেনে আর ছাতা কে সঙ্গে নেয়! বৃষ্টির জল তার গায়ের কাপড় ভেদ করে ভেতর পর্যন্ত ভিজিয়ে দিয়েছে ইতিমধ্যেই, বাড়ি পর্যন্ত যেতে যেতে বোধহয় নাইয়ে দেবে। শীতে আর জ্বরে এরই মধ্যে তার দারুণ কাঁপুনি সুরু হয়েছে। কাঁচা রাস্তায় প্যাচপেচে ঘন কাদা। জুতো আছে পায়ে—টেনে তোলাই যায়।

কোনরকমে যুগল এরই ভেতর বাড়িতে গিয়ে হাজির হ'ল। বৃষ্টির ভেতর বাইরে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পর পিসিমা নিজেই এসে দরজা খুললেন,—'ওমা তুই। আমি ভাবছি বৃষ্টির ভেতর কে ডাকে বাপু—সন্ধ্যেবেলায়।'

কিন্তু যুগলের তখন আর কথা বলবার ক্ষমতা নেই। কোনরকমে ঘরের ভেতর পৌঁছে জামা-কাপড় ছাড়তে ছাড়তে সে ক্ষীণভাবে বললে, 'একটা বিছানা করে দাও তাড়াতাড়ি, পিসিমা। বড্ড জ্বর। দাঁড়াতে পারছি না।'

'ওমা, সে কি রে। তুইও জ্বর নিয়ে এলি। এদিকে বৌমারও যে দু'দিন ধরে জ্বর। কি কাণ্ড বাপু। যা তুই মায়ের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড় ততক্ষণ।'—পিসিমা ব্যস্ত হয়ে ওঠেন।

যূথিকারও জ্বর। মায়ের ঘরে যেতে যেতে যুগলের মনটা কি দমে যায়?

না, মন দমবার কি আছে। সে জানে কালকেই না-হয় পরশু সব ঠিক হয়ে যাবে—আবার সব ভালো লাগবে যেমনটি সে ভেবেছে।

সহস্রাব্দিক দুই

কিন্তু সত্যিই আরব্যোপন্যাস শেষ হয়ে যায়নি। সহস্রাধিক এক রজনীর পরেও পৃথিবীতে রহস্যময় অপরূপ রাত্রি নেমেছে। নেমেছে আমাদেরই এই নগরের ওপর। স্থূল বাস্তবতায় বদ্ধ আমাদের মন দিয়ে শুধু আমরা তাকে গ্রহণ করতে পারিনি।

দু'হাজার বছরের ওপার থেকে আজকের এই নগরকে একবার দেখবার চেষ্টা করো। দেখতে পাবে রাত্রের চৌরঙ্গী রহস্য-ঘনিমায় প্রাচীন বোগদাদের ঘন-সন্নিবিষ্ট পল্লীকে ছাড়িয়ে গেছে। তারা-ছিটানো অন্ধকারের তলায় মহানগরী উঠেছে মায়াপুরীর মতো। তার আলোছায়াময় পথে বিচিত্র কাহিনীর ধারা চলেছে।

দু'হাজার বছরের ওপার থেকে নয়, বর্তমানের দৃষ্টি নিয়েই মহানগরের একটি রাত্রির কাহিনী বলবার চেষ্টা করব—আরব্যোপন্যাস যে রাত্রিকে হয়ত স্থান দিতে পারত তার পাতায়, যদি না সুনন্দের সেদিন অমন শোচনীয় পতন হ'ত। এ গল্প সুনন্দের সেই অধঃপতনের, এবং এক চন্দ্রোদয়ের।

হয়ত লক্ষ্য করেছ কোনো কোনো দিন কলকাতার ওপর চাঁদ ওঠে রঙ্গমঞ্চের পটে আঁকা ছবির মতো। সে চাঁদকে যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। মনে হয় নকলটাই বেশী অপরূপ চাঁদের চেয়ে।

সুনন্দ একদিন এই চাঁদ দেখেছিল। কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ কি দ্বিতীয়ার চাঁদ—উঠেছে একটু দেরিতে, পর্দায় আঁকা রঙের প্রলেপের মতো করপোরেশন বিল্ডিংএর পেছন দিয়ে।

সুনন্দ আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। ক্যাসানোভা থেকে তখন বিদেশিনী কোনো মেয়ের তীক্ষ্ণ কণ্ঠের গানে বাজনার অস্পষ্ট সুর চৌরঙ্গী-রোডের আবহাওয়াকে লঘুভাবে আচ্ছন্ন করছে। এপারের থিয়েটারের বিজ্ঞাপিত আলোয় ছুঁচালো খানিকটা অংশ উঠেছে আকাশপানে। সেইক্ষণে সুনন্দ বিস্মিত হয়ে দেখেছিল অন্ধকার করপোরেশন বিল্ডিংএর পেছনে প্রতিপদ কি দ্বিতীয়ার চাঁদ। সে চাঁদ যেন নিজের স্থূলতায় লজ্জিত। অনেক দেশের অনেক রাত্রিকে সে দেখেছে

করে তুলেছে, কিন্তু এখানে যেন সে আড়ষ্ট। সে চাঁদের সামনে করপোরেশন বিল্ডিংও রহস্যময় হয়ে উঠেছে অন্ধকারে, প্রাচীন কোনো বিলুপ্ত জনহীন নগরের প্রাসাদস্তূপের মতো উঠেছে নিঃশব্দ মহিমায় অন্ধকারের দিকে, চৌরঙ্গী-প্লেসের চপল উজ্জ্বলতার প্রতি ভ্রুকুটি হেনে। শুধু চাঁদেরই নেই কোনো মোহ। সে কৃত্রিম চাঁদ যেন এখানে অনাবশ্যক।

কিন্তু সে আড়ষ্ট চাঁদ সুনন্দের জীবনে সেদিন অকারণে দেখা দেয়নি। গূঢ় ইঙ্গিত ছিল তার উদয়ে।

রাত তখন বেশী নয়, তবু চৌরঙ্গী-প্লেস শান্ত। বায়স্কোপের প্রথম পালা ফেরত নাগরিক-নাগরিকার ভিড়ে পথ তখনও বিচিত্র কলগুঞ্জিত হয়ে ওঠেনি। মোড়ে পুলিশ আছে দাঁড়িয়ে চিত্রার্পিতের মতো। ক্যাসানোভার সামনে গম্ভীরভাবে পায়চারি করছে একজন সার্জেণ্ট। পথে সুনন্দ ছাড়া আর কোনো সুবেশ ভদ্রলোক অন্ততঃ নেই। সুনন্দ চলছিল উদ্দেশ্যহীন ভাবে। হয়ত সে এদিক ওদিক ঘুরে উঠতে পারে গিয়ে ইম্পিরিয়ালে, কিংবা অকারণে মার্কেট ঘুরে চলে আসতে পারে আবার ময়দানে। কিছু ঠিক নেই।

সুনন্দের কিছু ঠিক করবার দরকার হয় না। সামাজিক, অর্থনৈতিক অনেকগুলি অবস্থা একসঙ্গে ষড়যন্ত্র করে তাকে সেই ভয়ঙ্কর স্বাধীনতা দিয়েছে, যাতে কোনো দায় না থাকায় মুক্তি দুর্বহ হয়ে ওঠে। এ স্বাধীনতা না থাকলে হয়ত সুনন্দ আজকে রাত্রের নায়ক হতে পারত না। কিন্তু তবু এ মুক্তিতে সে যে নিজে হাঁফিয়ে উঠেছে এটা ঠিক। নিরুদ্দেশভাবে সেই জন্যেই সে বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়। হয়ত এমন রোজই বেরোয়।

এস্প্ল্যানেডের সামনে আলোকিত ফুটপাতে পৌঁছোলে সুনন্দকে আর একটু ভালো করে দেখতে পাওয়া গেল। সে সুবেশ শুধু নয়, সুপুরুষ। জীবনে সম্ভব হ'লেও, গল্পে একসঙ্গে এতগুলি ভালো জিনিসের সমাবেশ একটু সন্দেহজনক। তবু বলতে হচ্ছে, সুনন্দকে দেখে তার বয়স বোঝা যায় না। প্রথম যৌবনের চাপল্য তার কেটে গেছে কিন্তু উজ্জ্বলতা এখনো আছে অম্লান। সুনন্দকে যারা জানে তাদের কাছে সেইটেই আশ্চর্যজনক। সুনন্দ যে বয়সে পৌঁছেছে তাতে এ উজ্জ্বলতা থাকা স্বাভাবিক নয়। কালের স্রোতের বিরুদ্ধে কেমন করে যেন সে স্রোতের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু মুক্তিটাই তার আছে কি। নগরের ওপর আজ যে আড়ষ্ট চাঁদ উঠেছে সেই শুধু জানে।

● অ-বিবাহিত বর ●

করপোরেশন বিল্ডিং-এর গাঢ় ছায়া যেখানে অতল কালো জলের মতো জমে আছে সেখানে সুনন্দ এবার গিয়ে পৌঁছেছে; ডান দিকে ফিরে সে বুঝি মার্কেটের দিকেই চলেছিল। হঠাৎ তাকে থমকে দাঁড়াতে হ'ল।

বাঁ-পাশের অন্ধকারই যেন তাকে ডাকছে। হ্যাঁ, ভুল করবার কিছু নেই। আশেপাশে সে ছাড়া আর কোনো লোক নেই, আর ও-ধারের ফুটপাত ঘেঁষে অন্ধকারে একটি মোটর দাঁড়িয়ে। সেই মোটরের পাশ থেকেই নীলাভ একটি ছায়ামূর্তির সঙ্কেত দেখা যাচ্ছে।

সুনন্দ ইতস্ততঃ করলে একমুহূর্ত। তারপর গেল এগিয়ে। কিন্তু কিছু জিজ্ঞাসা করবার অবসর তার হ'ল না। নীল ছায়ামূর্তি মোটরের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে মৃদু অস্পষ্ট কণ্ঠে বললে, 'এসো, বড্ড দেরি হয়ে গেছে।'

সুনন্দ এখানেও দ্বিধাভরে দাঁড়াল শুধু মুহূর্তের জন্যে। একবার বলতে গেল—'কিন্তু…'। তার কথা আরম্ভ হবার আগেই মেয়েটি তাকে হাত বাড়িয়ে ভেতরে টেনে বসিয়েছে। আজ রাত্রের আড়ষ্ট চাঁদ, কোন্ কাহিনীর সঙ্গে কোন্ কাহিনীর ধারায় জট পাকিয়ে ফেলেছে কে জানে! সুনন্দ তার নিয়তির কাছে আত্মসমর্পণ করলে।

মোটরের মৃদু একটু কম্পন টের পাওয়া গেল, অস্পষ্ট একটু গুঞ্জন। তারপর রাস্তা স্রোতের মতো বয়ে যেতে লাগল দু'পাশ দিয়ে। করপোরেশন স্ট্রীট ছাড়িয়ে চৌরঙ্গী, সেখান থেকে ময়দানের রাস্তা। সমস্ত নগর হঠাৎ আলোর বন্যা হয়ে উঠেছে, তার স্রোত যাচ্ছে সবেগে বয়ে, পাক খাচ্ছে ঘূর্ণিতে, আছড়ে পড়ছে বাধায়।

মোটরের ভেতর অন্ধকার ক্ষণে ক্ষণে রাস্তার ত্রস্ত সঞ্চরমাণ আলোয় একটু তরল হয়ে উঠছে মাত্র। নীল ছায়ামূর্তি তাতে এখনও তেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি, কিন্তু তার কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে।

'আজ শেষ দিন!'

কথা না কণ্ঠস্বরের অপরূপ মাধুর্য, কিসে বলা যায় না সুনন্দের সমস্ত শরীরের ভেতর দিয়ে বিদ্যুচ্চকিত একটা শিহরণ খেলে গেল। সে শিহরণ আনন্দের নয়, ভয়ের নয়—অজ্ঞাত কোনো অনাবিষ্কৃত অনুভূতির।

আজ শেষ দিন। কিসের শেষ দিন সে জানে না, কিন্তু আজকের এই অদ্ভুত রাত্রে যখন চাঁদ উঠেছে কৃত্রিম ছবির মতো রহস্যময় নগরের ওপর, তখন সে কথা বিশ্বাস করতে কোনো বাধাই যেন নেই।

উদ্দাম হাওয়ায় নীলশাড়ীর প্রান্ত মাঝে মাঝে তাকে স্পর্শ করছে নীলসমুদ্রের কোমল ফেনার মতো। সত্যই যেন অজানা নীলসমুদ্রে সে পাড়ি দিয়েছে, অতল অসীম রহস্য-সঙ্কেত তার চারিধারে!

ছায়ামূর্তির পরিচয় চকিত আলোছায়ার ভেতর থেকে একটু একটু করে সে নিজের মধ্যে গড়ে তোলবার চেষ্টা করেছে এতক্ষণ, কিন্তু সম্পূর্ণ সফল হয়নি। দীর্ঘ লীলায়িত দেহ, ফিকে নীল শাড়ী তাকে স্বপ্নের মতো জড়িয়ে উঠেছে। মুখের শুভ্র অস্পষ্টতা থেকে দীর্ঘপক্ষ চোখের দীপ্তি মাঝে মাঝে অন্ধকারকে চমকিত করে দিচ্ছে! এর বেশী কিছু সুনন্দ জানতে পারছে না।

কিন্তু কোথায় চলেছে তারা? তাও কিছু বোঝবার উপায় নেই। দু'ধারে এবার আলোর-পাড়-বোনা প্রসারিত মাঠ। নির্জন পথে দু'-একটা মোটর স্খলিত তারকার মতো ছুটে পার হয়ে যাচ্ছে।

অপরিচিতার কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল, 'এমনি করে শেষ হওয়াই হয়তো ভালো। আনন্দের শেষ চূড়ায় আমাদের এই বিদায়ের মুহূর্ত অম্লান হয়ে থাক্। কে জানে নইলে আমরা হয়ত একে কোনো গ্লানিতে নামিয়ে নিয়ে আসব, জোর করে তাকে দীর্ঘ করতে গিয়ে।'

একটি কোমল হাত সুনন্দের কোলের ওপর এসে পড়ল, তার পর খুঁজে নিলে সুনন্দের হাত। সুনন্দের সমস্ত শরীরে যেন তুফান উঠেছে রহস্যময় উল্লাসের।

'একটা কথা আজ আমায় দাও। বলো, আর আমায় খুঁজতে চেষ্টা করবে না!'

সুনন্দ চুপ করে রইল এবার দ্বিধায়।

আবার সে বললে, 'খুঁজে পাওয়া হয়ত শক্ত হবে না, কিন্তু সে-খুঁজে-পাওয়া হবে সত্যিকারের হারানো।'

সুনন্দ নিরুত্তর।

'তুমি কি ভাবছ আমি জানি। কিন্তু সত্যি এবার আমি মন স্থির করেছি। কাল থেকে আমার দেখা পাবে না। কাল আবার কিছুতেই তোমায় আসতে বলব না। সত্যিই আজকে শেষ দিন!'

অন্ধকারে, গঙ্গার দেখা পাওয়া গেছে এবার। এখনো মোটরের থামবার কোনো লক্ষণ নেই।

'তোমার চেয়ে আমার দুঃখ কম নয়, কিন্তু আমি বুঝেছি এই ভালো। এই কটি অপরূপ রাত আমি হারাতে চাইনা বেশী লোভ করে। জীবনের চরম সৌভাগ্যের জন্যে চরম দুঃখের দাম দিতে হয়।'

চাঁদ আরো উঁচুতে উঠেছে। প্রশস্ত পথ দু'পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে যেন রূপালী নদীর মতো। প্রিন্সেপ্স ঘাট পার হয়ে হঠাৎ মোটর মাঠের ধারে এসে থেমে গেল।

সুনন্দের সমস্ত শরীর কাঁপছে উত্তেজনায়। অপরিচিতা আরো কাছে সরে এসেছে, তার শরীরের অস্পষ্ট সৌরভ সুনন্দকে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে অদ্ভুত এক মাদকতায়। কাঁধের ওপর তার কোমল গালের স্পর্শ। তার দু'-একটি উড়ো চুল মুখে চোখে লাগছে।

'তুমি কি আজ কোনো কথা বলবে না! সত্যি তুমি কি অভিমান করেছ?' —মিনতি-কাতর অপরূপ কণ্ঠস্বর। জ্যোৎস্নাতরল অন্ধকারে কোনো নামহীন নিশীথ-পুষ্পের মতো সে তার মুখ তুলে ধরেছে সুনন্দের মুখের কাছে। সুনন্দ এবারও ইতস্তত: করেছিল কয়েক মুহূর্ত—তার পর আর পারলে না।

হঠাৎ মেয়েটি অস্ফুট চীৎকার করে সবলে সুনন্দকে ঠেলে দিলে। খুট করে একটু আওয়াজ হয়ে মোটরের ভেতরের আলো এবার জ্বলে উঠল।

মেয়েটির মুখ সাদা হয়ে গেছে, ভয়ে বিস্ময়ে। সুনন্দ পাষাণ-মূর্তির মতো নিস্পন্দ।

অনেকক্ষণ বুঝি এমন করে কাটল। ধীরে ধীরে মেয়েটির মুখের রক্ত ফিরে এল। তার সঙ্গে বুঝি ঠোঁটের কোণে সূক্ষ্ম একটু হাসির রেখা। সে হাসির মানে বোঝা যায় না। সুনন্দ তখনও স্থিরভাবে তার দিকে চেয়ে আছে। ধীরে ধীরে সে বললে, 'আমি এখানে নেমে যেতে পারি?'

স্টিয়ারিং হুইলে একটি হাত রেখে মেয়েটি শান্ত স্বরে বললে, 'তার দরকার নেই।'

সুনন্দ বললে, 'আমি নিজেকে নির্দোষ বলতে চাই না, কিন্তু...'

মেয়েটি বাধা দিয়ে একটু হেসে বললে, 'কৈফিয়তের কি প্রয়োজন! আমি কোনো অভিযোগ করছি না।'

সুনন্দের অটুট ধৈর্য কেন বলা যায় না এবার ভেঙে গেছে। বিচলিত স্বরে সে বললে, 'এখন কি করা যায়!'

'ইচ্ছে করলে এমনি খানিক এখানেই বসে থাকা যেতে পারে।'

সুনন্দ অবাক হয়ে মেয়েটির দিকে তাকাল। ভেতরের আলো তাকে স্পষ্ট করে তুলেও তার রহস্য হরণ করতে পারেনি। বিস্মৃত কোনো বইএর পাতা থেকে সে যেন নেমে এসেছে।

সুনন্দ নির্বোধের মতো বললে, 'সে কি ভালো হবে?'

'হবে না হয়ত, কিন্তু সব কিছু ভালো করবার কোনো কঠিন পণও ত নেই।'

সুনন্দই এবার মাথা নীচু করলে, তারপর মৃদুস্বরে বললে, 'একটা কথা ভাবছি, আপনার শেষ রাত এখনও চেষ্টা করলে এমনভাবে ব্যর্থ নাও হতে পারে।'

'কে বলতে পারে! হয়ত ব্যর্থ হয় নি।'

গলার স্বরে কি বিদ্রূপ? সুনন্দ মেয়েটির মুখের ওপর একবার ক্রস্ত চোখ বুলিয়ে নিলে। কিছুই বোঝা গেল না।

যেন সাহস সংগ্রহ করেই বললে, 'আমার দিক দিয়ে দুঃখ করবার কিছু নেই।'

অপরিচিতার মুখে দুর্জ্ঞেয় সেই হাসি।

'শুনে সুখী হলাম।'

হঠাৎ মোটরের আলো নিবিয়ে দিয়ে মেয়েটি আবার বললে, 'চলুন, মাঠে নামা যাক্। আপত্তি নেই বোধ হয়?'

সুনন্দ অপ্রতিভ ভাবে হেসে বললে, 'না।'

দুজনে জ্যোৎস্নালোকে ধূসর মাঠে নেমে এসেছে। দূরে নগরের ম্লান আলোকগুলিকে অত্যন্ত অবাস্তব মনে হচ্ছে এই জ্যোৎস্নায়।

পাশাপাশি তারা নীরবে অনেক দূর হেঁটে গেল। মাঠের মধ্যে অত্যন্ত হালকা একটু কুয়াশা এরি মধ্যে জমেছে। সে কুয়াশা যেন বর্তমান মুহূর্তটিকে ছাড়া সমস্ত অতীত-ভবিষ্যৎকে সযত্নে মুছে ফেলতে চায়।

কিন্তু তবু সুনন্দই প্রথমে বললে, 'এবার ফেরা যাক্।'

'এর মধ্যেই!'—ফের সেই দুর্বোধ্য কণ্ঠস্বর। ব্যঙ্গের রেশ আছে কিনা বোঝা যায় না।

'নইলে কোথায় গিয়ে আর পৌঁছোব!'

'কোথাও একটা পৌঁছোন দরকার বটে। চলুন তাহ'লে ফিরি।'

নিঃশব্দে আবার তারা ফিরে এল মোটরের কাছে। মেয়েটিকে মোটরের দরজা খুলে উঠতে দিয়ে সুনন্দ এবার বললে, 'আমি কিন্তু এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি।'

'কেন? আপনাকে আমি যেখানে বলবেন নামিয়ে দিতে পারি।'

'না, দরকার নেই। আজ রাত্রে আমার হাঁটতেই ভালো লাগছে!'

তবু অপরিচিতার যাবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। নিঃশব্দে খানিক বসে থেকে সে বললে, 'একটা অনুরোধ আপনাকে করতে পারি?'

'বলুন।'

'আমাদের পৃথিবী অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। হয়ত আবার দেখা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তা না হ'লে নিজে থেকে আর আমার পরিচয় জানবার চেষ্টা করবেন না।'

মেয়েটি একটু থেমে আবার বললে, 'আজকের এই আশ্চর্য রাত যদি আপনার মনে এতটুকু মোহ সঞ্চার করে থাকে তাহ'লে একে এখানেই শেষ হতে দিন—জের টানবার চেষ্টা করে তার অপমান করবেন না।'

মেয়েটি তার শুভ্র কোমল একটি হাত বাড়িয়ে দিলে। সুনন্দ সে হাত অত্যন্ত সন্তর্পণে নিজের মুঠিতে ধরে বললে, 'তাই হবে! জীবনের সবচেয়ে মধুর স্বপ্নকে আমি দিনের আলোয় টেনে লাঞ্ছিত করবার চেষ্টা করব না।'

মৃদু গুঞ্জন করে মোটর এবার ঘুরল। কিন্তু হায়! স্বপ্নের সম্মান রাখার শক্তি শুধু অক্ষুণ্ণ যৌবনেরই আছে। অগাধ যার ঐশ্বর্য, লোভের দুর্বলতা তারই নাই শুধু।

সুনন্দ মুখ ফেরাবার চেষ্টা করেও পারলে না। মোটরের পেছনের নম্বরগুলো জ্বলজ্বল করছে। সে প্রলোভন জয় করা তার হ'ল না। স্বর্গ থেকে সেই মুহূর্তে তার চরম পতন হ'ল।

আমরা জানি নগর-শিখরে এইজন্যেই আড়ষ্ট চাঁদ তাকে দেখা দিয়েছিল। এ চাঁদ সকলকেই একদিন দেখতে হয়—অস্তমান যৌবনের শেষ পাণ্ডুর চাঁদ।

মাঝখানে একটি দরমার বেড়া আছে। কিন্তু সে কোনো কাজের নয়। তাহাতে আবরু রক্ষা হয় না।

বেড়া, দরমার না হইয়া, আর কিছু মূল্যবান জিনিসের হইলেও লাভ ছিল না। কল-পাইখানা এক। সুতরাং সামান্য ভাড়ার ভাড়াটে এই দুই পরিবারের আবরুময় আদর্শকে অনেকখানি নামাইয়া আনিয়া পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে রফা না করিলে চলে না।

অসুবিধা আছে অবশ্য অনেক।

মেজ-বৌ স্বামীর ভাতের থালার সামনে বসিয়া পাখা করিতে করিতে বলে, 'আর একটা একানে বাড়ি দেখো বাপু, নইলে এমন করে ত আর পারি না!'

বিধুভূষণের অফিসের সময় হইয়া আসিয়াছে। কোনরকমে বড় বড় ভাতের গ্রাসগুলো চর্বণের হাঙ্গামা বাঁচাইয়া গলাধঃকরণ করিয়া যায়। শুনিতে পাক্ বা না-পাক্ কোনো উত্তর দেয় না।

মেজ-বৌ বলিয়া চলে, 'কল ত একটি মিনিটের জন্যে খালি পাবার জো নেই। যখনই যাব, দেখি ওদের পিসিবুড়ী বসে আছে;—খুয়ে খুয়ে হাড়-পা হেজে গেল, তবু বুড়ীর ছুঁচিবাই যায় না।'

বিধুভূষণের খাওয়া প্রায় তখন সাঙ্গ হইয়া আসিয়াছে। নিশ্বাস ফেলিবার অবসর পাইয়া সে শুধু বলিল, 'হুঁ।'

'না, শুধু হুঁ নয়, পুরোপুরি ভাড়া শুনে এত অসুবিধে কেন সইব বলো ত? বাড়ি তোমায় দেখতেই হবে এবার।'

গেলাসের জলটি নিঃশেষ করিয়া উঠিয়া পড়িয়া বিধুভূষণ বলে, 'পান সাজা আছে ত?'

মেজ-বৌ রাগিয়া বলে, 'আছে গো আছে। এতক্ষণ ধরে ব'কে মরলুম, তা মানুষ না পাথরকে বললুম জানবার জো নেই। আমার কথায় ত তুমি গা কর না, চিরদিন দেখে আসছি।'

আচাইয়া আসিবার পর পান দিতে দিতে মেজ-বৌ আবার বলে, 'তোমার

কি বলো না! কতি ত আর তোমায় পোষাতে হয় না। দিব্যি বাইরে যাইরে খাও, বাড়িতে এসে বাড়া ভাত খাও আর নাক ডাকাও।'

বিধুভূষণ জামার বোতাম লাগাইতে লাগাইতে বলে—'হুঁ'।

'একদিন আমার জায়গায় থাকতে হ'ত ত বুঝতে, এমন করে একসঙ্গে থাকার কি জ্বালা! চার বছরের ছেলেটাকে পর্যন্ত সামলান দায়! এই এটা ভাঙছে, এই সেটা ফেলছে। তা, মা কি শাসন করবে একটু!'

বিধুভূষণ জুতা পায়ে গলাইয়া একবার একসঙ্গে অনেকগুলো কথা বলিয়া ফেলে, 'কাপড়টা রিপু করতে ভুলো না যেন—নইলে অমনি ধোপার বাড়ি চলে যাবে।'

মেজ-বৌ অত্যন্ত চটিয়া গিয়া জবাব দেয়, 'যাবে ত যাবে। পারব না আমি। বকে বকে আমার মুখে ব্যথা হয়ে গেল তাতে একটু ভ্রূক্ষেপও নেই গা?'

কিন্তু বিধুভূষণ ততক্ষণে সদর দরজা পার হইয়া গিয়াছে।

মেজ-বৌ স্বামীকে চেনে সুতরাং রাগ তাহার বেশীক্ষণ থাকে না। ওই লোকটির কাছে মানুষের ভাষা যে একটা বাহুল্য-বিলাস মাত্র এবং অত্যন্ত প্রয়োজন ছাড়া সে যে তাহা ব্যবহার করিতে একেবারে নারাজ, এ কথা এই দশ বৎসরের বিবাহিত জীবনে সে ভালো করিয়াই বুঝিয়াছে। সুতরাং খানিক আপনমনে গজগজ করিয়া সে চুপ করে।

হঠাৎ ওধারের ঘর হইতে অমল ডাকিয়া বলে, 'শীগ্‌গির শুনে যাও বৌদি, তুমি না বিচার করলে চলবে না!' এবং বৌদির সাড়া দিতে বিলম্ব দেখিয়া নিজেই একহাতে স্ত্রীকে এবং অপর হাতে ছেলেকে টানিয়া আনিয়া হাজির হয়।

মেজ-বৌকে হাসিয়া ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিতেই হয়, 'আবার কি হ'ল?'

অমল উত্তেজিত কণ্ঠে বলে, 'ভাখো দিকি আস্পর্ধা তোমার ভায়ের!'

স্ত্রী কাননবালা তাহার হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিয়া চাপা রাগের স্বরে তাহার কথায় বাধা দিয়া বলে, 'বুড়ো মদ্দ! এখনও ভাকামি গেল না। এক্ষুনি পিসিমা এসে পড়বে, ছাড়ো হাত—'

অমল বেশ ভালো করিয়া তাহাকে ধরিয়া রাখিয়া বলে, 'উঁহুঁ, আগে বিচার হোক।' তাহার পর বৌদির দিকে ফিরিয়া বলে, 'এই-যে চাঁদের মতো ছেলেটি দেখছ বৌদি, তোমার দা বলে কিনা ও মামাদের দিক থেকে সুন্দর হয়েছে!'

মেজ-বৌদি হাসিয়া ফেলে। অমল গম্ভীর স্বরে বলে, 'হাসির কথা নয় বৌদি!

তোমায় বিচার করতে হবে। ওর মামাদের ত সেদিন দেখলে, বৌদি। বিধাতা গড়া শেষ করতে-না-করতে কোনরকমে পৃথিবীতে পালে পড়েছে ব'লে মনে হ'ল কিনা বলো। আর এই ছেলে বলে কিনা তাদের মতো!'

কাননবালা রাগিয়া হাত-ঝাঁকানি দিয়া বলে, 'যাও! বেহায়া কোথাকার!'

ছোট ছেলেটি হাসিয়া উঠে।

মেজ-বৌ হাসিয়া বলে, 'তা আমি কি বিচার করব?'

'কেন—এই পদ্মপলাশ চোখ, এই বাঁশির মতো নাক, এই তপ্তকাঞ্চনের মতো রঙ সব আমার মতো, তাই বলবে। তোমার ত সোজা রায় পড়ে রয়েছে। পা-গুলো হয়ত মামাদের মতো গোদা গোদা; ওইটুকু শুধু তোমার রায়ে জুড়ে দিতে পার।'

'যেমন রূপ তেমনি কথার ছিরি!' বলিয়া কানন এবার হঠাৎ ঝাঁকানি দিয়া হাত ছাড়াইয়া পলাইয়া যায়।

অমল বলে, 'তাহ'লে আমার পক্ষেই একতরফা ডিক্রি ত বৌদি?'

মেজ-বৌ হাসিতে থাকে।

• • •

অমল কথা বলে একটু বেশী। হাসি-তামাসা করিতে গিয়া একটু বাড়াবাড়িই হয়ত করিয়া ফেলে, কিন্তু তাহার উপর বিরক্ত হইতে মেজ-বৌ পারে না। তাহার আচরণে কথাবার্তায় কোথায় যেন সত্যকার একটি সরলতা আছে।

অসহ্য তাহার স্ত্রী কাননবালার ব্যবহার। মেয়েটি যেমন স্বার্থপর তেমনি অহঙ্কারী।

মেজ-বৌ গোপনে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করে, হ্যাগা, বি. এ. পাস না হ'লে নাকি বায়স্কোপের টিকিট-বিক্রির কাজে নেয় না?'

বিধুভূষণ ঈষৎ হাসিয়া বলে, 'শুনিনি ত এমন কথা।'

মেজ-বৌ আশ্বস্ত হইয়া বলে, 'বাবা, আমার সঙ্গে কি তর্কটাই না করলে কানন, ওর বর নাকি বি. এ. পাস। তা না হ'লে বায়স্কোপের টিকিট বিক্রি কাউকে করতেই দেয় না!'

একটু হাসিয়া মেজ-বৌ আবার বলে, 'দোষের মধ্যে আমি শুধু বলেছি—"সেবারে উনি অসুখে না পড়লে বি. এ. পাস হতেন।" অমনি বলে কি না, "আমাদের উনি তাই কিন্তু বি. এ. পাস দিয়ে জলপানি পেয়েছেন।" হ্যাগা, বি. এ. পাস দিয়ে জলপানি পেলে কি কেউ বায়স্কোপের টিকিট বিক্রি করে?'

বিধুভূষণ চোখ বুজিয়া শুইয়া থাকে, উত্তর দেয় না।

মেজ-বৌ বলে, 'আমি বাপু আর সহ্য করতে পারলুম না, দিয়েছি ও-কথা বলে। তারপর আমার সঙ্গে কি ঝগড়া! বলে, ও ত বি. এ. পাসেরই চাকরি। মেয়েটার দেমাক দেখলে গা জ্বলে যায়।'

স্বামীর নাক-ডাকার শব্দ পাইয়া মেজ-বৌ বলে, 'বাঃ, ঘুমোচ্ছ নাকি!'

বিধুভূষণ সংক্ষেপে বলে—'না।'

মেজ-বৌ উৎসাহিত হইয়া বলিয়া যায়, 'বর ত টিকিট বিক্রি ক'রে পঁচিশটে টাকা মাইনে পায়, তার বড়াই কত! লাখ-পঞ্চাশ ছাড়া কথা নেই মুখে। সেদিন তুমি আম এনেছিলে না?—তা ছেলেটার জন্যে দুটো দিতে গেলাম। ওমা, কোথায় খুশি হবে, তা না বলে কিনা "দিচ্ছ ত ভাই, আমার ছেলের মুখে ও আবার রুচলে হয়, দিশী আম খাওয়া ওদের অভ্যাস নেই কিনা।" তারপর ওঁর বাপের বাড়িতে ল্যাংড়া ফজলি ছাড়া কিছু ঢোকবার হুকুম নেই, কি তার আদিখ্যেতার গল্প! নেহাত ছেলেটা খেতে পাবে না, নইলে আমগুলো সেদিন ফিরিয়েই আনতাম।'

বিধুভূষণের নাক-ডাকার শব্দ ততক্ষণে ক্রমশঃ প্রবল হইতে সুরু করিয়াছে।

'ভালো লোকের সঙ্গে গল্প করতে এসেছিলাম!'—বলিয়া মেজ-বৌ উঠিয়া যায়।

ছোট একটি বাড়ির মধ্যে শুধু দারিদ্র্যের প্রয়োজনে দুইটি পরিবার এমনি করিয়া জোড়াতালি দিয়া বাস করে।

গরমিল যথেষ্ট আছে কিন্তু মিলও একেবারে নাই বলা যায় না।

অমল আসিয়া রান্নাঘরে চুপি চুপি বলিল, 'শুনছ বৌদি, দাদা আছে নাকি ঘরে?'

চুপি-চুপি কথা শুনিয়া অবাক হইয়া মেজ-বৌ বলিল, 'না, কেন বলো ত?'

'নেই ত? বাঁচলাম বাবা। সত্যি কথা বলতে কি বৌদি, দাদাকে দেখলেই আমার ভয় করে। এই যে মুখে কথাটি নেই, ও-সব লোক সোজা নয়। দাদা আমার দিকে চাইলেই ত আমার মনে হয়, তাঁদের ঘরে আমসত্ত চুরি করতে গিয়ে বুঝি সবেমাত্র ধরা পড়ে গেছি—এক্ষুনি কান মলে দেবে।'

মেজ-বৌ হাসিয়া বলিল, 'এবার না হয় তাই দিতে বলব। কিন্তু ব্যাপারটা কি?'

অমল গলার স্বর নামাইয়া আবার বলিল, 'পিসিমাকে একটু ব্যাপাতে হবে। দোহাই বৌদি, তোমার না গেলে চলবে না।'

মেজ-বৌ আপত্তি করিয়া বলিল, 'না না, বুড়ো মানুষ। ওসব আমি ভালোবাসি না।'

কিন্তু অমল ছাড়িবার পাত্র নয়। হাতজোড় করিয়া বলিল, 'তা হবেনা বৌদি, তুমি না এলে মজাই হবে না।'

মেজ-বৌ তথাপি আপত্তি করিল, কিন্তু অমলের অনুরোধ এড়ান অসম্ভব। হাতে-পায়ে ধরিয়া শেষ পর্যন্ত সে তাহাকে নিমরাজী করাইয়া ছাড়িল।

পিসিমার সবে তখন আহ্নিক সারা হইয়াছে।

অমল গিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, 'পিসিমা, এদিকে ত সর্বনাশ হয়ে গেছে, শুনেছ ত!'

পিসিমা উদ্‌গ্রীব হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'না বাবা, কি হ'ল কি?'

পরম বিস্ময়ের ভান করিয়া অমল বলিল, 'বাঃ, জান না তুমি? কাল সারা কলকেতার লোক যে প্রাচিত্তির করবে।'

পিসিমা অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'কেন বাবা?'

'কেন! ওই বৌদিকেই জিজ্ঞেস করো না। দাদা ত আজ খবরের কাগজেই পড়েছে। কাল জল খেয়েছিলে ত? কলের জল?'

পিসিমা ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন যে খাইয়াছেন।

'তবেই সর্বনাশ হয়েছে! একেবারে সদ্য মোষের রক্ত!'

পিসিমা শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন, 'বলিস্ কিরে, মোষের রক্ত কি?'

'আর কি! কাল কলের জলের ট্যাঙ্কে কেমন করে একটা মোষ পড়ে গেছল যে! অনেক কষ্টে সেটা তুলে ফেলেছে, কিন্তু তোলবার পর দেখা গেল মোষের একটা পা কাটা। সে কাটা পা ট্যাঙ্কের ভেতরেই পড়ে আছে।'

পিসিমা কম্প নিশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তার পর—'

অমল গম্ভীর ভাবে বলিল, 'তারপর খোঁজাখুঁজি। কিন্তু কোথায় পাবে সে ঠ্যাং। জলের কলের চাকায় ছাতু হয়ে ততক্ষণ সে শহরময় লোকের পেটে চলে গেছে।'

জলের কলে এমনটি হইতে পারে কিনা সে প্রশ্ন পিসিমার মনে জাগিল না। অত্যন্ত শুচিবায়ুগ্রস্ত লোক; ভীতস্বরে বলিলেন, 'তাহ'লে কি হবে বাবা?'

হতাশ স্বরে বিমল বলিল, 'হবে আর কি! পণ্ডিতেরা ত ব্যবস্থা দিয়েই দিয়েছে এরই মধ্যে। বলো না বৌদি, দাদা আজ খবরের কাগজ পড়ে কি বললে?'

মেজ-বৌ ও কানন অনেক কষ্টে হাসি চাপিয়া রাখিল।

অমল বলিল, 'দেশসুদ্ধ লোকের প্রাচিত্তির। সোজা কথা ত নয়! গরীব বড়মানুষ সবার কুলোন ত চাই! তা ব্যবস্থা ভালোই হয়েছে। ক্ষ্যামতা না থাকলে কমপক্ষে তিনটি ব্রাহ্মণ ভোজন আর ঠাকুরের স্থানে সাড়ে পাঁচ আনার পূজো। এ আর বেশী কি বলো!'

পিসিমার একটু হাতটানের অখ্যাতি আছে। কিন্তু দেশসুদ্ধ লোক প্রাচিত্তির কারণে তিনি কেমন করিয়া চুপ করিয়া থাকেন। অমল বৌদির দিকে চোখ টিপিয়া ইসারা করিয়া বলিল, 'আমি আর দাদা ত আছিই—পাশের বাড়ির নন্দকেও বলা যাক্ তাহ'লে, কি বলো?'

মেজ-বৌ ও কানন মুখে কাপড় চাপা দিয়া পলাইয়া গেল।

আর একটি মিলনের সূত্র—ছেলেটি।

ছেলেটা অত্যন্ত হ্যাংলা। যখন-তখন আসিয়া সে হাত পাতিয়া দাঁড়ায়। একটা কিছু ভোজ্যদ্রব্য না পাইলে নড়িবার নাম করে না। সুবিধা থাকিলে চুরি করিয়া লইয়া যাইতে তাহার কিছুমাত্র আপত্তি নাই।

মেজ-বৌয়ের ছেলেপুলে নাই। হইবার আশাও নাই। অনভ্যস্ত বলিয়া ছেলেটার দুরন্তপনায় এক এক সময়ে সে ব্যতিব্যস্ত হইয়া ওঠে। কিন্তু তাহাকে দূরে ঠেলিয়া রাখিতেও পারে না। ছেলেটা কেন বলা যায় না তার অত্যন্ত ন্যাওটা হইয়া পড়িয়াছে।

সকাল হইতে-না-হইতে যে-কোনো উপায়ে একটা বাটি কোথাও হইতে যোগাড় করিয়া সে দরজায় আসিয়া ডাকে, 'জ্যেঠি, লুচি!'

কবে একদিন রাত্রে বুঝি তাহাদের লুচি হইয়াছিল। রাত্রে ঘুমন্ত থাকায় দরুন খাওয়াইতে পারে নাই বলিয়া মেজ-বৌ ছেলেটার জন্য কয়েকটা লুচি তুলিয়া রাখিয়াছিল। সেই হইতে প্রতিদিন সকালে সে লুচির প্রত্যাশা করিয়া আসিয়া দাঁড়ায়। না দিলে নিস্তার নাই। কাঁদিয়া-কাটিয়া সে একাকার করে।

মেজ-বৌ এক এক সময়ে এই অকারণ উপদ্রবে বিরক্ত হইয়া উঠে, কিন্তু প্রতিদিন রাত্রে সব কাজ ফেলিয়াও লুচি সে না ভাজিয়া পারে না।

স্বামী ও স্ত্রী এই দুইটি মাত্র প্রাণী লইয়া সংসার। ঘরসোর তাহাদের একটু গুছান পরিপাটি রাখাই অভ্যাস, কিন্তু খোকার জন্য আজকাল আর তাহা রাখিবার জো নাই।

তাহাদের শুইবার ঘরটাই খোকার সবচেয়ে প্রিয় খেলাঘর, বিছানায় সমস্ত বালিশ একত্র করিয়া তাহার মোটর খাটের উপর তৈরি হয়। শুধু তৈয়ারি করিয়াই তাহার সুখ নাই। জ্যেঠিমাকে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সেই মোটরের সশব্দ চলা দেখিতেও বাধ্য হইতে হয়। দরকার হইলে সে মোটরের তলায় কোনো কোনো দিন চাপা পড়িয়া চীৎকার না করিলেও নিস্তার নাই।

মেজ-বৌয়ের আলমারিতে সাজান পুরাতন পুতুলগুলির এক এক করিয়া অনেকগুলিই খোকার নির্মম হাতে নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছে।

যে-সব কথা ভাবিবার কোনো প্রয়োজন কোনো দিন হয় নাই, মেজ-বৌকে আজকাল তাহা লইয়াই মাথা ঘামাইতে হয়।

দেশলাই সারাদিন তাহাকে সাবধানে লুকাইয়া ফিরিতে হয়। কেরোসিন তেল রাখিবার জন্য আলমারির উপর নূতন স্থান নির্বাচন করিতে হইয়াছে। কেশ-প্রসাধনে খোকার ওই তেলটির প্রতিই পক্ষপাতিত্ব একটু বেশী।

দেরাজ হইতে সম্প্রতি তাহার নতুন একটা ভালো আসন বাহির করিতে হইয়াছে। বিধুভূষণের সকাল-বিকালে চা খাইবার সময়টি খোকা ঘড়ির কাঁটার মতো জানে। তখন শুধু চা পাইলেই তাহার চলে না, বিধুভূষণের মতো আসন ও পেয়ালা দুই-ই চাই। মেজ-বৌ দু'দিন অন্য কিছু দিয়া ভুলাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু ফল হয় নাই। ভালো-মন্দের তফাত খোকা ভালো করিয়াই চেনে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই খোকাকে লইয়াই একদিন এই দুই পরিবারের গভীর বিচ্ছেদ ঘটিয়া গেল।

সকাল হইতেই খোকার অসুখ। অসুখ এমন বেশী কিছু নয়। বার-দুই বুঝি সামান্য একটু বমি হইয়াছে, পেটটাও ভালো নয়। তবে ছেলেমানুষ; তাহাতেই একটু নির্জীব হইয়া পড়িয়াছে।

মেজ-বৌ সকল কথা শুনিয়া, স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়া হোমিওপ্যাথিক কি-একটা ঔষধ দিতে গিয়াছিল। সেখানে পিসিমার কথায় সে একেবারে অবাক হইয়া গেল।

পিসিমা বলিলেন, 'অসুখ ত দেবে মা, তবে কিনা গোড়ায় হুড়ুল মেরে আগায় জল দেওয়াটা ত আর ভালো নয়।'

কথাটা মেজ-বৌ প্রথমে ভালো করিয়া বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত ভাবে চাহিয়া রহিল।

পিসিমার কথাটা অস্পষ্ট রাখিবার ইচ্ছা ছিল না। কাননের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'তোমাদের বাপু যা সহরম মহরম! আমি ভয়ে কোনো কথা বলি না। ভাবি, কাজ কি আমার বাপু এসব কথায় থেকে! তবে এই করে বুড়ো হলুম, রাম না হতে রামায়ণ আমি এঁচে রেখেছি। একটা কিছু যে হবে আমি গোড়াগুড়ি থেকে জানি।'

কানন মুখখানা ভার করিয়া বলিল, 'আমি কি করব বলুন? ওসব গলাগলি ঢলাঢলিতে আমি নেই। মানুষের নিজের যদি লজ্জা-সরম না থাকে ত, কে কি করতে পারে?'

"এই লজ্জাসরমহীন মানুষ" যে কাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে তাহা বোঝা মেজ-বৌয়ের পক্ষে কঠিন নয়, তবু এসব কথার কারণ সে আন্দাজ করিতে পারিল না।

এবার সোজাসুজিই তাহাকে সে কথা জানাইয়া দিতে পিসিমার বিলম্ব হইল না। বলিলেন, 'ঠিক মাফিকসই রান্না আর কোনো গেরস্তর হয় না। সংসারের খাবার-দাবার বাঁচে বইকি; কিন্তু তাই ব'লে ওই দুধের ছেলেকে সেগুলো যখন-তখন কি খাওয়ায় মা! দেখছ ত মা—হাঁড়ির তলানি, পাতকুড়োনো খেয়ে ছেলেটার কি অবস্থা হয়েছে?'

এই অন্যায় আক্রমণে রাগে ঘৃণায় মেজ-বৌয়ের সমস্ত শরীর একেবারে রী-রী করিয়া উঠিল। গতরাত্রে তাহাদের পায়েস হইয়াছিল, তাই ছেলেটাকে আদর করিয়া ডাকিয়া অন্য দিনের মতোই সে খাওয়াইয়াছে। ছেলেটার আগ্রহাতিশয্যে খাওয়ানোটা হয়ত একটু অতিরিক্তই হইয়াছিল, কিন্তু সেই খাওয়ানো ব্যাপারটার এমন বিকৃত করিয়া কেহ যে ব্যাখ্যা করিতে পারে, এ কথা তাহার কল্পনায়ও আসে নাই।

সে রূঢ়স্বরে বিদ্রূপ করিয়া বলিল, 'বেচে ত দিতে আসি না, পিসিমা। পেট ভরে খেতে দিতে পার না, ছেলেটা যে তাই ওই পাতকুড়োনো খাবার জন্যেই হা-হা করে বেড়ায়।'

কাননের সমস্ত রাগ পড়িল ছেলেটার উপর গিয়া। সজোরে সেই রুগ্ন শিশুর কানটাই মলিয়া দিয়া বলিল, 'হ'ল ত হতচ্ছাড়া ছেলে, হ'ল ত? সই সই করে বারণ করেছি—যাসনি হতভাগা, যাসনি! কিছুতে শুনবেনা গা!'

ছেলেটা 'জ্যেঠিমা গো!' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

পিসিমা কিন্তু গলার স্বরে একেবারে মধু ঢালিয়া দিয়া মেজ-বৌকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, 'রাগের কথা ত নয় মা, ছেলেরা অমন হাঁ-হাঁ করে বেড়াচ্ছে! বিধেতা তোমায় বঞ্চিত করেছেন, ছেলেপুলের কথা তুমি জানবেই বা কি করে বলো!'

মেজ-বৌ আর থাকিতে পারিল না, রাগে দুঃখে অভিমানে কাঁদ-কাঁদ হইয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিল। কিন্তু পিসিমা তখনও বলিতেছিলেন, 'হয় ত আমার ওই জন্যেই, বৌমা। কপালে যাদের আদর-করা নেই, তাদের আদর যে সয় না কিছুতে—শাপ হয় যে!'

সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটার কান্নাও শোনা গেল। 'জ্যেঠিমার কাছে যাব' বলিয়া সে বায়না ধরিয়াছে।

মেজ-বৌ সেদিন বিধুভূষণের কাছে অভিযোগ অনুযোগ কিছুই করিল না, শুধু সংক্ষেপে জানাইয়া দিল, 'এ বাড়িতে আমি কিছুতেই থাকব না, তুমি অন্য বাড়ি ভাখো।'

স্ত্রীর এমন মুখের চেহারা বিধুভূষণ কখনো দেখে নাই। সে শুধু বলিল, 'আচ্ছা।'

খোকার অসুখ অবশ্য সহজেই সারিয়া গেল, কিন্তু দুই পরিবারের ব্যবধান দূর হইল না। খোকা এখনও মাঝে মাঝে মায়ের সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া জ্যেঠিমার কাছে আসিয়া দাঁড়ায়, কিন্তু মেজ-বৌ দেখিয়াও ভ্রূক্ষেপ করে না, হাজার ডাকিলেও সাড়া দেয় না। খোকা কাঁদে; উৎপাত করিয়া তাহার কাছে দুর্বোধ জ্যেঠিমার এই ঔদাসীন্য দূর করিবার চেষ্টা করে; কিন্তু কোনো ফল হয় না। শেষ পর্যন্ত পিসিমা বা কানন আসিয়া তাহাকে জোর করিয়া তুলিয়া লইয়া যায়। বিধুভূষণ স্বভাবতই নির্বাক, এই বিবাদের ফলে তাহার কোনো পরিবর্তন চোখে পড়ে না। আর পরিবর্তন হয় না শুধু অমলের। এসব ব্যাপারের কিছুই সে জানে না। তেমনই আগের মতো সে হাসি-ঠাট্টা করে। মেজ-বৌকেও বাধ্য হইয়া উৎসাহ না হোক সায় দিতে হয়।

ইহারই ভিতর একদিন শোনা গেল অমলের টিকিট-বিক্রির চাকরিটি গিয়াছে।

অমল বলিল, 'চাকরি এ বাজারে আর মিলবে না, বৌদি। ভাবছি এবার

লেপ-কম্বল নিয়ে বেরিয়েই পড়ব। বৌটাকে দিয়ো বাপের বাড়ি পাঠিয়ে। পিসিমার দশটাকা মাসোহারা আছে—কাশী-বৃন্দাবন যেখানে হোক থাকলে চলে যাবে। দাদাকে ব'লে ছেলেটাকে শুধু তোমাদের হাতে দিয়ে যাব। মানুষ করবে ত ?'

মেজ-বৌকে বাধ্য হইয়া একটু হাসিমুখ দেখাইতে হয়।

কয়েকদিন পরে স্বামীকে ঘরের মধ্যে ডাকিয়া মেজ-বৌ অত্যন্ত গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি বাড়ি দেখছ কি ?'

বিধুভূষণ জিজ্ঞাসা করিল, 'কেন ?'

মেজ-বৌ রাগিয়া উঠিয়া বলিল, 'এখনও কেন জিজ্ঞাসা করছ ? অমল ঠাকুরপোর ত চাকরি গেছে। অন্য খরচ দূরের কথা, দু'বেলা খাবার পয়সা নেই। সমস্ত বাড়ির ভাড়াটা কি একলা গুনবে ?'

বিধুভূষণ চুপ করিয়া রহিল।

মেজ-বৌ হাতের তেলের টিনটা তাহার সামনে সশব্দে নামাইয়া রাখিয়া বলিল, 'আরও বুঝতে চাও ত, এই ত্থাখো। মাসের সবে সাত দিন, এক টিন তেলের সিকি ভাগও খরচ করিনি। আর ত্থাখো দেখি তেল একেবারে তলায় গিয়ে ঠেকেছে !'

বিধুভূষণ বিস্মিত হইয়া চাহিয়া দেখিল। মেজ-বৌ বলিল, 'অত যার দেমাক, তার এত হীন প্রবৃত্তি হবে আমি সত্যি ভাবতে পারিনি। ছি ছি ! এ নিয়ে আমি ঝগড়া করতে পারবনা বাপু, তুমি বাড়ি দেখবে কিনা বলো ?'

'দেখছি'—বলিয়া বিধুভূষণ চলিয়া গেল।

সামান্য সামান্য জিনিসপত্র চুরি তাহার পর চলিতেই থাকে। মেজ-বৌ বাধ্য হইয়া রান্নাঘরে তালা লাগায়। কাননদের অভাব সে বোঝে; কিন্তু সামনা-সামনি চাহিতে যাহার অহঙ্কারে আঘাত লাগে গোপনে তাহার চুরি করিতে বাধেনা দেখিয়া, তাহার কাননের উপর ঘৃণার আর অবধি থাকে না। এক হিসাবে কাননের এই পরাজয়ে তাহার উল্লসিত হইবার কথা, কিন্তু শুধু অমলের আর ছেলেটার কথা ভাবিয়া কাননের এই দর্প চূর্ণ হওয়াতেও কেন বলা যায় না সে সুখী হইতে পারে না।

অমল সারাদিন বৃথা চাকরির চেষ্টায় ঘুরিয়া শুষ্ক মুখে রাত্রে বাড়ি ফেরে, কিন্তু মুখে তাহার তবু হাসি মিলাইতে চায় না।

সেদিন সে মেজ-বৌকে ডাকিয়া বলিল, 'আর ভাবনা নেই বৌদি, জান কি হয়েছে জান ?'

তাহার পর মেজ-বৌয়ের নীরবতা লক্ষ্য না করিয়াই বলিয়া চলিল, 'রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে হয়রান হয়ে এক জায়গায় একটু দাঁড়িয়েছি এমন সময় দেখি না আমার পাশ থেকে সতৃষ্ণনয়নে একজন আমার দিকে চেয়ে আছে। সে কি কাতর চাউনি যদি দেখতে বৌদি! না না, ভিখিরী ভেবোনা যেন—গণক ঠাকুর গো, গণক ঠাকুর! রাস্তার ধারে বটতলায় ছাপানো একটা একপয়সার হাত-আঁকা বই পেতে সারাদিন বসে থাকে। দেখে সত্যি দয়া হ'ল। পকেট হাতড়ে দেখি দুটো পয়সা আছে।'

মেজ-বৌ রুটি বেলিতেছিল। তাহার হাত হইতে বেলুনটা কাড়িয়া লইয়া অমল বলিল, 'আহা, রুটি পরে বেলবে'খন, গল্পটাই শোনো আগে। ভাবলাম দুটো পয়সায় না-হয় পানবিড়ি আজ নাই খেলাম, এ বেটার চিঁড়ে-গুড় ত হবে। তার সামনে গিয়ে দিলাম তারপর হাতটা বাড়িয়ে। কি তার আহ্লাদ যদি দেখতে বৌদি! হাতটা নিয়ে কি করবে সে যেন ভেবেই পায় না। তারপর কি বললে জান?'

মেজ-বৌ নিজের অজ্ঞাতে কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি বললে?'

মুখের এক অপরূপ ভঙ্গী করিয়া অমল বলিল, 'এই সামনে আষাঢ় মাস আসছে না? তার পনেরোই-টি পেরুতে দাও। তারপর আমিই বা কে, আর গাইকওয়াড় অফ্ বরোদাই বা কে? একটা অত্যন্ত ফুচকে কুকুটে গ্রহ—নামটা ভুলে গেছি বৌদি—বেটার আকাশে বোধ হয় কোনো কাজ নেই, তাই আমার পেছু নিয়ে এইসব বিপদ ঘটিয়েছে। কিন্তু এত অবিচার সইবে কেন! আষাঢ়ের পনেরোই গেলেই বাছাধন একেবারে কাবু হয়ে যাবেন। তারপর যাতে হাত দেব তাতেই সোনা ফলবে। মিছে কথা নয় বৌদি, গনৎকার এমনি ক'রে পৈতেটি বার ক'রে ধরে আমার হাতে হাত দিয়ে বলেছে—রাস্তায় ধারে বসে ব'লে তাকে হেলাফেলা যেন না করি, কত বড় বড় রাজার বাড়ি তার পায়ের ধুলো পাবার জন্য ব্যাকুল। সুতরাং আমার ভাগ্য ফিরবেই; আর তখন যেন এসে আমি তার সঙ্গে দেখা করে যাই।'

একটু থামিয়া অমল বলিল, 'তাকে একটি ভালো করে নমস্কার করে বললাম,—ঠাকুর, তোমার গণনায় আমার অটল বিশ্বাস। আজ এই দু'পয়সা আমার বিশ্বাস; তারপর আমার হাতে প্রথম যে সোনা ফলবে, মুটিমুদ্ধ এনে তোমার কাছে নামিয়ে দেব—এই কথা রইল। লোকটা কিন্তু যেরকম ভাবে

আমার দিকে চাহিল, বৌদি—তাতে সে আমাকে, না, তার গণনাকে অবিশ্বাস করলে ঠিক বুঝতে পারলাম না!'

অমলের উচ্চহাসিতে মেজ-বৌও এবার যোগ দিল। এ বাড়ির ভিতরকার গুমোট তাহাদের হাসিতে কিছুক্ষণের জন্য যেন কাটিয়া গেল মনে হইল। কিন্তু সে আর কতক্ষণ!

বিধুভূষণ বাড়ি দেখিয়াছে। কয়েকদিনের ভিতর তাহারা উঠিয়া যাইবে তাহাও ঠিক হইয়াছে। ইহার ভিতর হঠাৎ একদিন অমলের সংসারের সত্যকার অবস্থা উপলব্ধি করিয়া মেজ-বৌ একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহাদের দুরবস্থা হওয়া আশ্চর্য নয়, গত কয়েকদিন বাসনওয়ালার কাছে বাসনকোসন বিক্রয় করিয়া তাহাদের চলিতেছে এ-কথাও সে জানে, কিন্তু সংসার তাহাদের এরই মধ্যে এতদূর অচল হইয়াছে সে ভাবে নাই।

ছেলেটা আজকাল তাহার নিরবচ্ছিন্ন ঔদাসীন্য দেখিয়া কিংবা কি ভাবিয়া বলা যায় না, কাছে বড়-একটা ঘেঁষে না। তবুও সেদিন সকাল হইতে তাহার রান্নাঘরের দরজা দিয়া কাতর নয়নে বার-দশেক সে ঘুরিয়া গিয়াছে, মেজ-বৌ জানে। গোপন ইচ্ছা হাজার থাকিলেও মেজ-বৌ তাহাকে ডাকিতে সাহস করে নাই।

এইবার রান্নাঘর হইতে সে শুনিতে পাইল ছেলেটা কাঁদিতেছে। সকাল হইতে লুচি খাইবে বলিয়া বায়না ধরিয়াছে। তাহার বদলে তাহাকে মুড়ি দেওয়া হইয়াছে, সে তাহা খাইতে চায় না।

অন্যদিনও সে এমনি করিয়া বায়না ধরে কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই ভুলিয়া যায়। আজ কিন্তু কেন বলা যায় না, তাহার কান্না আর কিছুতেই থামিতে চাহিল না। কানন ও পিসিমা তাহাকে ভুলাইবার নানা চেষ্টা করিয়া অবশেষে হার মানিয়াছে। তাহার পর কানন রাগিয়া পিঠে তাহার এক-ঘা চড় বসাইয়া দিল। ছেলেটার কান্না আরও প্রচণ্ড হইয়া উঠিল।

রান্নাঘরে বসিয়া কাজ করিতে করিতে মেজ-বৌ সবটাই শুনিতে পাইতেছিল। নিজের অহঙ্কার বিসর্জন দিয়া একবার তাহার ইচ্ছা হইল ছেলেটাকে ধরিয়া তুলিয়া লইয়া আসে, কিন্তু পিসিমার সেদিনের শেষকথাটা সে কিছুতেই ভুলিতে

● [illegible] ●

পারে নাই। মেয়েমানুষের অতিবড় বেদনার স্থানে আঘাত করিয়া আঘাত যাহারা দিয়াছে, তাহাদের কাছে কেমন করিয়া আর ছোট হওয়া যায়?

তাহার রান্নাঘরের পাশেই কাননদের শোবার ঘর—সেখান হইতে পিসিমার উচ্চকণ্ঠ আজ স্পষ্টই শোনা যাইতেছিল। আজ আর তাহার কিছু গোপন রাখিবার প্রয়াস নাই।

কানন বলিল, 'তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ছি পিসিমা, চুপ করো না! মান-সম্ভ্রম কিছু কি থাকতে দেবে না?'

পিসিমা উচ্চ স্বরে বলিলেন, 'কি আমার নবাবের বৌ গো, তার আবার মান-সম্ভ্রম! আমি হ'লে আধপেটা খেয়ে, উপোস করে দিন কাটাই। দশটি টাকা সম্বল। তা সব ভেঁকেমুখে খেয়ে আবার বলে মান-সম্ভ্রম! নবাবের বেটী আবার বলে, লুচি খাব! চাল বিনে আজ হাঁড়ি চড়বেনা যে রে হতভাগা! লুচি খাবি কি, তোর বাবা যে একমাসে একটা পয়সা ঠেকাতে পারেনি—সব যে এই বুড়ীর ঘাড় দিয়ে চলেছে!'

মেজ-বৌ আর শুনিতে পারিল না। রান্নাঘরের দরজাটা ভেজাইয়া ধীরে ধীরে নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

কিন্তু সেখানে গিয়াও নিস্তার নাই। পিসিমার কণ্ঠস্বর ও খোকার কান্না সেখানেও সমানে পৌঁছায়।

মেজ-বৌ উঠিয়া পড়িল এবং কিয়ৎক্ষণ বাদে কাননদের দরজায় গিয়া ডাকিল, 'পিসিমা!'

পিসিমা বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া তাহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তাঁহার মুখে কথা সরিল না। হাতের থালাটা আগাইয়া দিয়া মেজ-বৌ বলিল, 'আর-মাসে একদিন দু'-মুনুকে চাল ধার করেছিলাম তাই দিতে এলাম।'

থালায় উপরকার চাল কিন্তু দু'-মুনুকের কিছু বেশী বলিয়াই মনে হইল এবং তাহার সহিত অন্যান্য যে-সমস্ত জিনিসপত্র দেওয়া গেল সেগুলাও সম্ভবতঃ দু'-মুনুকে চালের মূল্য নয়।

পিসিমা বিমূঢ় হইয়া তেমনি বসিয়া রহিলেন। শুধু কানন পিসিমার দিকে ফিরিয়া বলিল, 'ধার ও আমরা কই দিইনি, পিসিমা;—তা ছাড়া দিলেও আমরা চাল ফেরত নিই না।'

এবার পিসিমার চমক ভাঙিল এবং আজ কামনের গভ অবলম্বনের কোনো

উৎসাহ দেখা গেল না। অত্যন্ত রূঢ়ভাবে তাহাকে ধমকাইয়া তিনি বলিলেন, 'থাক্ বৌমা, তোমার অত সাউখুড়ি করতে ত কেউ ডাকেনি!'

'দাও মা, দাও—' বলিয়া তিনি নিজেই সাগ্রহে হাত বাড়াইয়া থালাটা নামাইয়া লইলেন।

*

* *

অনেক রাতে সকল কাজ সারিয়া মেজ-বৌ ঘরে ঢুকিয়া দরজা দিল।

বিধুভূষণ অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার হাতে কি?'

মেজ-বৌ সংক্ষেপে বলিল, 'কিছু না। রান্নাঘরের তালা।'

বিধুভূষণ অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তালা দিয়ে এলে না?'

মেজ-বৌ অকারণে রাগিয়া উঠিয়া বলিল, 'জানিনা বাপু! দেখছ ত দিয়ে আসিনি।'

তাহার পর নিজের মনেই গজগজ করিয়া বলিল, 'ঢের ঢের মেয়ে দেখেছি বাপু, এমন নজ্জার মেয়ে হয় জানতাম না। দেমাকে এদিকে মাটিতে পা পড়ে না, অথচ চুরি করতে বাধে না।'

এসব অসংলগ্ন কথার কোনো অর্থ খুঁজিয়া না পাইয়া বিধুভূষণ জিজ্ঞাসুভাবে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

মেজ-বৌ তাহার সামনে আসিয়া হাত নাড়িয়া বলিল, 'কি করব বলো? সামনা-সামনি দিতে গেলে ত নেবেন না। নবাবের বেটীর যে তাতে মান যায়! তা ব'লে ওই দুধের ছেলেটা উপোস করে মরবে!'

বিধুভূষণ খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'তাহ'লে বাড়ি-বদল আর দরকার নেই?'

মেজ-বৌ উচ্চস্বরে বলিল, 'দরকার নেই কিরকম! অমল ঠাকুরপোর একটা চাকরি হোক না, তার পর এই ছোটলোকদের সঙ্গে আমি আর একদিনও থাকব ভেবেছ!'

চুক্তি

প্যারিমোহনবাবু আবার মোড়ের পানের দোকানটায় ফিরে চললেন। সকাল থেকে হাঁটাহাঁটি বড় বেশী হয়েছে, কোমরের ব্যথাটাও বেড়েছে। জলকাদার ভেতর এতখানি রাস্তা আবার ফিরে যেতে অত্যন্ত কষ্টই হবে, তবু না গিয়ে তাঁর উপায় নেই। একবার অবশ্য মনে হয়েছিল, পয়সা-দুটো রাস্তার কোনো গরীব ভিখিরীকে দিয়ে দিলেই হাঙ্গাম চুকে যায়। কিন্তু বিবেকের দংশন তাতে শান্ত হয় না। এ দু'পয়সা দান করার অধিকার ত তাঁর নেই। দোকানদার পয়সা ফেরত দেবার সময় ভালো করে না গুনেই পকেটে রেখেছিলেন। এইমাত্র বিড়ি বার করতে গিয়ে পয়সাগুলোর হিসেব করে তার ভুল ধরতে পেরেছেন।

দোকানদার অবশ্য প্যারিমোহনবাবুকে চিনতেই পারল না। প্যারিমোহন-বাবুকেই বুঝিয়ে দিতে হ'ল যে, খানিক আগে তিনি তার দোকান থেকে দু'পয়সার বিড়ি কিনেছেন, এবং সে বিড়ির দাম দেবার জন্যে যে দোআনিটি দিয়েছেন দোকানদার তার ভাঙানি ফেরত দিতে ভুল করেছে।

ভুল শুনেই দোকানদারের মেজাজ গরম হয়ে উঠল। খেঁকিয়ে উঠে বললে, 'ক্যা ভুল হুয়া? দো পয়সাকে বিড়ি লেকে দো ঘণ্টা বাদ ভুল দেখানে আয়া!'

অত্যন্ত অপমানিত বোধ করলেও প্যারিমোহনবাবুকে এবার ধৈর্য ধরে বুঝিয়ে দিতে হ'ল যে, তিনি দোকানদারের কাছে কিছু দাবি করতে আসেন নি, এসেছেন যে দু'পয়সা সে ভুল করে বেশী দিয়েছিল তাই ফেরত দিতে।

দোকানদারের উগ্রভাটা একটু শান্ত হ'ল কিন্তু কণ্ঠস্বর বিশেষ মোলায়েম হয়েছে মনে হ'ল না। কাঁচাপাকা খোঁচা খোঁচা দাড়ি-ওঠা, মাথার মাঝখানে অত্যন্ত বেমানান ভাবে টাক-পড়া, ছেঁড়া কোট, তালি-দেওয়া কাপড় পরনে, ভাঙা ছাতি হাতে এই মাঝবয়সী মানুষটিকে অদ্ভুত কোনো জীববিশেষ হিসেবেই একটুখানি লক্ষ্য করে দোকানদার তাচ্ছিল্যভরে বললে, 'তব্ দিজিয়ে।'

প্যারিমোহনবাবু পয়সা দুটো তার হাতে দিতে নিতান্ত অবহেলাভরে একটা টিনের কৌটায় সেটা ফেলে সে আবার জাল-বসানো আওনটার ওপর বিড়ির

হাতিলগুলো সেঁকবার জন্ত সাজাতে লাগল। প্যারিমোহনবাবুর দিকে তার আর ভ্রূক্ষেপ নেই।

প্যারিমোহনবাবু আবার বাড়ি যাবার পথ ধরলেন। আপনা থেকে পয়সা ফেরত দিতে হ'লে দোকানদারের যে করুণা-মিশ্রিত অবজ্ঞাটুকু পেলেন তাতে আহত না হবার মতো অসাড় এখনও তিনি হননি, কিন্তু তবু এ ধরনের অবজ্ঞা অনেকটা এখন সয়ে গেছে। সাধারণতঃ মানুষের কাছে অবজ্ঞাই এখন তিনি পেয়ে থাকেন, সে অবজ্ঞা করুণা বা সদয় সহানুভূতির আবরণে বরং আরো তিক্তই লাগে।

আজ রাখাল দফাদারের গদিতে যেমন হয়েছে। রাখাল তাঁহার বহু পুরাতন ছাত্র। যৌবনে শিক্ষাদানের সুমহৎ আদর্শ সামনে রেখে যখন প্রথম স্কুল-মাস্টারিতে ঢুকেছিলেন, তখন গোড়ায় পাঁচ-ছয় বছরে যে-সব ছাত্র তাঁর হাত দিয়ে পার হয়েছে রাখাল তাদের মধ্যে একজন। ছাত্র হিসেবে মোটেই ভালো ছিল না, তার ওপর শয়তানী বুদ্ধিতে ছিল পাকা। ক্লাসে পাঁচটা হোম-টাস্কের বদলে দুটো অঙ্কই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লিখে পাঁচটা বলে চালাবার চেষ্টা, পরীক্ষায় লুকিয়ে বই নিয়ে গিয়ে বা পরের খাতা দেখে টোকবার বদমায়েসির জন্তে প্যারিমোহনবাবুর কাছে অনেক বকুনি, ধমক, কানমলা, চড় সে খেয়েছে। প্যারিমোহনবাবু চিরকাল অত্যন্ত সিধে, কড়া মাস্টার বলে পরিচিত। ছেলেদের পড়াবার জন্তে তিনি চিরদিন প্রাণপাত করে এসেছেন—কিন্তু তাঁর কাছে কোনো ফাঁকি-মিথ্যার এতটুকু প্রশ্রয় নেই। অন্যায় দেখলে তিনি বজ্রের মতো কঠিন। প্যারিমোহনবাবুকে হাত করবার জন্তে কিনা বলা যায় না, রাখাল বাড়িতে ব'লে বুঝিয়ে তাঁকে তার বাড়ির মাস্টার হিসেবে রাখার ব্যবস্থা করেছে। তারই দরুন বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষার বেড়া সে কোনরকমে টপ্‌কে পার হয়েছে বটে, কিন্তু আর কিছু সুবিধা পায়নি। প্যারিবাবুকে ফাঁকি দিয়ে ভোলা যায় না।

রাখালের প্যারিবাবুর প্রতি অনুরাগ বা শ্রদ্ধা না থাক, কৃতজ্ঞতাটুকু ছিল। পরবর্তী জীবনে নিজের ছেলেদের পড়াবার ভার সে আপনা থেকে ডেকে পাঠিয়ে প্যারিবাবুর ওপরই ছেড়ে দিয়েছে। রাখালের ছেলে প্যারিবাবুর স্কুলে পড়ে না, প্যারিবাবুর স্কুলকে কানা ক'রে দু'-খানেক পথ দূরে কলকাতার ওপর যে নতুন শৌখিন বড়লোকদের ছেলেদের অনেক বেশী মাইনের স্কুল নিয়মিত হ'য়ে হয়েছে, তার সে ছাত্র। তবু রাখাল প্যারিবাবুকে বাড়ির জন্যে ডেকে পাঠিয়ে রাখে,

'আপনার হাতে পড়েও আমি ত আর মানুষ হলাম না, দেখুন আমার ছেলেটাকে যদি পারেন।' রাখাল তখন থেকেই ওইরকম আধা মুরুব্বিয়ানা, আধা সম্মানের সুরে কথা বলে।

প্যারিবাবু সে সময়ে কাজটা পেয়ে অবশ্য বেঁচে গিয়েছিলেন। তাঁর দৈন্যদশা তখন থেকেই সুরু হয়েছে। পাড়ায় শৌখিন নতুন স্কুলটি হওয়ার দরুন তাঁদের স্কুলের অবস্থা অত্যন্ত কাহিল। নতুন স্কুলের প্রকাণ্ড জমকালো বাড়ি, তার ধরন-ধারণ চালচলন সবই উঁচু দরের। তাঁদের ভাঙা পুরোনো একতলা বাড়ির সেকেলে স্কুলে নেহাত নিরুপায় না হয়ে কেউ আর ছেলে পাঠায় না। স্কুল উঠে যাবার সম্ভাবনার ভয় দেখিয়ে সেক্রেটারি-মশাই সব শিক্ষকেরই মাইনে কমিয়ে দিয়েছেন। ওদিকে দিনকাল তখন থেকেই খারাপ। ছেলেমেয়ে নিয়ে প্যারিবাবুর সংসারও তখন বেশ বৃহৎ হয়ে উঠেছে। ছোট-বড় সাতটি মানুষের দু'বেলার অন্ন প্রতিদিন যোগাতে হয়।

রাখালের ছেলেও যথাসময়ে এই সেদিনই স্কুলের গণ্ডী পার হয়ে গেছে। তারই কিছু আগে পৃথিবীময় যুদ্ধ বেধেছে ও প্যারিবাবুর দুর্দশা চরম সীমায় গিয়ে পৌঁছেছে। টিউশনি ও মাস্টারির আয়ে আগে কোনরকমে লজ্জা-নিবারণ করে শাক-ভাতের সংস্থান হত। লজ্জা-নিবারণ দূরের কথা, বাড়িভাড়া দিয়ে এখন তাতে ভাতের ওপর শাকটুকুর ব্যবস্থা করতেই কুলোয় না।

প্যারিবাবু অনেক ইতস্ততঃ করে, নিজের মনের সঙ্গে অনেক বোঝাপড়ার পর আজ একটি বিশেষ আরজি নিয়েই রাখালের কাছে গিয়েছিলেন। রাখাল এখন মস্ত ব্যবসাদার। তার ইট-সুরকির পৈতৃক কারবার যুদ্ধের বাজারের মিলিটারী কন্‌ট্র্যাক্টের দৌলতে রাতারাতি ফেঁপে উঠেছে। দশ-বিশটা লরি সারাক্ষণ তার আড়তে আসছে যাচ্ছে, নদীর ঘাটে টালি-বালির ভরা দাঁড়াবার জায়গা পাচ্ছে না।

দাঁড়াবার জায়গা তার গদিতেও নেই। বাড়িতে গিয়ে দেখা পাওয়া দুষ্কর বলে প্যারিবাবু রাখালের গদিতেই এসেছিলেন সকালবেলা। ইট-সুরকির ব্যবসা হলে কি হয়, রাখালের গদিতে এখন সাহেবী ব্যবস্থা। বাইরে সাবেকী কায়দায় খাতাপত্র বাক্স নিয়ে তার সরকার ইত্যাদি বসে, বাছাই-করা ধনী খদ্দেরদের খাতির করবার জন্যে রাখালের ভেতরে আলাদা হাল-ফ্যাশনের অফিস-ঘর। খবর না পাঠিয়ে সেখানে ঢোকা যায় না।

প্যারিবাবু অনেকক্ষণ ধরে ভেতরে খবর দেবার চেষ্টা করেছেন, কেউ তাঁকে গ্রাহ্য করেনি। অবশেষে বিরক্ত হয়ে একজন সরকার বলেছে, 'বলুন মশাই, কি বলতে হবে দিয়ে? দেখছেন কিরকম কাজের ভিড়, নিশ্বাস ফেলবার কারু ফুরসত নেই। এর ভেতর যত বাজে ফাই-ফরমাস। কাজ কারবার ছাড়া যদি দেখা করতে চান ত বাবুর বাড়ি গেলেই পারেন। এটা ত বৈঠকখানা নয়, ব্যবসার জায়গা!'

প্যারিবাবু শান্ত ভাবে বলেছেন, 'বাড়ি গিয়ে দেখা হয়নি বলেই এখানে এসেছি। আপনি শুধু একটু গিয়ে খবর দিন যে প্যারিবাবু এসেছেন। যদি তাঁর দেখা করবার সময় না থাকে আমি চলে যাব।'

প্যারিবাবুর দিকে একবার ভ্রূকুটি করে সরকার ভেতরে গেল খবর দিতে।

খবর পেয়ে কিন্তু রাখাল যেভাবে নিজে বেরিয়ে এসে অভ্যর্থনা করেছে তাতে আর কেউ হ'লে বেশ একটু গর্বই বোধ করত। —'আরে, মাস্টারমশাই যে! আপনি এসে এখানে দাঁড়িয়ে আছেন, কি লজ্জার কথা! আপনার আবার খবর দেওয়া-দেওয়ি কি! সটান অফিসে চলে আসবেন। আসুন আসুন।'

কাটা দরজাটা সে নিজেই ফাঁক করে ধরেছে মাস্টারমশাইএর যাওয়ার সুবিধে করে দেবার জন্যে।

প্যারিবাবু ছাতাটি হাতে নিয়ে ভেতরে ঢুকেছেন। অফিস-ঘরের মেঝেতে কার্পেট পাতা। প্যারিবাবুর কাছে সেটা অত্যন্ত দামী মনে হয়েছে। কাদামাখা ছেঁড়া জুতোয় সে কার্পেট মাড়িয়ে মোটা গদি আঁটা ঝকঝকে চেয়ারে তাঁর ময়লা ছেঁড়া পোশাক নিয়ে গিয়ে বেশ একটু সঙ্কোচই তাঁর হয়েছে। ঘরে আরো একজন আছে তিনি ভাবেননি। ফিটফাট সাহেবী পোশাক পরা, এই সব আসবাব-পত্রের সঙ্গে মানানসই এক ভদ্রলোক। তাঁর সঙ্গে নিজের পরিচ্ছদটা তুলনা করেই প্যারিবাবুর সঙ্কোচ হয়েছে বেশী। কিন্তু এ সঙ্কোচ ত ক্ষণিকের। এ সঙ্কোচকে আমল দিলে আজকের দিনে পথেঘাটে লোকসমাজে তাঁর বেরুনই বন্ধ করতে হয়। প্যারিবাবু তাই মন থেকে এটা সরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু রাখালই তার বদান্যতার আতিশয্যে বাধ সেধেছে। সগর্বে বেশ একটু অনুকম্পা-মিশ্রিত সম্মানের সঙ্গে ঘরের অপর ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বলেছে, 'তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই, সেন—আমার মাস্টারমশাই—ছেলেবেলার

আমায় পড়িয়েছেন,—পড়িয়েছেন মানে, গাধা পিটে মানুষ করেছেন আর কি!' —নিজের উদারতা ও বিনয়ে নিজে মুগ্ধ হয়ে রাখাল হেসেছে।

সেন, কলের পুতুলের মতো কেতাদুরস্ত ভাবে অ্যাথলিটিক সরলরেখায় ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ার ছেড়ে একটু ওঠবার ভঙ্গি করে হাতদুটো গলা পর্যন্ত তুলেছে—প্যারিবাবুও নমস্কার করেছেন। মাথা না নেড়ে কি করে শুধু চোখের তারা ওঠানামায় কৌশলে কারুর আপাদমস্তক সমালোচনা করা যায়, সেনের দৃষ্টি থেকে প্যারিবাবু প্রথম বুঝতে পেরেছেন। রাখাল তখন সোৎসাহে বলে চলেছে, 'ওঁর এই চেহারা দেখে ভাবতেই পারবেন না, কী ভয়টা ওঁকে আমরা করতাম! ঠিক বাঘের মতো। চড়-চাপড় কানমলা কত যে খেয়েছি!'

দাঁত না বার করে শুধু ঠোঁটদুটো একটু বিস্তৃত করে কি করে দায়-সারা হাসি হাসা যায়, সেনের মুখ দেখে প্যারিবাবু এবার শিখেছেন। এবার তাঁর সত্যিই অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ হয়েছে। কোনরকমে দরকারী কথাটা সেরে ফেলে যেতে পারলে তিনি বাঁচেন। বলেছেন, 'তোমার সময় নষ্ট করতে চাই না, রাখাল, আমার শুধু একটা কথা ছিল—'

রাখাল বাধা দিয়ে বলেছে, 'আরে বসুন বসুন, মাস্টারমশাই। গদিতে পায়ের ধুলো যখন দিয়েছেন তখন অমনি কি আর ছাড়ি?'

ছাড়তে সে সত্যিই চায় না। নেহাত কবে কোন্ যুগে ছেলেবেলায় পড়িয়েছেন বলে জীবন-যুদ্ধের এমন পরাস্ত সংবেদনশীল সৈনিককে মনে রেখে খাতির দেখানর মধ্যে যে কতখানি উদারতা ও মহত্ব আছে, তা বোঝাবার এমন সুযোগ সে ছাড়তে পারে! তার অবস্থায় আর কেউ হ'লে এমন চেহারা ও পোশাকের কোনো লোককে আমলই যে দিত না, আর সে যে সেই লোকটিকে রীতিমতো সশ্রদ্ধভাবে আপ্যায়িত করেছে—এমন একটা বাহাদুরি নেবার সুবিধে প্রতিদিন ত হয় না। পান সিগারেট আনিয়ে নানা ভাবে খাতির করে সে প্যারিবাবুকে ব্যতিব্যস্তই করে তুলেছে। খানিক বাদে বলেছে, 'আপনার চেহারা কিন্তু বড় খারাপ হয়ে গেছে মাস্টারমশাই, কী কষ্টটাই না আপনার গাযে ছিল তখন ত দেখেছি। আর চেহারা খারাপ হবে নাই বা কেন! বুঝেছ সেন, আজকালকার দিনে যে যা পারে লুটে নিচ্ছে, সবাই আঙুল ফুলে কলাগাছ, শুধু বেচারা মাস্টারদেরই কপাল পুড়ে ছাই হয়েছে। সব কিছুর দর অমন তিনগুণ-চারগুণ চড়া, কিন্তু এঁদের মাইনে কবেছে বই বাড়েনি। কি করে তাতে চলে, বলতে পার?'

একটু থেমে অনুকম্পার আতিশয্যে প্যারিবাবুকে রাখাল হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেছে, 'আচ্ছা, স্কুলে এখন কত মাইনে পান, মাস্টারমশাই ?'

প্যারিবাবু অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করেছেন—পিন্‌-ফোটানো পোকাকে যেন অণুবীক্ষণের কাচের তলায় ধরা হয়েছে। তবু বাধ্য হয়ে বলেছেন, 'ষাট টাকা পাই।'

'ষাট টাকা! তাও ত আপনি বেশী পান। এই ষাটের ওপর টিউশনি ইত্যাদি সব মিলিয়ে ধরলুম একশো টাকা আয়। ভেবে ছাখো, সেন। একশো টাকায় একটা মানুষের আজকাল চলে না, একটা গোটা সংসার! একটা রিক্‌শাওয়ালা দিন আজকাল কত রোজগার করে জান ত? অন্ততঃ চার টাকা। তবু তাদের লোক-লৌকিকতা নেই, ভদ্র সেজে থাকবার দায় নেই—'

সেন এবার বোধহয় এই একঘেয়ে আলোচনা আর সহ্য করতে না পেরেই বিদায় নিয়েছে। রাখাল, শ্রোতা ও দর্শকের অভাবে একটু নিরুৎসাহ হয়ে প'ড়ে, জিজ্ঞাসা করেছে, 'তার পর বলুন মাস্টারমশাই, কি জন্যে পায়ের ধুলো দিয়েছেন—'

প্যারিবাবু সমস্ত সঙ্কোচ কোনরকমে জয় করে কথাগুলো বলেছেন। রাখালের ছেলে এখন আর স্কুলে পড়ে না, তবু তার অঙ্কের টিউশনিটা প্যারিবাবুকে দিলে তিনি করতে পারেন। আর কিছু না হোক কলেজের অঙ্ক শেখাবার মতো বিদ্যা তাঁর আছে, রাখাল ত জানে। রাখাল ছেলেকে পড়াবার বিশেষ বিশেষ বিষয়ের জন্যে আলাদা টিউটর রাখবার ব্যবস্থা করেছে জেনেই কথাটা তাঁর মনে হয়েছে।

রাখাল বেশ একটু গর্বের সঙ্গে বলেছে, 'না রেখে আর কি করি বলুন, আমারই ত ছেলে! নিজের মুরোদ যে ওর কত, তা ত আমার জানতে বাকি নেই। এই দেখুন না—একজন ইংরেজির, একজন লজিকের ত এর মধ্যেই এসে জুটেছেন, অঙ্কেরও একজন না রাখলে নয়!'

প্যারিবাবু আশান্বিত হয়ে বলেছেন, 'সেইজন্যেই তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।'

'তা বেশ করেছেন। আপনি হ'লে ত ভালোই হয়।' রাখাল হঠাৎ যেন একটু চিন্তিত ভাবে বলেছে, 'তবে কি জানেন, স্কুল থেকে কলেজে ঢুকলেই ছেলেদের মাথাগুলো একটু গরম হয়ে যায় কিনা! স্কুলের মাস্টারদের তখন মনে করে— ওই কি বলে "ওল্ড ফসিল্‌স্‌", কলেজের প্রফেসারের কাছে না পড়লে মানুষের জাত

মান থাকে না। আচ্ছা, তবু আমি বুঝিয়ে বলে দেখব'খন। আপনি বরং খোঁজ নেবেন এর মধ্যে একদিন।'

প্যারিবাবু আর কিছু না বলে উঠে পড়েছেন এবার। তাঁর মতো অবস্থা হ'লে আর কেউ বোধ হয় আর একবার পেড়াপীড়ি করত, কিন্তু তাঁর দ্বারা তা সম্ভব নয়।

রাখালও তাঁর সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে হঠাৎ আবার সহৃদয়তায় গলে গিয়ে বলেছে, 'আমি বলি কি, মাস্টারমশাই, এ লাইনটাই ছেড়ে দিতে পারেন না? সারাজীবন মাস্টারি করে ত দেখলেন, জাতও গেল পেটও ভরল না। আমাদেরই শশাঙ্কবাবু, স্কুল ছেড়ে চোরাবাজারে ঢুকে কিরকম কেঁপে উঠেছেন জানেন ত! পুকুরকে পুকুর চুরি করে মেরে দিচ্ছেন। মাস্টারি নিয়ে পড়ে থাকলে কি আর হত! উপোস করে দিন যেত ত! আপনি যদি রাজী থাকেন ত বলুন, আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। এই সেদিনই একজন লোক দরকার বলছিল, কেয়াতলা না কোথায় ওর বাইরের কাজ দেখবার জন্যে। একটু সুবিধে মাফিক চোখদুটো বুজিয়ে রেখে হাত বাড়াতে পারলে দেখবেন, হাত মুঠো করতে পারছেন না—লক্ষ্মী হাত উপচে পড়ছে।'

প্যারিবাবুকে চুপ করে থাকতে দেখে একটু হেসে রাখাল আবার নিজে থেকেই বলেছে, 'আপনার কি মনে হচ্ছে, বেশ বুঝতে পারছি। কান দুটো আমার মলে দিয়ে আবার বেঞ্চির ওপর দাঁড় করিয়ে দিতে ইচ্ছে হচ্ছে, কেমন না? কি বলব বলুন, এই রোগেই ত আপনারা মারা যাচ্ছেন! শয়তানের রাজ্যে টিঁকে থাকতে হ'লে শয়তানি না করে উপায় নেই—এই সোজা কথাটা আপনারা কিছুতেই বুঝবেন না!'

প্যারিবাবু গম্ভীর ভাবে বলেছেন, 'আমি তাহ'লে আসছে রবিবার আসব।'

'বেশ, তাই আসবেন।' বলে রাখাল তাঁকে এবারেও দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে সসম্মানে নমস্কার করে বিদায় দিয়েছে।

প্যারিবাবু ক্লান্তদেহে যখন বাড়ি ঢুকলেন তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে। অনেকখানি রাস্তা হেঁটে যেতে হবে ব'লে সকালবেলা কিছু মুখে না দিয়েই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়েছিলেন। ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসে ইচ্ছে ছিল একটু চা খাবার। কিন্তু রবিবার বলে উনুনে এখনো আঁচ পড়েনি। কপালের যা দায়, তাতে বুঝেশুনে উনুন ধরাতে হয়। দু'বেলা উনুন ধরাবার দরকারই থাকেনা

অনেকদিন দু'বেলার জিনিসের অভাবে। অভাব যেদিন থাকে না, সেদিনও প্যারি-বাবুর স্ত্রী হেমলতা একবেলার বেশি আগুন জ্বালেন না। দু'বেলা রান্না করার বিলাসিতা করবার মতো অবস্থা তাঁদের অনেক দিন ঘুচে গেছে।

গলির মধ্যে এক অত্যন্ত পুরোনো জীর্ণ দোতলা-বাড়ির নীচের দুটি অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে ঘর প্যারিবাবু আজ বিশ বছর ধরে ভাড়া করে আছেন। বিশ বছরের মধ্যে কোনদিন সে বাড়ির সংস্কার হয়েছে কিনা সন্দেহ। দেয়ালে হাত লাগলে চুনবালি ঝর ঝর করে খসে পড়ে, জানলা-দরজাগুলো এমন নড়বড়ে যে মনে হয় খুলতে, বন্ধ করতেই কোন্‌দিন দেয়াল থেকে আলগা হয়ে আসবে। ঘর দুটির সামনে সঙ্কীর্ণ একটি রকের একদিক দরমা ও চটে ঘিরে রান্নার জায়গা করা হয়েছে, আর একদিকে একটি ভাঙা তক্তপোষ পাতা আছে। সেইটেই প্যারিবাবুর বৈঠকখানা ও সময় পেলে বিশ্রামের জায়গা।

প্যারিবাবু ছাতাটি দেওয়ালের ধারে রেখে ক্লান্ত ভাবে সেই তক্তপোষের ওপর এসে বসেন। হেমলতা রান্নাঘরের পাশে এক বালতি জল দিয়ে বাড়ির ছিন্ন ময়লা কাপড়-চোপড় সাবান দিয়ে যথাসম্ভব পরিষ্কার করবার চেষ্টা করছেন। স্বামীকে দেখে অভ্যাসের দরুন সাবান-মাখা হাতের কনুই দিয়ে মাথায় শাড়ীর একটা প্রান্ত তুলে দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করে হাঁক দেন, 'অ উমা, তোর বাবাকে রান্নাঘরের পাখাটা দিয়ে যা ত!'

প্যারিবাবু কোঁচার খুঁট দিয়ে মুখ মুছছিলেন। মেজ মেয়ে উমা এসে পাখাটা দেবার সময় তিনি অবাক হয়ে তার দিকে খানিক তাকিয়ে থাকেন। উমা চলে যাবার পর অবাক হবার কারণটা যেন তাঁর হৃদয়ঙ্গম হয়। স্ত্রীকে ডেকে বলেন, 'এদিকে একটু শোনো—'

'কাপড় কাচছি দেখতে পাচ্ছনা! বলোনা ওইখান থেকেই।'

প্যারিবাবু গম্ভীরস্বরে বলেন, 'না, এইখানে শুনে যাও।'

এ গলার স্বর অমান্য করা যায় না। হেমলতা সাবান-মাখা হাতেই উঠে এসে বললেন, 'বলো কি বলছ!'

তীব্র দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে চেয়ে প্যারিবাবু বলেন, 'উমা নতুন একটা শাড়ী পরেছে দেখলাম!'

'হ্যাঁ পরেছে, তা হয়েছে কি! মেয়েদের কি নতুন শাড়ী পরতে নেই?'

'পরতে আছে, কিন্তু শাড়ী এল কোথা থেকে ?'

'কাল ওর জন্মদিন ছিল তাই পেয়েছে।'

প্যারিবাবু কিছুক্ষণের জন্যে স্তম্ভিত হয়েই বুঝি কথা বলতে পারেন না। এ বাড়িতে কারুর জন্মদিন এমন একটা সৌভাগ্য নয় যে, ঘটা করে এপর্যন্ত কোনদিন তা স্মরণ করবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। খানিক বাদে কঠিন স্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'কে দিয়েছে ?'

'পুলিনবাবু দিয়েছে। নাও, হ'ল ত! মেয়ে একটা নতুন শাড়ী পরেছে, তার জবাবদিহি দিতে দিতে জান গেল।' হেমলতা আবার তাঁর কাপড় কাচার জায়গায় ফিরে যান। নিজের মনের কোনো একটা সঙ্কোচ ঢাকবার জন্যেই তাঁর কণ্ঠে যে এই অতিরিক্ত ঝঙ্কার তা কিন্তু বুঝতে বাকি থাকে না।

প্যারিবাবু স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন। পুলিনবাবু শাড়ী দিয়েছে! বছরখানেক আগে তাঁর স্ত্রীই এই পুলিনবাবুর সম্পর্কে কি বলেছিল স্পষ্ট তাঁর মনে আছে। বেশ একটু রাগের সঙ্গেই হেমলতা সেদিন জানিয়েছিলেন, 'হ্যাখো, ওই পুলিনবাবু লোকটির ধরন-ধারণ আমার ভালো লাগছেনা কিন্তু—'

'পুলিনবাবু আবার কে!' প্রথমটা বুঝতে না পেরে প্যারিবাবু জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

'ওই-যে গলির মোড়ের বড় বাড়িটা যাদের—চেন না!'

চিনতে পেরে প্যারিবাবু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'হ্যাঁ, কি করেছে সে ?'

'করেনি কিছু। কিন্তু ওরা হ'ল বড়লোক, আমাদের মতো গরীব-দুঃখীর সঙ্গে অমন গায়ে পড়ে আলাপ করার অত গরজ ওদের কিসের! নেপুর সঙ্গে ভাব করে প্রথম একদিন বাড়িতে এল, তারপর আজকাল যখন-তখন হামেশাই ত আসছে। "কেমন আছেন, মাসিমা", "এই একটু ঘুরে গেলাম, মাসিমা"—আমি যেন ওর কোনোকেলে কেনা মাসিমা!'

'তা মাসিমা বললে দোষটা কি ?'

'দোষটা কি বুঝতে পার না! উমা যে বড় হয়েছে সে খেয়াল আছে? লোকটির স্বভাব-চরিত্র জানতে পাড়ায় ত কারুর বাকি নেই। স্ত্রীকে মেরেধরেই বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছে, না, মনের দুঃখে সে নিজেই বিদেয় হয়ে গিয়েছে কেউ জানে না। আমাদের ওপর অত দরদ ওর কিসের? সেদিন বলে কিনা,

"উমার যা মিষ্টি গলা, আমি ওকে গান শেখাব, মাসিমা!" আমিও বললাম,—আমাদের মতো গরীবের ঘরের মেয়েরা রেঁধে-বেড়ে, বাসন মেজে চুল বাঁধবারই সময় পায় না, গান শিখে তাদের কি হবে। বললে হবে কি, লজ্জা ত নেই, বেহায়ার মতো আবার তবু আসে।'

পুলিনবাবু যে তবু আসে, প্যারিবাবু তা সব সময়ে চোখে না দেখলেও জানেন। কিন্তু উমাকে জন্মদিনের নামে তার শাড়ী দেওয়া পর্যন্ত যে হেমলতার প্রশ্রয় পেতে পারে এতটা তিনি ভাবতে পারেন নি। গোড়ায় গোড়ায় ছেলেমেয়েরা পুলিনবাবুর সঙ্গে বায়স্কোপ-থিয়েটারে যাবার জন্যে তাঁর কাছে অনুমতি চাইতে এসেছে। নিজে থেকে কোনো উৎসব-আনন্দের সুযোগ দেবার ক্ষমতা নেই বলেই তাদের আশাভঙ্গ করতে তিনি পারেন নি। আজকাল অনুমতি নিতে কেউ আসে না। পুলিনবাবুর সঙ্গে যাওয়া বন্ধ হয়েছে বলে নয়, এ বাড়ির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তার এত বেড়েছে যে অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন আর কেউ অনুভব করে না।

প্যারিবাবু সরল ও সত্যাশ্রয়ী বলে নির্বোধ নন। শুধু এতদিন তাঁর দৃষ্টি নিজের দুশ্চিন্তার মধ্যে মগ্ন হয়ে ছিল। এ ঘনিষ্ঠতার আসল চেহারা আজ এই শাড়ীটির সাহায্যে তার সমস্ত জঘন্যতা নিয়ে তাঁর কাছে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এই জীর্ণ বাড়িটার সমস্ত শ্রী ও শালীনতার আবরণ যেমন ধীরে ধীরে খসে যাচ্ছে, তার দুর্বল ইটগুলো যেমন নোনাধরার বিষক্রিয়া ঠেকাতে না পেরে ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছে, দারিদ্র্যে জীর্ণ তাঁর সংসারেও সেই পরিণাম তিনি চোখের ওপর দেখতে পান। অভাবের ছিদ্রপথে কলুষ ও গ্লানি এ সংসারকে ধীরে ধীরে গ্রাস করছে!

অভিভূত স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ একটা গোলমালে তাঁর চমক ভাঙে। বড় ছেলে দেবু সবচেয়ে ছোট নেপুকে কান ধরে বাইরে থেকে নিয়ে এসে হেমলতার কাছে ক্রুদ্ধ স্বরে বলছে, 'শোনো মা, তোমার ছোট ছেলের কীর্তি! উনি চুরি-বিদ্যেতে পর্যন্ত পাকা হয়েছেন। পাশের বাড়িতে বন্ধুর সঙ্গে পড়ার বই আনবার ছুতো করে গিয়ে ঘরের দেরাজের ওপর থেকে—'

হেমলতারই নিঃশব্দ ইঙ্গিতে বাবার উপস্থিতি টের পেয়ে দেবু হঠাৎ চুপ করে যায়। প্যারিবাবুর মাথায় তখন কিন্তু আগুন জ্বলে উঠেছে। পাখাটা হাতে নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে তিনি সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে জিজ্ঞাসা করেন, 'কি চুরি করেছে নেপু?—কি চুরি করেছে?'

তাঁর এমন চেহারা হেমলতা জীবনে কখনও দেখেন নি। তিনি ভয়ে কাঠ হয়ে বসে থাকেন। দেবু ও নেপু দুজনের কারুর মুখ দিয়েই কথা বার হয় না।

'বল্, কি চুরি করেছিস্?' —ব'লে প্যারিবাবু পাখার বাঁটটা তোলেন। কিন্তু নেপুর গায়ে তার আঘাত আর পড়ে না। হাত তুলেও খানিকক্ষণ কেমন অদ্ভুত ভাবে নেপুর দিকে তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে পাখাটা তিনি নামিয়ে নেন। তারপর পাখাটা সেইখানে ফেলে দিয়ে, দেওয়ালে ঠেস-রাখা ছাতাটা হাতে নিয়ে কোনো দিকে না চেয়ে তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান।

পরোপকার

আমাদের বেদ, উপনিষদ্, পুরাণে কেন যে পরোপকারের এত প্রশংসা তা আজ আমি বুঝেছি। সেই যে মাণ্ডুক্য পুরাণে বলেছে, 'ততো···' না, না—'ততো···' নয়, 'ইয়ম্···ইয়ম্···ইয়ম্' কি? যাক্‌গে!

আসল কথা—পরোপকারের চেয়ে বড় ধর্ম আর কিছু নেই। আর এমন বিমল আনন্দ জীবনের আর কিছুতেই কখনও পাওয়া যায়?

আমি অন্ততঃ তা স্বীকার করব না, আর আমার চেয়ে বড় সাক্ষী এ ব্যাপারের কেউ থাকা সম্ভব নয়, কারণ পরোপকারের ফল সদ্য সদ্য আমি প্রত্যক্ষ দেখে আসছি।

হ্যাঁ, সত্যই আমি পরোপকার করেছি শেষ পর্যন্ত এবং করেছি আর কারুর নয়, আমার বাল্যবন্ধু মহিতোষের। অনেকদিন ধরে এটা অবশ্য তার পাওনা ছিল, কারণ ছেলেবেলা থেকে সে বরাবর আমার উপকার করে এসেছে।

নিতান্ত স্বার্থপর নীচ বলেই আমি তার প্রতিদান দেবার কোনো চেষ্টা এপর্যন্ত করিনি। কিন্তু বিবেকের দংশন শেষ পর্যন্ত আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে। আত্মহারা হয়ে আমি তার উপকারের কিছুটা শোধ দিয়েছি।

মহিতোষের মতো পরোপকারী ছেলে অবশ্য পৃথিবীতে খুব কমই দেখা যায়। পরের উপকার করার জন্যেই যেন তার জন্ম। সারাক্ষণ পরের উপকার ছাড়া আর তার কোনো চিন্তা নেই এবং এ মহত্ত্ব ছেলেবেলা থেকেই তার মধ্যে পরিস্ফুট। একই স্কুলে আমরা দুজনে পড়েছি এবং তখন থেকেই তার কাছে যে-সব উপকার পেয়েছি তা কোনদিন ভোলবার নয়। উপকার অবশ্য সে শুধু আমার একারই করত না, তার সামনে পড়লে উপকার না পেয়ে কারুর পার পাবার উপায় ছিল না।

উপকার করা তার চরিত্রের একরকম কণ্ডুয়ন বলা যায়। কাউকে দেখলেই তা চুলকে ওঠে। প্রথম যেদিন স্কুলে ভর্তি হই, সেদিনই তার চরিত্রের এ চর্মরোগের পরিচয় পাই। সবে সেই ক্লাসে এসে অপরিচিত ছেলেদের ভেতর বসেছি। বইপত্র কিছুই সঙ্গে নেই। সংস্কৃতের ঘণ্টায় পণ্ডিতমশাই ক্লাসে এসে ক'টা শব্দরূপ লিখতে হুকুম করলেন। তাঁর চেহারা আর বচন যা শুনলাম তাতে

আমার তখন হৃৎকম্প সুরু হয়ে গেছে। আজ সবে স্কুলে নতুন ভর্তি হয়েছি, এ কথা তাঁকে সাহস করে বলা আমার ক্ষমতায় কুলোবে না। আর নতুন ছেলে হ'লেও বই-খাতাপত্তর না নিয়ে স্কুলে আসা তিনি বরদাস্ত করবেন বলে মনে হ'ল না। যেরকম বিছের কামড়ের মতো তাঁর টিপ্পনীর নমুনা, তাতে হয়ত বলে বসবেন—'এখানে কি তাহ'লে হাওয়া খেতে এসেছ, নবাব-সাহেব! গড়ের মাঠে গেলেই পারতে।'

কি করব ভেবে না পেয়ে চোখে অন্ধকার দেখছি—এমন সময় বেঞ্চির নীচে পায়ে একটা জুতোর ঠোক্কর অনুভব করলাম। নেহাত পণ্ডিতমশাই-এর প্রতাপ তখন বুঝে নিয়েছি, নইলে হয়ত আর্তনাদ করে উঠতাম। উদ্‌গত চীৎকারটা কোনরকমে দাঁতে চেপে পাশের দিকে চেয়ে দেখি, গোলগাল নাদুস-নুদুস একটি ছেলে হায়ার-বেঞ্চের তলায় বাঁ হাতে আমার দিকে একটি খাতা ও পেনসিল এগিয়ে ধরে আছে। তার হস্তী-বিনিন্দিত চোখে সে কি অসীম করুণা! খাতা পেনসিল পেয়ে কৃতজ্ঞতায় একেবারে গলে গেলাম। তখনো জানিনা কৃতজ্ঞতার সেই সবে সুরু। সারাজীবন যার উপকারের ধারা আমার উপর অবিরাম বর্ষিত হবে—তার নাম যে মহিতোষ তাও তখনও জানি না। শব্দরূপ আমার ভালোরকম মুখস্থ। অনেকের আগেই তাই পণ্ডিতমশাই-এর টেবিলের ওপর খাতা রেখে এলাম। সকলের খাতা দেওয়া হয়ে গেলে পণ্ডিতমশাই দেখা সুরু করলেন। খাতা দেখা তো নয়, অস্ত্র-নিক্ষেপ ও তা থেকে আত্মরক্ষার একটা মহড়া। পণ্ডিতমশাই এক-একটি খাতার ওপর একটু চোখ বোলান আর এক-একটি বোলতার হুলের মতো টিপ্পনীর সঙ্গে সেটি লেখকের উদ্দেশে ছুঁড়ে মারেন। মাথা বাঁচিয়ে সে খাতা উদ্ধার করা বেশ কৌশল সাপেক্ষ। পণ্ডিতমশাই-এর টিপ প্রায় অব্যর্থ। এরই মধ্যে খাতা না ছুঁড়ে হঠাৎ যদি কারুর নাম ধরে ডাকা হয় তাহ'লে একটু গর্ববোধ করা বোধ হয় স্বাভাবিক। শব্দরূপটা আমার ভালোই আসে এবং পণ্ডিতমশাই নিশ্চয় তাতে মুগ্ধ হয়েছেন বুঝে একটু বিনয়ের হাসি হেসে কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। পরমুহূর্তে মাথায় একটি কড়া গাঁট্টা খেয়ে সে হাসি মিলিয়ে গেল।—'ওহে, মাইকেল এঞ্জেলো, না নন্দলাল। এটা কি আর্ট-স্কুল? লাল-নীল পেনসিলে চালচিত্তির আঁকা হয়েছে!'

কানমলা সহযোগে আরো কয়েকটা গাঁট্টা খেয়ে খাতা নিয়ে নীরবে বেঞ্চিতে ফিরে এলাম। মহিতোষ আমার লাল-নীল পেনসিলই দিয়েছিল।

ক্লাস শেষ হবার পর টিফিনের ছুটিতে মহিতোষের সে কি আক্ষেপ! পরস্পরের প্রাথমিক পরিচয় তখন হয়ে গেছে। মহিতোষের আফসোস আর থামেনা দেখে আমাকেই তাকে সান্ত্বনা দিতে হ'ল—'তোমার কি দোষ ভাই, তুমি ত ভালো করতেই গেছলে।'

'সত্যি ভাই!'—মহিতোষের কণ্ঠ অত্যন্ত করুণ, 'পণ্ডিতমশাই যে লাল-নীলের ওপর অত খাপ্পা তা কি আমি জানি! আর আমার কাছে তা ছাড়া আর বাড়তি পেনসিল ছিল না।'

'যাক্, কি আর হয়েছে'—বলে একটু এগিয়ে যেতেই মহিতোষ ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'ওকি, খোঁড়াচ্ছ কেন ভাই?'

'ও কিছু নয়'—বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু মহিতোষকে কি অত সহজে ঠকান যায়? তার জুতোর ঠোক্করে পায়ের যে জায়গাটা ছড়ে গিয়েছিল সেটা তাকে না দেখিয়ে ছাড়া পেলাম না।

এবার মহিতোষ একেবারে অস্থির হয়ে উঠল, 'ছিঃ ছিঃ! এত জোরে পা ছুঁড়েছি তা আমি বুঝতেই পারিনি—'

তারপর এদিকে ওদিকে ব্যাকুলভাবে চেয়ে হঠাৎ উল্লসিত হয়ে বললে, দাঁড়াও একটা জিনিস দিচ্ছি, এখুনি ভালো হয়ে যাবে।' খেলার মাঠের ধার থেকে কি-একটা গাছের পাতা ছিঁড়ে এনে তার রস বেশ ভালো করে ছড়া জায়গায় ঘষে দিলে।

সত্যি, ছড়াটা শেষ পর্যন্ত ভালো হয়ে গেল। মাসখানেক বাদে একটু খুঁড়িয়ে হ'লেও আবার স্কুলে যেতে পারলাম। জায়গাটা পেকে উঠেছিল বলে ডাক্তারকে একটু কাটাকাটি করতে হয়েছিল, এই যা। পা'টাই কাটতে হবে ডাক্তার একবার বলেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার দরকার হয়নি। মাঝে মাঝে এখনও একটু খুঁড়িয়ে চলি, এই মাত্র।

স্কুলের পর কলেজ, তার পর জীবনের বিশাল ক্ষেত্র। মহিতোষ এখনো আমার সঙ্গে সঙ্গে না হোক, কাছে-কাছেই আছে। তার উপকার সমানেই পেয়ে আসছি। সে উপাখ্যান বলতে গেলে একটা কুরুক্ষেত্র—মানে, মহাভারত হয়ে যায়।

আমার বিয়ের ব্যাপারেই কি উপকারটা না সে করেছে!

সেদিন হঠাৎ ঘুম থেকে উঠেই দেখি, আমার মেসের ঘরে মহিতোষ

এসে হাজির। মুখখানা তার বড় বেশী গম্ভীর। নীচের রেস্তোরাঁ থেকে চা, টোস্ট, ডবল অমলেট আনিয়ে খাইয়েও তাকে প্রসন্ন করতে পারলাম না। কারণটা জানতে অবশ্য দেরি হ'ল না। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে আমার দিকে ফিরে প্রায় কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললে, 'তুই আমাকে এত পর ভাবিস তা জানতাম না। এত বড় একটা ব্যাপার—তুই আমায় ঘুণাক্ষরে কিছু জানাসনি!'

ব্যাপারটা যে কি তা আমার বুঝতে বাকি নেই। আমতা আমতা করে একটু লজ্জিত হয়েই বললাম, 'মানে, এখনো সব ঠিক হয়নি কিনা। একটা বড় মুশকিল—।' আর কিছু বলবার দরকার হ'ল না, মহিতোষের চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আমার মুখের কথাটা কেড়ে নিয়ে সে বললে, 'মুশকিল? তবু আমায় বলিসনি!'

এবার তাকে সব ভেঙে বলতেই হ'ল: বিয়ে আমাদের অনেকদিন ঠিক হয়ে গেছে, শুধু গোল বেধেছে বিয়ের পর স্ত্রীকে কোথায় নিয়ে গিয়ে রাখব তাই নিয়ে। মার ইচ্ছে বিয়ের পর বৌকে নিয়ে দেশে যাই। অন্ততঃ কিছুদিন সেখানে শ্বশুরের ভিটেয় নতুন-বৌ নিয়ে তিনি আমোদ-আহ্লাদ যাতে করতে পান। আমার ভাবী স্ত্রী অপর্ণার তাতে কিছুমাত্র আপত্তি না থাকলেও তার বাবা তাতে রাজী নন। একে একরোখা লোক, তার ওপর পয়সার কোনো অভাব নেই; একমাত্র মেয়ে তাঁর একেবারে চোখের মণি। তিনি তাই কলকাতায় একটা বাড়ি-ই আমাদের জন্যে বন্দোবস্ত করতে চান—কিন্তু মেয়েকে দু'দিনের জন্যেও গ্রামে কিছুতেই পাঠাবেন না। এই মত-বিরোধের জন্যেই বিয়েটা আটকে আছে।

'এই কথা! কিছু ভাবিসনি। আমি সব ঠিক করে দেব। আমি থাকতে তোর ভাবনা কি?'—বলে মহিতোষ অগ্নিকাণ্ডের অকুস্থলে দমকলের মতো আশ্বাস-নিনাদ শুনিয়ে বেরিয়ে গেল।

সাতদিন বাদে অফিসের সময় খালি বাস্-এর মতো সত্যিই সে এসে হাজির।

—'যাক্, সব ঠিক করে এসেছি।'

অবাক হয়ে বললাম, 'সে কি! কি করে!'

'হুঁ হুঁ, কম পরিশ্রমটা কি সেজন্য করতে হয়েছে? মেয়েটির নাম অপর্ণা ত? ভাটিপো পড়ত? দু'দিন ধরে প্রথম তার খোঁজ-খবর নিলাম। তারপর গিয়ে তোর ভাবী শ্বশুরকে এক প্যাঁচেই কাবু।'

আমার বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টি লক্ষ্য করে মহিতোষ এবার বুঝিয়ে বললে, 'অপর্ণা দেবীর ইতিহাসে একটু গলদ আছে কিনা। সেইটে খুঁজে বার করেছি। কলেজে পড়বার সময় সে একটি ছেলের সঙ্গে প্রায়ই কফি-হাউসে, থিয়েটারে, বোটানিক্সে যেত।'

আমার মুখের চেহারাটা দেখতে পেয়ে থেমে প'ড়ে একটু গর্বের চালে বললে, 'তুই নিশ্চয় এসব কথা জানতিস না?'

শুকনো গলায় বললাম, 'জানতাম।'

'জানতিস?'

'হ্যাঁ, সে ছেলে আর কেউ নয়, আমি।'

'ও:'—বলে কথাটা গায়ে না মেখেই মহিতোষ বললে, 'সে-ই হোক। ওতেই কাজ হয়ে গেল। তোর ভাবী শ্বশুরমশাইকে গিয়ে সব জানিয়ে বললাম,—বেশী ট্যাণ্ডাই-ম্যাণ্ডাই করবেন না মশাই, ও মেয়ের বিয়ে দেওয়াই ভার হবে তাহ'লে।—যাক, আর তুই কিছু ভাবিস না; তোর শ্বশুরমশাই নিজে না-আসুন, চিঠি তাঁর আজকালের মধ্যে পাবি-ই।'

চিঠি ঠিক-ই পেলাম। বিয়ে ভেঙে দেওয়ার চিঠি। শ্বশুরমশাই জানিয়েছেন, তাঁর মেয়ের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক যেন আর না রাখি।

বিয়ে আমাদের এখনো হয়নি। অপর্ণা ও আমি তাঁর রাগ পড়বার জন্যে অপেক্ষা করে আছি। এর পর মহিতোষের একটা উপকার না করে কখনো থাকা যায়! কিছুমাত্র কৃতজ্ঞতার বাষ্প যার মনে আছে সে অন্ততঃ পারে না।

মহিতোষের মাঝে একটু সর্দিজ্বরের মতো হয়েছিল। কবিরাজ মশাই-এর সঙ্গে তাই তার আলাপ করিয়ে দিয়েছি।

পেশাদার কবিরাজ ইনি নন, চিকিৎসা করেন শখ করে। কিন্তু এরকম বিচক্ষণ সর্ববিদ্যাবিশারদ কবিরাজ আর দুটি মিলবে না। মানুষের দেহ যে কি ভয়ঙ্কর বস্তু তা বুঝিয়ে দিতে তাঁর জোড়া নেই। তাঁর সঙ্গে ঘণ্টাখানেক আলাপ করলে সত্যি বেঁচে আছি কিনা সন্দেহ হয়। মনে হয়, নখের ডগা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত প্রতি লোমকূপে রোগের বীজ কিলবিল করছে।

আলাপ করিয়ে দেবার ক'দিন বাদে মহিতোষের সঙ্গে দেখা করতে গেছলাম। দেখলাম, বিপুল ভেষজের শিশি বোতলের ওপর উবু হয়ে বসে হাঁপাতে হাঁপাতে মহি পাথরের খলে কি-একটা ওষুধ মাড়ছে।

আমায় দেখে কপালের ঘামটা বাঁ হাতে মুছে করুণ স্বরে বললে, 'একটু বোস্ ভাই, আর তিপ্পান্নবার বাকি।'

'তিপ্পান্নবার?'

'হ্যাঁ, এই বসন্ত-কুসুমাকর বটিকাটা ঠিক তিনশো-তিপ্পান্ন বার মাড়তে হবে কিনা। একটু কম কি বেশী হ'লে আর ফল হবে না। প্রায় হয়ে এসেছে। একটু বোস্'—বলেই মহি হঠাৎ মাথায় হাত দিয়ে মেঝের ওপর বসে পড়ল।

'কি হ'ল কি?' জিজ্ঞাসা করলাম অবাক হয়ে।

'সর্বনাশ হয়েছে, আর কি হবে!'—হতাশভাবে বললে মহি, 'তিনশো সাত, না, আট বার মেড়েছি—ভুলে গেছি।'

'তাহ'লে?'

'তাহ'লে আর কি? আবার নতুন বড়ি নিয়ে গোড়া থেকে সুরু করতে হবে।'

'কেন, এক কাজ করলে হয় না? তিনশো সাত ধরে একবার তিপ্পান্ন পর্যন্ত পৌঁছে অর্ধেকটা আর আট ধরে আরেকবার তাই করে অর্ধেকটা খেলে হয় না? অর্ধেকের কাজ ত হবে।'

মহি একেবারে জ্বলে উঠল, 'শাস্ত্র নিয়ে ওসব ছেলেখেলা চলে না।'

তারপর কবিরাজ মশাইকে আমিই তার কাছে এনে দিয়েছি মনে পড়ায়, বোধ হয় কৃতজ্ঞতায় একটু নরম হয়ে বললে, 'কবিরাজ মশাই-এর কাছে যদি শুনিস তাহ'লে বুঝবি, একচুল এদিক-ওদিকের জন্যে কি আকাশ-পাতাল তফাত হয়ে যায়।'

খল-টল ধুয়ে মহিকে আবার তিনশো-তিপ্পান্ন বার ওষুধ মাড়তে বসতে দেখে আমি চলে এলাম। তারপর কাল আবার গেছলাম মহিকে দেখতে। গিয়ে দেখি বাড়ির ভেতরে একটা যজ্ঞ সুরু হয়ে গেছে।

'ব্যাপার কি মহি? বাড়িতে বিয়ে-টিয়ে নাকি?'

মহি খাটের ওপর চিত হয়ে শুয়ে আছে। আমায় দেখে ক্লান্তভাবে মাথাটা তুলে করুণ স্বরে বললে, 'না ভাই, বাড়িতে ওষুধ তৈরি করাচ্ছি, বাজারের ওষুধের উপর কোনো বিশ্বাস নেই।'

'কিন্তু এত ওষুধ খাবার মতো অসুখ তোর হ'ল কবে? বেশ ত ছিলি সবল ছিটিই জানতাম।'

কাটা ঘায়ে নুনের ছিটের মতো হ'ল কিনা কে জানে। মহি একেবারে

চিড়বিড়িয়ে উঠল, 'তোরা আর জানবি কি করে? কবিরাজ মশাই সময়মতো না ধরে ফেললে আমিই কি আমার রোগ জানতে পারতাম? ছেলেবেলা থেকে আমি যে এইরকম মোটা, তাতে কবে মারা যেতে পারতাম তা জানিস?'

এটা একটা গভীর দুশ্চিন্তার কথা বটে। বললাম, 'কিন্তু তোকে যে আর দেখতেই পাই না, কাজে-টাজে বেরুচ্ছিস নাকি?'

'কখন আর বেরুব ভাই—আধঘণ্টা, পনেরো মিনিট অন্তর এক-একটা ওষুধ খেতে হয়, সময় পাই না।'

মহিকে এই অবস্থায় দেখে চলে এসেছি। এ অবস্থা বেশীদিন হয়ত নাও থাকতে পারে। কবিরাজ মশাই যেভাবে ওষুধ জাল দেওয়া সুরু করেছেন, তাতে লঙ্কা বাপ শীগ্‌গিরই হয়ত ফেটে বেরুবে। কবিরাজ মশাই তাতে হয়ত আর টিকবেন না। তবে এ ধাক্কা সামলে ওঠার পরও মহিতোষের ব্যবস্থা আমি ভেবে রেখেছি।

লেলে-কেনা আমার সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড মোটরটা ওকে দান করে দেব ঠিক করেছি। হ্যাঁ, দানই করে দেব বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসাবে—যাতে কোনদিন বিক্রি করবার কথা ও ভাবতেও না পারে।

কিছুদিন গাড়িটা আমি চড়েছি।

অকালে চুল পাকাবার এমন মহৌষধি আর আমার জানা নেই।

ভূমিকল্প

খুব খারাপ একটা স্বপ্ন দেখে শশাঙ্কর ঘুম ভেঙে গেল। জেগে উঠেও প্রথমটা তার বুকের রক্ত স্পন্দন যেন থামতে চায় না। স্বপ্নের সে বিভীষিকা এখনও যেন চারিধারের অন্ধকারে আত্মগোপন করে আছে। গলাটা তার শুকিয়ে গেছল, তবু শশাঙ্কর কেমন যেন উঠে জল গড়িয়ে খেতে ইচ্ছে হ'ল না। স্বপ্নের বিভীষিকা তাকে যেন শিশুর মতো অসহায় করে ফেলেছে। অন্ধকারে নিজেকে তার অত্যন্ত নিঃস্ব অত্যন্ত দুর্বল বলে মনে হচ্ছিল। এই ভয়াবহ একাকিত্ব সে যেন কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না। চুপ করে খানিক শুয়ে থেকে আস্তে আস্তে সে অন্ধকারে পাশে হাত বাড়ালে। হাতে ঠেকল মালতীর চুল। এইবার তার নিদ্রার ঘোর ও স্বপ্নের বিভীষিকা কেটে যাচ্ছে অনেকটা। মালতীর মৃদু নিশ্বাসের শব্দ নিস্তব্ধ অন্ধকারে সে শুনতে পেল। সে শব্দেও যেন একটু আশ্বাস আছে। সেই নিশ্বাসের মৃদু শব্দটিতে যেন মালতীরও আর একটি পরিচয় আছে। হাতটা আরেকটু বাড়িয়ে শশাঙ্ক মালতীর গালের ওপর এবার রাখলে। অপরূপ স্নিগ্ধ কোমলতা! সমস্ত মন জুড়িয়ে যায়। সমস্ত দেহ প্রথম মেঘের ছোঁয়া-লাগা শ্রাবণের আকাশের মতো নরম হয়ে আসে। এই কোমলতা এই স্নিগ্ধতা সে মালতীর সমস্ত সত্তার কাছেই ত প্রত্যাশা করেছিল। কিন্তু তার আশা পূর্ণ হয়েছে কি? নিদ্রিত মালতীর এই রূপের সঙ্গে জাগ্রত মালতীর যে অনেক তফাত!

মালতীর কাঁধের ওপর হাত রেখে শশাঙ্ক তাকে আস্তে একটু নিজের দিকে আকর্ষণ করলে। ঘুমের ভিতরই মালতী তার দিকে আর একটু সরে এসে একটি হাত রাখলে তার গলার ওপর। মালতীর মুখটি এবার একেবারে শশাঙ্কর বুকের কাছে। মালতীর শরীরের উত্তাপ এবার সে অনুভব করতে পারছে। মালতীর চুলের ঘ্রাণ সে পাচ্ছে। শশাঙ্কর মনে হ'ল এমন কাছাকাছি তারা অনেকদিন আসেনি। না, এসেছে বটে—কিন্তু শীতগির অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যেই এই নিশ্চিন্ত আত্মনিমজ্জনের সুর গেছে কেটে।

কেন যে কেটে গেছে শশাঙ্ক ভালো বুঝতে পারে না। ঠিক যে কলহ তারা করে তা নয়, বাইরে থেকে তাদের জীবন পরস্পরের প্রতি বিরূপ হবার কোনো

কারণ আছে বলেও শশাঙ্কর মনে হয় না। তবু কেমন যেন তারা মিলতে পারছে না সম্পূণভাবে। কোথায় তাদের অবচেতন মনে রয়েছে একটা আশঙ্কা, এমন কি একটা আক্রোশও বলা যেতে পারে পরস্পরের বিরুদ্ধে। শশাঙ্কর না থাক্‌, মালতীর আছে নিশ্চয়।

মালতী কিছুতেই তার কাছে সম্পূর্ণভাবে ধরা যেন দিতে চায় না কিংবা পারে না। মালতী তার কাছে রইল অর্ধমুদিত হয়ে, নিজের সমস্ত পাপড়ি সে খুললে না। অদৃশ্য কাঁটার ব্যবধান দিয়ে শশাঙ্ককে সে সব সময়েই একটু দূরে রেখে দিলে।

কিন্তু নিস্তব্ধ রাতের এই স্নিগ্ধ মালতীকে শশাঙ্কর যে অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। যৌবন যাবার আগেই যৌবনের সমস্ত স্বপ্ন সমস্ত বিশ্বাস যাদের ভেঙে যায়, শশাঙ্ক সেই হতভাগ্যের একজন। ঘা খেয়ে খেয়ে সে তার আশাকে সঙ্কীর্ণ করে এনেছিল, সমস্ত বিশ্বাস সমস্ত আশ্রয় হারিয়ে সে একটিমাত্র সান্ত্বনার ওপর ভর করতে চেয়েছিল। সে সান্ত্বনা প্রেমের। সমস্ত দুঃখ হতাশা ও স্বপ্নভঙ্গের মাঝে হৃদয়ের এই নিরন্ধ্র কুলায়ে সে শান্তি পাবে ভেবেছিল। কিন্তু মালতী কিছুতেই তেমন করে কাছে এল না, কিছুতেই উন্মুক্ত করলে না নিজেকে।

বাইরে থেকে দেখলে তাদের দাম্পত্য জীবনে কোনো চিড় চোখে পড়বে না বোধ হয়। বেশ মসৃণভাবেই দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে। মালতীর কোনো দোষ কোনো ত্রুটি নেই। গৃহলক্ষ্মী হিসাবে সে আদর্শ। সংসারের তত্ত্বাবধান সে এমন নিখুঁতভাবে করে যে শশাঙ্ককে কোনো দায়ই পোহাতে হয় না। নিঃশব্দে ঘুরে চলে দিনের চাকা।

ঘর-দোর পরিপাটিভাবে সাজানো। শশাঙ্ক না চাইতে তার প্রয়োজনের জিনিস যথাসময়ে যথাস্থানে এসে হাজির হবেই। তার লেখার টেবিলের ওপর ব্লটিং-কাগজ প্রতিদিন সকালে নিষ্কলঙ্কভাবে দেখা দেয়। ফাউন্টেন-পেনটি যেখানেই ফেলে রাখুক না কেন, প্রয়োজনের সময় দেখা যায় টেবিলের ওপর সেটি নতমুখে মসিপূর্ণ হয়ে অপেক্ষা করছে। টেব্‌ল-ল্যাম্পের শেডটি প্রতিদিন রাত্রে সেই প্রথমদিনের মতো ঝকঝক করে। মালতীর আয়োজন নিখুঁত নির্ভুল। কিন্তু এ আয়োজন আনন্দময় সেবার নয়, পূজারও নয়—এ আয়োজন নীরস কর্তব্যের।

এই কঠিন কর্তব্যপরায়ণতাই মালতীর চারিধারে দুর্ভেদ্য বর্মের মতো। সেই বর্ম অতিক্রম করে মালতীর নাগাল আর কিছুতে পাওয়া যায় না। সকালে উঠে হয়ত শশাঙ্কের বেরুতে হবে—দেরাজ খুলে মোজা বার করতে গিয়ে মোজা সে

পায় না। কিন্তু হেঁকে কিছু বলার আগেই মালতীকে মোজা হাতে করে ঢুকতে দেখা যায়। শশাঙ্কর দিকে না চেয়েই সে বলে, 'গোড়ালির কাছটা একটু ছিঁড়ে গিয়েছে। একটু দাঁড়াও, সেলাই করে দিচ্ছি।'

শশাঙ্ক বলে, 'ওইটুকু ছেঁড়ায় কিছু হবে না, কাল বরং সেলাই কোরো'খন।'

মালতী একটা চেয়ারে সোজা হয়ে ব'সে সেলাই করতে করতে বলে, 'দেরি হবে না, এখুনি দিচ্ছি।'

তাড়াতাড়ি সেলাই করতে গিয়ে ছুঁচটা অসাবধানে বুঝি আঙুলে ফুটে যায়। শশাঙ্ক ব্যস্ত হয়ে উঠে বলে, 'ওকি, আঙুল দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে যে!'

শশাঙ্কর সমবেদনাকে বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় না দিয়ে সহজ স্বরে মালতী বলে, 'ও কিছু নয়।' মোজাটা এবার সে টেবিলের উপর সাজিয়ে রাখে।

শশাঙ্ক তবু নিরস্ত হয় না। ক্ষত আঙুলটা ধরে বলে, 'সামান্য একটু কাটা থেকে অনেক কিছু হতে পারে তা জান!'

আস্তে আস্তে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে মালতী বলে, 'আচ্ছা, একটু আয়োডিন লাগিয়ে দিচ্ছি।'

ব্যস্, এর পর আর কোনো কথা চলে না। মালতীর দুর্ভেদ্য বর্মের ভেতর সূচ্যগ্রপরিমাণেও প্রবেশের সুযোগ নেই।

মালতী সব অবস্থাতেই এমনই সুন্দর এমনই অনধিগম্য চিরকাল। দরিদ্র শ্বশুরকে নিজের মহানুভবতায় কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করে যেদিন সে মালতীকে ঘরে এনেছিল তখন কতই বা তার বয়স হবে,—বড় জোর ষোল কি সতেরো। কিন্তু মালতীর চারিধারে তখন থেকেই এই তুষার-প্রাচীর ছিল দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান রচনা করে। মালতী অবশ্য আঘাত দিয়ে শশাঙ্কর অগ্রসর হবার চেষ্টাকে প্রতিহত করেনি, কিন্তু তার তুষার-শীতল স্থৈর্যের কাছে এসে শশাঙ্কর সমস্ত আবেগের উত্তাপ গিয়েছে সঙ্কোচে জুড়িয়ে। শশাঙ্ক আদর করলে মালতী রাগ করে না, বাধা দেয় না কিন্তু কি এক অদ্ভুত উপায়ে নিজেকে অদ্ভুত এক খোলসের মধ্যে গোপন করে ফেলে। শশাঙ্ক বুঝতে পারে তার কোনো আবেদন সে-খোলস ভেদ করে ভেতরে পৌঁছাচ্ছে না। হতাশ হয়ে সে নিজেকে সংযত করে তাই। কিন্তু মালতী আঘাত না দিলেও এ-আত্মসংযমের আঘাত একটা আছে। শশাঙ্কর আত্মা পর্যন্ত এ-আঘাতে যেন জর্জর হয়ে উঠেছে।

শশাঙ্কর মন ইতরতার অনেক উর্ধ্বে, তবু মালতীর এই শীতলতার কারণ

অনুসন্ধান করতে গিয়ে অত্যন্ত কুৎসিত কয়েকটা দিনের ভেতর দিয়ে তাকে যেতে হয়েছে। অবশ্য সন্দেহের গ্লানিতে কুৎসিত সে দিনগুলির কথা মনে হ'লেও শশাঙ্কর আজকাল ভয় হয়। নিজের অনিচ্ছায় নিজের সমস্ত চেষ্টা সত্বেও সেদিন সে পশুর মতো হিংস্র হয়ে উঠেছিল। মনে হয়েছিল মালতী তাকে ভালোবাসেনা বলেই হয়ত ধরা দেয় না। আর মালতী যদি তাকে ভালো না বাসে, তবে কি—! নিজের মনের কাছে অনুচ্চারিত সেই প্রশ্ন সেদিন তাকে উন্মাদ করে তুলেছিল। এ প্রশ্নকে সে আমল দিতে চায়নি, তবু ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুতের মতো একটি নাতিস্ফুট জ্বালাময় উত্তর তার মনকে ঝলসে দিয়ে গেছে বহ্নি-বিষে। সেদিন কত নীচেই যে সে নেমে গিয়েছিল মনে হ'লে তার এখনও লজ্জা হয়। মালতীর অসাক্ষাতে একদিন সে চোরের মতো তার বাক্স খুলে ওলট-পালট করে দেখেছে! কিছু পায়নি অবশ্য। কিন্তু না পেয়েও যেন সন্তুষ্ট হতে পারেনি। বাক্স বন্ধ করে রাখবার আগেই মালতী এসে ঘরে ঢুকেছিল। শশাঙ্ক অপ্রস্তুত হয়ে বলেছিল, 'আমার কামাবার ছোট আয়নাটা পাচ্ছি না, তোমার বাক্সে রেখেছ কিনা দেখছিলাম।'

মালতী সহজ স্বরে বলেছিল, 'আয়না ড্রেসিং-টেবিলের ওপরেই আছে।' সে স্বরে ভর্ৎসনা নেই, বিস্ময়ও নয়। শশাঙ্ক মুখ-চোখ লাল করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছল।

আর একদিন সে দুপুরবেলা হঠাৎ ঘরে ঢুকেছিল অত্যন্ত অস্থির ভাবে। কি তার মনে ছিল কে জানে, কিন্তু ঘরের ভিতর ঢুকে মালতীর সামনে বোধ হয় সে তার সংযম স্থির রাখতে পারেনি।

মালতী তখন ঘর গুছোচ্ছে। শশাঙ্ক একটু কঠিন স্বরে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'এ ছবি নামানো হয়েছে যে কেন?'

মালতী একটু বুঝি চুপ করে থেকে শশাঙ্কের দিকে অদ্ভুত ভাবে চেয়ে বলেছিল, 'নামালে কি হয়?'

এমন ভাবে বাঁকা-প্রশ্ন করে কথা বাড়ানো মালতীর স্বভাব নয়। তার গলার স্বরেও বুঝি অস্বাভাবিক একটু উত্তেজনার রেশ ছিল। শশাঙ্ক একটু বিস্মিত হ'ল। কিন্তু মালতী তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, 'ধুলো পড়েছিল, ভালো করে মুছে তুলে রাখবো বলে নামিয়েছি।'

শশাঙ্কের মনটা অনেকটা একরম দমে গেল। এ ছবি তার প্রথমা স্ত্রীর ছবি। বিয়ের পরই প্রথম দিন মালতীকে নিয়ে এ ঘরে ঢুকে এই ছবিটি দেখিয়ে শশাঙ্ক বলেছিল, 'কে জান, মালতী?'

মালতী খানিক একদৃষ্টে ছবিটির দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছিল, 'জানি।'

'এ ঘরে ওর অপমান যেন কখনো না হয়, মালতী! কোনো দিন যেন অন্যরা মনে না করি—ও শুধু একটা ছবি।'

মালতী এবারেও খানিক মাথা নীচু করে থেকে ঘাড় নেড়ে জানিয়েছিল সে করবে না।

মালতী তার অসাক্ষাতেও এ ছবির যত্ন করে জেনে সত্যিই শশাঙ্ক খুশি হ'ল। একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে প'ড়ে সে উৎসাহভরে বললে, 'কাজ করতে করতে হঠাৎ পালিয়ে এলাম, জান মালতী!'

কিন্তু মালতীর মুখে সে উৎসাহ প্রতিফলিত হবার আশা বৃথা। সে সাধারণ স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, 'আবার এখুনি যাবে নাকি?'

এ উত্তর শশাঙ্ক আশা করেনি। তার পর আবার কঠিন হয়ে উঠে হঠাৎ সে উগ্র স্বরে বললে, 'আমি গেলেই তুমি বাঁচ, না?'

মালতী তার দিকে ব্যথিত দৃষ্টিতে চেয়ে বললে, 'তা ত বলিনি।'

'বলোনি! আবার কি করে তাহ'লে বলতে হয়?'

মালতী এবার নীরব।

শশাঙ্ক আবার বললে, 'আমি যদি তোমার কাছে এমন বিষই হয়ে থাকি, তাহ'লে কি দরকার আমারি কাছে তোমার থাকবার?'

কি ইতর ভাবেই সে ঝগড়া করছে বুঝতে পেরে শশাঙ্ক যেন আরো মরিয়া হয়ে উঠল। হিংস্র ভাবে মালতীর দিকে এগিয়ে গিয়ে বললে, 'তোমার এখানে থাকতে ভালো লাগে না, কেমন? চলো আজই তোমায় দিয়ে আসছি।'

মালতী মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে ছিল। তার সমস্ত মুখ-চোখ রাঙা হয়ে উঠেছে।

মনে হ'ল তার স্বাভাবিক ধৈর্য বুঝি আর থাকবে না। তার অবিচলতার মুখোস বুঝি ভেঙে পড়ে আবেগের ভারে। কিন্তু মালতী এবারেও জয়ী হ'ল। অসামান্য শক্তিতে নিজেকে দমন করে সে হঠাৎ মুখ তুলে দৃঢ়স্বরে বললে, 'আমি এখান থেকে যাব না।'

নিজের ব্যবহারে এবার শশাঙ্ক লজ্জিত হয়ে উঠল মনে-মনে। ঘরের ভেতর এরকম ভাবে মালতীর সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে তার অত্যন্ত অস্বস্তি হচ্ছিল। সে বার হয়ে বেরিয়ে গেল।

সে কুৎসিত দিনগুলির ছায়া তারপর শশাঙ্কর মন থেকে সরে গেছে, কিন্তু দুজনের ভেতরকার সম্বন্ধ সহজ হয়নি আজও। মালতীকে সে পেল না, পাশাপাশি থেকেও তারা রইল একান্ত অপরিচিত হয়ে।

• • •

অন্ধকারে অর্থহীন ভাবে শশাঙ্ক চেয়ে ছিল। দেয়াল-ঘড়িটার কাঁটা এগিয়ে চলেছে অশ্রান্ত ভাবে—টকা টক্‌…। সমস্ত অন্ধকার সে-শব্দে ভরে গেছে। সেই শব্দটা এবার অদ্ভুত ভাবে শশাঙ্ককে অভিভূত করে দিল। টকাটক্‌—টকাটক্‌… বিরাম-বিহীন শ্রান্তি-বিহীন পায়ের শব্দ! অসীম অনন্ত সময়ের অন্ধকার মরুপ্রান্তর বেয়ে যেন চলেছে অনন্ত কালের অক্লান্ত প্রহরী। তারই অশ্বক্ষুরধ্বনি শোনা যাচ্ছে নিয়মিত তালে তালে। এ চলার বিরাম নেই, এ যাত্রার শেষ নেই। কল্পনা যেখানে পৌঁছে না, সেই অতীত থেকে ধারণার অতীত ভবিষ্যতে এই পথ। ভাবতেও ভয়ঙ্কর লাগে। এ বিশাল অনন্ত সময়ের মরুতে কতটুকু পথ শশাঙ্কর? কালের সওয়ার নিমেষে তার সে আয়ুর পথ পার হয়ে যাবে। তারপর এমনি অন্ধকার আর শূন্যতা। এই নশ্বর আয়ুর কি সার্থকতা আছে একমাত্র প্রেমে ছাড়া। এ জীবনের একমাত্র সান্ত্বনা—ভিতরের রঙে অন্ধকারকে ক্ষণিকের জন্য রঞ্জিত করে তোলায়। কিন্তু শশাঙ্কর সে সান্ত্বনাও নেই। একবার মৃত্যু তাকে ব্যঙ্গ করে গেছে, এবার জীবন আছে তার সামনে দুয়ার রোধ করে!

হঠাৎ শশাঙ্ক চমকে উঠল। জানলার পাল্লাটা কে যেন সশব্দে নেড়ে দিয়েছে। সেটা ঝনঝন করে নড়ে উঠছে। শশাঙ্ক কৌতূহলী হয়ে উঠে যাবার আগেই সমস্ত ঘরটা যেন দুলে উঠল। দরজা নড়ছে, খাট দুলছে, আলমারির জিনিসপত্র, দেয়ালের ছবিগুলো সব উঠেছে অস্থির ভাবে কেঁপে—চকিতে ব্যাপারটার অর্থ বুঝতে পেরে শশাঙ্ক ভীত হয়ে উঠল। সজোরে মালতীকে নাড়া দিয়ে ডাকল, 'ওঠো ওঠো মালতী, শীগ্‌গির ওঠো!'

ঘর তখন রীতিমতো দুলতে সুরু করেছে, ছিটকিনি খুলে গিয়ে জানলার পাল্লাগুলো আছাড় খাচ্ছে গরাদের ওপর, ওপারের একটা তাক থেকে কাচের কাঁটা বাসন সশব্দে নীচে পড়ে ভেঙে গেল। সে শব্দে ও শশাঙ্কের ডাকে ধড়মড় করে উঠে পড়ে মালতী নির্বোধ ভয়ে শশাঙ্ককে ধরলে জড়িয়ে।

—'ভূকম্প হচ্ছে মালতী, শীগ্‌গির ওঠো—'

শশাঙ্ক কোনরকমে মালতীকে সঙ্গে করে উঠে সুইচটা টিপে দিলে। অন্ধকারে শব্দটা পাওয়া যাচ্ছিল। আলোতে ভূমিকম্পের বেগটাও দেখা গেল। ঘরের আসবাবপত্র ভয়ানক ভাবে দুলছে, কয়েকটা ছবি আশ্রয়চ্যুত হয়ে ঝুলছে, ঘড়ির কাঁটা গেছে থেমে।

মালতীর এখনও ঘুমের ঘোর ভালো করে যায়নি। শশাঙ্ককে অসহায়ভাবে জড়িয়ে ধরে থেকে সে কাঁপছিল। এই নিদারুণ বিপদের মুহূর্তেও মালতীর সে আলিঙ্গনের স্বাদ শশাঙ্ক সমস্ত শরীর দিয়ে অনুভব করে যেন নিশ্চল হয়ে উঠল। এমন করে এত কাছে মালতী কোনো দিন আসেনি। ভূমিকম্পে বুঝি মালতীর চারিধারের প্রাচীর এতদিনে গেছে ভেঙে। মালতীকে এক হাতে জড়িয়ে রেখে আর এক হাতে দরজার খিলটা খুলতে খুলতে শশাঙ্ক বললে, 'শীগ্‌গির নীচে চলো মালতী, পুরোনো বাড়ির দোতলা, একে বিশ্বাস নেই।'

মালতী প্রায় অস্ফুট স্বরে বললে, 'আমরা ত একসঙ্গে আছি!—আমরা ত একসঙ্গে আছি!' শশাঙ্কর সমস্ত মন গুঞ্জন করে উঠল আনন্দে। হোক ভূমিকম্প, হোক প্রলয়—সে বুঝি আর কেয়ার্ করে না। মালতী ধরা দিয়েছে।

তারা ঘর থেকে বেরুবার আগেই সশব্দে একটা ছবি নীচে পড়ে গেল। থমকে দাঁড়িয়ে দুজনে একবার সে দিকে চাইলে। মালতী নিজের অজ্ঞাতসারে সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। শশাঙ্ক তাকে বাধা দিয়ে বললে, 'থাক্—নীচে চলো আগে।'

দুজনের একবার দৃষ্টি-বিনিময় হ'ল। সে দৃষ্টির ভাষা জটিল, গভীর—শব্দের অতীত।

দুজনে এবার দ্রুতবেগে বেরিয়ে পড়ল ঘর থেকে, পরস্পরকে জড়িয়ে।

কিন্তু হায়! বেশী দূরে তাদের যেতে হ'ল না। ভূগর্ভের অগ্নিস্রোতের আলোড়ন মানুষের হৃদয়ের আলোড়নের তোয়াক্কা রাখে না। একটি জীবন-নাট্যের পরিবর্তন অর্ধসমাপ্ত রেখেই মাঝখানে ভূমিকম্প গেল থেমে। দরজা-জানলা আর নড়ছে না। পৃথিবী শান্ত হয়ে গেছে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে তারা দাঁড়িয়ে পড়েছিল। খানিক নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে মালতী ধীরে ধীরে শশাঙ্কর আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করে নিলে নিজেকে। এতক্ষণ যেন অভিভূত হয়ে ছিল। আচ্ছন্নভাব এইবার তার কেটে গেল। সে আবার সেই আত্মস্থ, অবিচলিত মালতী।

মালতী ধীরে ধীরে আবার ওপরে উঠে এল শোবার ঘরে। তার পেছনে এল শান্ত ক্লান্তভাবে। ভূমিকম্প শুধু যেন তাকেই বিধ্বস্ত করে গেছে।

মালতী ঘরে এসে ছবিটাকে তুলে ধরলে; কাঁচটা শুধু ভেঙে গেছে, আর কিছু ক্ষতি হয়নি।

মালতী শান্ত স্বরে বললে, 'সকালে কাঁচ বাঁধিয়ে নিয়ে এসো।'

শান্ত বিমূঢ়ভাবে রইল সামনে তাকিয়ে।

—